কর্ম্মের পথে

প্রথম খণ্ড

[১]

হেমাঙ্গিনী।

যুবক সুরেশচন্দ্র মিত্র কলিকাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে এক ছাত্র-নিবাসে থাকিত এবং মেট্রোপলিটান্ ইন্‌ষ্টিটিউশনে বি, এ, ক্লাসে পড়িত। সে এবার পূজার ছুটীতে পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিল।

সুরেশ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া একখানি পত্র পাইল। পত্রখানি কৃষ্ণনগর হইতে দুইদিন পূর্ব্বে আসিয়াছিল। তাহা এই,—

"কল্যাণবরেষু,

কাল প্রাতে বিস্তর পুলিস আসিয়া আমাদের বাড়ী ঘেরাও করিয়া খানাতল্লাস করিয়াছে। তাহারা নন্দলালকে থানায় লইয়া গিয়াছে। গত রাখিবন্ধনের দিন তাহারা বিধুভূষণকে ও তাহার

সঙ্গে আর তিনজন স্বদেশী ছেলেকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কাল আবার তাহারা আমার ভাইকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে,—কি উদ্দেশ্যে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এখন পর্য্যন্ত তাহাকে ছাড়িয়া দেয় নাই। নন্দলাল এবার রাখিবন্ধনের দিন ঘরের বাহির হয় নাই। মা শোকে অধীর হইয়াছেন; তাঁহার কান্না থামাইতে পারিতেছি না। তুমি এই পত্র পাইবামাত্র একবার এখানে আসিবে। আমাদের ভারি বিপদ। ইতি

তোমার দিদি—

হেমাঙ্গিনী"

এইখানে হেমাঙ্গিনীর একটু পরিচয় দিয়া রাখি। সে কৃষ্ণ-নগরের এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ জয়গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। পিতা নিঃস্ব হইলেও বিধাতা হেমাঙ্গিনীর বিবাহের আবশ্যকীয় যৌতুক তাহার দেহের মধ্যেই দিয়াছিলেন,—স্বর্ণ তাহার সকল গাত্রে, মুক্তাপংক্তি তাহার মুখের মধ্যে এবং উজ্জ্বল হীরকযুগল তাহার নেত্রযুগলে। কিন্তু চাটুয্যে মহাশয়ের সঙ্গে বিধাতার বোধ হয় বনিবনাও ছিল না। তিনি এই যৌতুক অন্যান্য করিয়া কন্যার অষ্টমবর্ষে যুগপৎ গৌরীদান ও কুলক্রিয়া করিয়া কৃতার্থ হইলেন। বিধাতাও বিরূপ হইয়া এই বিবাহ পাঁচ বৎসরের মধ্যে নাকচ্ করিয়া দিলেন। হেমাঙ্গিনী তের বৎসর বয়সে বিধবা হইল।

হেমাঙ্গিনীর বর জুটিয়াছিল, কিন্তু ঘর জুটে নাই। শ্বশুরবাড়ী কাহাকে বলে তাহা সে জানিত না। বিবাহের সময় সে একবার ঘোমটা দিয়াছিল। তাহার পর তাহার বর দুইবারমাত্র আসিয়াছিল; সে দুইবারও তাহাকে ঘোম্টা টানিয়া বউ সাজিতে

হইয়াছিল। জীবনে এই তিনবারের অধিক অবগুণ্ঠনের সহিত তাহার পরিচয় হয় নাই। প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় হেমাঙ্গিনীর মুখারবিন্দ সর্ব্বদা জয়গোবিন্দের গৃহ-প্রাঙ্গণ আলো করিয়া থাকিত।

হেমাঙ্গিনীর মাতা কলিকাতার মেয়ে; তিনি বালিকা অবস্থায় কয়েক বৎসর মেয়ে স্কুলে পড়িয়াছিলেন। তাঁহারই নিকট হেমাঙ্গিনী লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিল। সে তাহার ছোট ভাই নন্দলালকে শিশুশিক্ষা তৃতীয়ভাগের পাঠ বলিয়া দিত। নন্দলাল তাহার দিদির অপেক্ষা ছয় বৎসরের ছোট ছিল। হেমাঙ্গিনীর এক মাতুল ছিল, কিন্তু মাতুলালয় ছিল না। এই মাতুলের নাম পঞ্চানন রায় চৌধুরী। পাঁচু মামা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও বিষয়বুদ্ধির অভাবে এবং কতকটা সহৃদয়তার দোষে সমস্ত পিতৃবিত্ত মায় ভদ্রাসন পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণনগরে আসিয়া তাঁহার ভগ্নী ও ভাগ্নে-ভাগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন।

[২]

নায়েব রামলাল মিত্র।

কৃষ্ণনগরে হেমাঙ্গিনীর পিতার এক অকৃত্রিম বন্ধু লাভ হইয়াছিল। এই বন্ধু নায়েব রামলাল মিত্র। এই নায়েব মহাশয়ের অধীনে চাটুয্যে মহাশয় চাকরী করিতেন।

জমীদার সরকারের নায়েব বলিলে সচরাচর এক কঠোর প্রকৃতির প্রজাপীড়ক কর্ম্মচারী বুঝায়। কাছারী বাড়ী হইতে পাইক আসিয়া নায়েব মহাশয়ের এত্তালা দিলে গরীব প্রজার হৃদ্‌কম্প হয়। নায়েব রামলাল মিত্র কিন্তু এ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। প্রজারা তাহাদের বিপদে আপদে পরামর্শ ও সাহায্য লইবার জন্য তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিত। তিনি গরীবের মা বাপ ছিলেন।

রামলাল মিত্র প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্যের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্ফূর্ত্তি বাড়িতে থাকে। নায়েব মহাশয় ইহাদিগের অন্যতম। তিনি দন্তের অভাব রসিকতার দ্বারা পূরণ করিয়া লইতেন এবং মুখের লোলচর্ম্ম ও কুঞ্চিত ললাট সর্ব্বদা হাস্যের ছটায় ঢাকিয়া রাখিতেন। অন্তঃপ্রকৃতির স্বচ্ছতার উপর এই ক্ষমতা অনেকটা নির্ভর করে।

নায়েব মহাশয় উপার্জ্জন করিতেন যথেষ্ট। কিন্তু কিছুই সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। আধুনিক শিক্ষা বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা তাঁহার ভিতর না থাকিলেও, তিনি এই শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। নিজের পুত্র শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্রকে তিনি এই কারণেই কলিকাতায় রাখিয়া কলেজে পড়াইতেন। সুরেশের সহিত পাঠকের গ্রন্থারম্ভে পরিচয় হইয়াছে। নায়েব মহাশয়ের নিজগ্রামে একটী মাইনর স্কুল ছিল। এই স্কুলই তাঁহার আয়ের এক-তৃতীয়াংশ গ্রাস করিত।

জমীদার সরকারের নায়েব হইলেই তাঁহাকে আদালতের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্ক পাতাইতে হয়। নায়েব রামলাল মিত্রকেও

তাহা করিতে হইয়াছিল। এই সূত্রে এখানকার বড় উকিল রাধাবল্লভ ঘোষের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। ঘনিষ্ঠতা দুই প্রকারের হইতে পারে। এক, সমচরিত্র ও সমহৃদয়ের আকর্ষণে; আর এক, কার্য্যের খাতিরে। রাধাবল্লভ বাবুর সহিত নায়েব রামলাল মিত্রের যে ঘনিষ্ঠতা, তাহা শেষোক্ত প্রকারের।

[৩]

রাধাবল্লভ বাবু।

রাধাবল্লভ বাবু সরকারী উকিল না হইলেও তিনিই যে কৃষ্ণনগর বারের একছত্র সম্রাট, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। তিনি সওয়াল-জবাব করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইত যেন তুবড়ীতে আগুন দেওয়া হইয়াছে। অনেকে বলিত, রাধাবল্লভ বাবু যেসকল মোকদ্দমায় উকিল থাকিতেন, তাহার মধ্যে শতকরা নিরানব্বইটি মোকদ্দমায় তিনি জয়ী হইতেন। এই কৃতিত্বের জন্য তাঁহার পসার অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। এই কারণে অনেক বড় বড় পুলিস-চালানী মোকদ্দমায় তাঁহাকে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে অতিরিক্ত ভাবে উকিল নিযুক্ত করা হইত।

রাধাবল্লভ বাবুর মুখের জোর অপেক্ষা কলমের জোরও বড় কম ছিল না। তিনি কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক পত্রে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতেন। তাঁহার বন্ধু, উক্ত পত্রের সম্পাদক মহাশয় এই সকল প্রবন্ধ সম্পাদকীয় স্তম্ভেই প্রকাশ

করিতেন। শুনা যায়, এক স্বাধীনচেতা ডেপুটিবাবুর সহিত রাধাবল্লভের কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি এই সংবাদ-পত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে লিখিয়া লিখিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে রাধাবল্লভ বাবু কৃষ্ণনগরের একমাত্র রাজনৈতিক নেতারূপে যাবতীয় কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্সে যথারীতি যোগদান করিতেন। তবে সম্প্রতি তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সরকারী উকিলের পদ দিবার জন্য উর্দ্ধতন রাজপুরুষদিগের মধ্যে লেখালিখি চলিতেছে। বোধ হয় এই কারণেই ইদানীং রাধাবল্লভ বাবুর রাজনৈতিক উপদ্রব কিছু কম পড়িয়াছিল। তিনি আজকাল আর বড় কংগ্রেস-টংগ্রেসে যাইতেন না; বরং বলিতেন, ওসব হুজুগ করিয়া কোনও ফল হইবে না।

রাধাবল্লভ বাবুর পারিবারিক জীবনের কথা একটু না বলিলে তাঁহার চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সুতরাং আমরা তাহা বলিতে বাধ্য।

কবিগণ বলেন, বিচ্ছেদ বা বিরহ প্রেমকে গভীর করে। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে রাধাবল্লভের দাম্পত্য প্রেম যে অগাধ জলধিতুল্য ছিল তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই; যেহেতু এই জলধিতে সর্ব্বদাই বিচ্ছেদ-কলহের বাড়বানল জ্বলিত। নিশাযোগে সুরাসিঞ্চনে তিনি এ অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার প্রয়াস পাইতেন।

স্ত্রীর সঙ্গে বনিত না বলিয়া রাধাবল্লভ নিত্য নূতন ফুলের মধু-পান করিয়া তাঁহার হৃদয়ের পিপাসা মিটাইতেন। স্বামীর এই রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরী

একদিন স্বহস্তে সম্মার্জ্জনীর দ্বারা তাহা উত্তমরূপে ঝাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ঝাড়ফোঁকে কি এ রোগ সারে?

পাঠক যেন রাধাবল্লভ বাবুকে একজন বিশেষ রমণীভক্ত পুরুষ বলিয়া ধরিয়া লইবেন না। আমরা জানি, তিনি ঘোর রমণীবিদ্বেষী ছিলেন। "নারীজাতিকে তিনি আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। বলিতেন, রমণীর মনের গতি সর্পের ন্যায় বক্র, তাহার দংশন বৃশ্চিকের ন্যায় তীব্র। তিনি দেখাইতেন, জগতের যত অপঘাতের গোড়ায় রমণী; পুরাণেতিহাসের যত বড় বড় যুদ্ধবিগ্রহ রমণী লইয়া—রমণী লইয়াই রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড, রমণী লইয়াই ট্রয়ের ধ্বংস।"

স্ত্রীর সহিত রাধাবল্লভের আজীবন কলহ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে আর একটি দারপরিগ্রহ করিয়া সুখী হইতে পরামর্শ দিয়াছিল। রাধাবল্লভ বাবু তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, বিবাহ করিয়া স্ত্রীলোককে কিছুতেই অর্দ্ধাঙ্গিনী করিবে না; যেহেতু স্ত্রীলোকের তুল্য পুরুষের শত্রু নাই। দর্শনমাত্র তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে; বিদ্রূপ-রসিকতার বাক্যবাণে তাহাকে সতত বিদ্ধ করিবে; প্রেমালাপের ভাণ করিয়া বঞ্চনা করিবে এবং আশার বঁড়শীবিদ্ধ করিয়া মাছের মত খেলাইতে থাকিবে; কিন্তু তাহাকে কখনও বিবাহ করিবে না।

রাধাবল্লভ বলিতেন—"বিবাহ করা ভাল নয়; এ জোড়ুকলমের ফল অনিশ্চিত—মিষ্টও হইতে পারে, অম্লও হইতে পারে। এই ফলের অম্লরসে আমার সংসাররূপ দুধ ছিঁড়িয়া দই হইয়াছে।"

[৪]

পাখীর প্রতি বিড়ালের দৃষ্টি।

আমরা পাঠককে জানাইতে ভুলিয়া গিয়াছি, আজ পাঁচমাস হইল জয়গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হৃদ্‌রোগে অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার নিরাশ্রয় স্ত্রীপুত্রকন্যাকে নায়েব রামলাল মিত্রের সংসারভুক্ত হইতে হইয়াছে। নায়েব মহাশয় এই ভার স্কন্ধে না লইলে তাহাদিগকে পথে দাঁড়াইতে হইত। হেমাঙ্গিনীর বয়স এখন পঁচিশ বৎসর। নায়েব মহাশয়ের স্ত্রী দয়াময়ী তাহাকে মেয়ের মত স্নেহ করিতেন। সুরেশ তাহাকে 'দিদি' বলিয়া ডাকিত। নন্দলাল নায়েব মহাশয়ের সেরেস্তায় শিক্ষানবীশ হইয়াছিল। নায়েব মহাশয়ের বাসায় নিত্য দুইবেলায় ত্রিশখানি পাতা পড়িত। হেমাঙ্গিনীরা মায়ে ঝীয়ে তাঁহার রন্ধনশালার ভার লইয়াছিল।

কার্য্যোপলক্ষে নায়েব রামলাল মিত্রকে হামেসাই রাধাবল্লভ বাবুর বাড়ীতে যাইতে হইত। রাধাবল্লভও নায়েব মহাশয়ের বাসায় কাজ না থাকিলেও আসিতেন। সম্ভবতঃ তিনি আসিতেন সৌজন্যের খাতিরে। তবে সৌজন্য দেখাইবার জন্য মাসে যতবার আসা আবশ্যক, তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিকবার আসিতেন। ইহাতে নায়েব মহাশয় বিশেষ আপ্যায়িত হইতেন, সন্দেহ নাই। মধ্যে মধ্যে তিনি রাধাবল্লভ বাবুকে আহারের নিমন্ত্রণ করিতেন।

একদিন রাধাবল্লভ নায়েব মহাশয়ের বাসায় আহার করিতেছিলেন। সেদিন হেমাঙ্গিনীর মাতা অসুস্থ থাকায় হেমাঙ্গিনীকেই বাধ্য হইয়া পরিবেশন করিতে হইয়াছিল। রাধাবল্লভ হেমাঙ্গিনীকে

এইখানে পূর্ব্বে অনেকবার দেখিয়াছিল। বিড়াল যেভাবে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীকে দেখে, রাধাবল্লভ সেই ভাবেই হেমাঙ্গিনীকে দেখিত। হেমাঙ্গিনী তাহা মনে মনে বুঝিত। মন অন্তর্যামী। কিন্তু বুঝিয়াও সে তাহার প্রতীকার করিতে পারিত না। পাখী কি বিড়ালের কুদৃষ্টির প্রতীকার করিতে পারে?

হেমাঙ্গিনী যখন পরিবেষণ করিতেছিল, তখন নায়েব মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,

"রাধাবল্লভ বাবু! তরকারীগুলি কেমন হয়েছে?"

"খাসা হয়েছে, চমৎকার হয়েছে। কে রসুই করেছে হে মিত্র মশাই?"

"রসুই করেছে নন্দর ভগ্নী হেমাঙ্গিনী।"

"বটে বটে! তবে ত হেমাঙ্গিনীর হাত দুখানি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া উচিত!"

"হিমু-মা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা!"

"রসুই দেখে মনে হয় হেমাঙ্গিনী সাক্ষাৎ দ্রৌপদী!"

নায়েব মহাশয় হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হেমাঙ্গিনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। লজ্জায় রমণীর গণ্ডস্থল রক্তিমাভা ধারণ করে; রোষে তাহার সমস্ত মুখমণ্ডল রাঙা হইয়া উঠে। রোষ যেখানে বাক্যের সহিত বাহির হইতে না পারিয়া মনের মধ্যে গুম্রাইতে থাকে, সেখানে সে তাহার সমস্ত শক্তি বদনমণ্ডলে পর্য্যবসিত করিয়া তাহাকে রক্তমুখী করিয়া তোলে।

আহারান্তে রাধাবল্লভ নন্দলালের কথা পাড়িয়া বলিলেন, সে যদি জমিদারী সেরেস্তার কাজ ছাড়িয়া দিয়া উকিলের মুহুরী হয়,

তাহা হইলে তাহার উন্নতির পথ সত্বর উন্মুক্ত হইতে পারে। রাধাবল্লভ নায়েব মহাশয়কে বলিলেন—"আমার আর একজন মুহুরীর আবশ্যক হয়েছে। নন্দলাল যদি রাজী থাকে তা'হলে আমি তাকে আমার মুহুরী করিতে পারি।"

নায়েব মহাশয় সম্মত হওয়ায় এবং নন্দলালের ইচ্ছা থাকায় সে অচিরে রাধাবল্লভ বাবুর মুহুরী হইল। হেমাঙ্গিনী কিছু আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু আপত্তির বিশেষ কিছুই কারণ দেখাইতে পারে নাই। সুতরাং সে আপত্তি ভাসিয়া গেল।

[৫]

উকিলের মুহুরী।

আজ চার বৎসর হইল নন্দলাল রাধাবল্লভ বাবুর মুহুরী হইয়া আদালতে যাতায়াত করিতেছে; কিন্তু আজ অবধি সে তাহার কাজের সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। পাকা উকিলের মুহুরী হইতে হইলে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা নন্দলালের ছিল না। মক্কেল ঠকাইবার জন্য যে অসংখ্য ছল-চাতুরীর দরকার হয়, তাহার বুদ্ধিতে তাহা আসিত না। সে মিছামিছি ষ্ট্যাম্প কিনিবার ছুতা করিয়া মূর্খ মক্কেলের টাকা পকেটস্থ করিতে অভ্যস্ত ছিল না। যে আমলা বা পুলীস কর্ম্মচারী ঘুস লইত না, তাহাকে এত টাকা ঘুস দিতে হইবে এইরূপ

কথা বলিয়া সে বিপন্ন নির্ব্বোধ মক্কেলের অর্থ আত্মসাৎ করিতে জানিত না। নন্দলাল মুহুরী সাজিয়া টাউটের কাজ করিতে পারিত না; এবং যে মক্কেল মোকর্দ্দমা হারিয়াছে, তাহাকে পট্টি লাগাইয়া আপিল করিবার জন্য রাজী করিতেও পারিত না।

দক্ষ উকিলের মুহুরীকে অনেক সময় ছোট উকিল সাজিয়া গাছতলায় পাণওয়ালীর এজলাসে গলাবাজী করিয়া পক্ষাপক্ষের মামলার অগ্রিম ডিক্রি-ডিসমিস্ করাইতে হয়। নন্দলাল তাহা একেবারেই পারিত না। মোট কথা, তাহাকে উকিলের মুহুরী না বলিয়া মুহুরীর অপভ্রংশ বলিলেই সঙ্গত হইত। নন্দলাল রাধাবল্লভ বাবু কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া একার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল, কিন্তু বুঝিয়াছিল সে এ লাইনের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

তবে হেমাঙ্গিনীর ভাই বলিয়া রাধাবল্লভ বাবু তাহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন এবং স্বয়ং চেষ্টা করিয়া মক্কেলদিগের নিকট হইতে বেশ দু'পয়সা পাওয়াইয়া দিতেন। এতদ্ব্যতিরেকে তিনি মধ্যে মধ্যে ভাল জিনিস-টিনিস কিনিয়া নন্দলালের হাতে দিয়া বলিতেন—"তোমার মা বোনের জন্য এগুলি লইয়া যাও।" ইহা দেখিয়া আদালতের কোন কোন দুষ্ট লোক বলিত—"এরূপ চাপরাসের জোর থাকিলে নন্দলালের মত অকর্ম্মণ্য লোকেরও একটা কর্ম্মের কিনারা হয়।"

[৬]

পঞ্চানন রায় চৌধুরী।

হেমাঙ্গিনীর মাতুল বাবু পঞ্চানন রায় চৌধুরী পূর্ব্ববৎ এখনও কৃষ্ণনগরে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে দেখাশুনা করিতেন। এখন তিনি নায়েব মহাশয়ের বাসাতেই আসিতেন এবং এখানে দু'একদিন থাকিয়া চলিয়া যাইতেন। সুরেশ এবং তাহার বন্ধুবান্ধবদিগের সঙ্গে এইখানেই তাঁহার পরিচয় হয়। ইহারা সকলেই তাঁহাকে 'পাঁচু মামা' বলিয়া সম্বোধন করিত এবং বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। কেবল কৃষ্ণনগরে কেন, কলিকাতাতেও অনেক শিক্ষিত যুবকের মধ্যে পঞ্চানন বাবুর বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। যুবকগণ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া অনেক নূতন সংবাদ অবগত হইত এবং অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা করিত। পাঁচু বাবু সকল বিষয়ের গেজেট ছিলেন।

পঞ্চাননের বয়স ষাটের উপর হইলেও তাঁহার দেহের অবস্থা বেশ ছিল; এপর্য্যন্ত তাঁহার বত্রিশটী দাঁতের একটী দাঁতও খসে নাই। এই দাঁতগুলিতে সর্ব্বদাই হাসি জড়াইয়া থাকিত। তাঁহার ভিতর বার্দ্ধক্যের বিচক্ষণতা, শৈশবের সরলতা ও যৌবনের রসিকতা একত্রে অবস্থান করিত বলিয়া তিনি সকল বয়সের লোকের সঙ্গে সমানভাবে মিশিতে পারিতেন।

পঞ্চানন বরাবরই বড় হিসাবী লোক ছিলেন। তবে যৌবনে তাঁহার হিসাবের মাত্রা কিছু অধিক ছিল। কখনও কিছু টাকা পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে তিনি তাহা কি কি বাবদে ব্যয় করিবেন

তাহা বহুপূর্ব্ব হইতে হিসাব করিয়া সুন্দর বজেট আঁটিয়া ফেলিতেন। তাঁহার এক রসিক বন্ধু একদিন বিশেষ ব্যস্ত ভাবে তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"ওহে ভায়া! তোমার মাথায় অর্থ ব্যয় করবার অনেক রকম ভাল ভাল মতলব আছে। আমি আগামী মাসে পাঁচ শ টাকা পা'ব। তোমার দু'একটা মতলব আমাকে বাতলাইয়া দাও, যা'তে আমি এই টাকাটার প্রাপ্তিমাত্র সদ্গতি করতে পারি।"

সকলে বলিত, পঞ্চাননের প্রতিভা আছে। বাস্তবিক তাঁহার সকল কাজে বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি এমন কতকগুলি নূতন নূতন কারবার করিয়াছিলেন যাহা পূর্ব্বে কেহ কখন করে নাই। কিন্তু তাঁহার হিসাব ও হাতের গুণে তাহাদের একটীও টিকিল না। এইরূপ করিয়া পঞ্চানন অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার কলিকাতাস্থ পৈত্রিক ভদ্রাসনটুকু নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। এজন্য কেহ তাঁহাকে ভৎর্সনা করিলে তিনি পঞ্জিকা খুলিয়া দেখাইয়া বলিতেন—"আমার পৌষ মাসে জন্ম হইয়াছে; সুতরাং পিতৃবিত্ত আমার ভোগ হইবে না।" পাঠক মনে করিবেন না যে, আমাদের পাঁচু মামা বাস্তবিক পাঁজী-পুঁথীতে বিশ্বাস করিতেন। আমরা দেখিয়াছি, তিনি অশ্লেষা, মঘা ও ত্র্যহস্পর্শ দেখিয়া শুভকর্ম্ম আরম্ভ করিতেন। তিনি বলিতেন—"প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবারের বারবেলায় বিলাতী মেল বা ডাক রওয়ানা হয়। এই মেলের উপরেই এত বড় একটা শক্তিশালী সাম্রাজ্য চলিতেছে। পাঁজীতে যখন যাত্রানাস্তি, তখনই যাত্রা করিবার মাহেন্দ্রযোগ। পাঁজী উল্টা করিয়া ধরিলে আজকাল অধিক ফল পাওয়া যায়।"

পিতৃবিত্ত ছাড়িয়া দিয়াও পঞ্চানন কোন দিন সোপার্জ্জিত বিত্ত ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষাও হৃদয়ে পোষণ করেন নাই। তিনি বলিতেন—"আমি বিবাহ করি নাই। আমার একটা পেট; তাহার জন্য আমাকে ধীবরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পয়সা ধরিবার জন্য ভব-সমুদ্রে জাল ফেলিয়া বেড়াইতে হইবে না।"

পঞ্চানন ইংরাজী ভালরকম জানিতেন এবং সংস্কৃতও কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন। "সন্ধ্যা"-সম্পাদক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ও ক্রমে হৃদ্যতা হইয়াছিল। বোধ হয় উভয়ের কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্যই এই হৃদ্যতার কারণ। ইঁহারা উভয়েই শিক্ষিত, উভয়েই অকৃতদার এবং উভয়েই লক্ষ্মীছাড়া।

পঞ্চানন ইদানীং সন্ধ্যা-কার্য্যালয়ে থাকিতেন, প্রুফ্ ইত্যাদি দেখিতেন এবং সেইখানেই আহার করিতেন। আহার না হইলে কাহারও চলে না, পঞ্চাননেরও চলিত না। তবে আহার হচ্চে দ্বিবিধ—দেহের ও মনের। দেহের আহারের দিকে পঞ্চানন বাবুর তত লক্ষ্য ছিল না, সামান্য কিছু জুটিলেই তাঁহার দিন চলিয়া যাইত। কিন্তু তাঁহার মনের ক্ষুধা অত্যন্ত অধিক ছিল। সন্ধ্যা-আফিসে অনেক ইংরাজী বাঙ্গালা সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্র আসিত। পঞ্চানন প্রত্যহ প্রাতে তৎসমুদয় চর্ব্বণ করিয়া উদরস্থ করিতেন। মধ্যাহ্নে কোন কোন দিন তিনি ইম্পিরিয়াল্ লাইব্রেরীতে গিয়া পেট ভরিয়া নানাবিধ পুস্তকাদি পাঠ করিতেন এবং অপরাহ্নে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা শুনিয়া অবশিষ্ট ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতেন। আমরা তাঁহাকে সাহিত্য-পরিষদে, ব্রাহ্ম সমাজে, রামকৃষ্ণ মিশনের উৎসবে এবং স্বদেশী ও অন্যান্য অনেক সভায় অসংখ্যবার

দেখিয়াছি। এমন হুজুগ ছিলনা যাহাতে পাঁচু মামা যোগদান না করিতেন। তবে তিনি কোন হুজুগেই নিজে মাতিতেন না, কেবল দর্শকরূপে 'কীর্ত্তনের' ধারে ধারে ঘুরিতেন মাত্র।

[৭]

পঞ্চানন ও 'স্বদেশী'

এই সময় বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে দেশে বয়কটের বান ডাকিয়াছিল। রাজনৈতিক গগনেও একটা গোলমেলে হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি এই বয়কট্ আন্দোলনের মধ্যে ফরাসীদেশের '৮৯ সালের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সাইক্লোনের পূর্ব্বলক্ষণ অনুমান করিতেছিলেন। রাজপুরুষেরাও নিদ্রিত ছিলেন না। যাহারা আধুনিক জগতের ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়াছে তাহারাই জানে যে, এইরূপ একটা বিরাট লোকান্দোলনের সময় শিক্ষিত পলিটিক্যাল্ সমাজ মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। আমাদের পণ্ডিত রাজপুরুষগণও ইহা বুঝিয়াছিলেন; এবং তাঁহারা আরও বুঝিয়াছিলেন যে, এই আন্দোলনের সময় ছাত্র ও যুবকদিগের প্রাণেই অধিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং তাহারাই ইহার অশান্ত বাহন হইয়া দাঁড়ায়। সে কারণে কর্ত্তৃপক্ষ এই শ্রেণীর উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতেছিলেন।

সন্ধ্যা-কার্য্যালয় এই আন্দোলনের একটী কেন্দ্র হইয়াছিল। অনেক 'স্বদেশী' ছাত্র ও যুবক এখানে সর্ব্বদা যাতায়াত করিত। সন্ধ্যা-সম্পাদকের সঙ্গে পঞ্চাননের এই আন্দোলন লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক হইত। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। একদিন সম্পাদক মহাশয় সমাগত যুবকদিগকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন যে, এই বয়কট্ বৃক্ষ যথাসময়ে গগনস্পর্শী হইয়া স্বরাজ ফল প্রসব করিবে। তাহা শুনিয়া পঞ্চানন বাবু বলিলেন—"এ বৃক্ষের গোড়ায় গলদ রহিয়া গিয়াছে; পরজাতী-বিদ্বেষের মৃত্তিকার উপর ইহাকে রোপণ করা হইয়াছে। সে জন্য আমার মনে হয় ইহা অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে।"

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—"পাঁচু বাবু! তবে কি আপনি বলেন, এ বিরাট আন্দোলনে কোন ফল হইবে না?" পঞ্চানন বলিলেন—"এ আন্দোলন ভবিষ্যতে নষ্ট হইয়া যাইবে একথা নিশ্চিত। ইহা হইতে স্বরাজ লাভের আশা নাই। তবে এইরূপ লোকান্দোলনের সময় জাতীয় হৃদপিণ্ডের স্পন্দন অনুভূত হয়, লোকমত উল্লম্ফনে এক পদ অগ্রসর হইয়া দাঁড়ায়। এই আন্দোলন যখন নষ্ট হইবে তখন লোক সমাজ পশ্চাৎপদ হইতে পারে; কিন্তু লোকমত একবার অগ্রসর হইলে আর পিছু হটিতে জানে না। রাজশক্তি এই অগ্রগামী লোকমতকে উপেক্ষা করিতে পারে না। রাজপুরুষেরা ইহাকে সাধ্যমত মানিয়া লইতে চেষ্টা করেন। এ আন্দোলনের ইহাই স্থায়ী ফল। ইহা আর কোনও হাতী ঘোড়া প্রসব করিবে না।

আর এক দিন সন্ধ্যা-সম্পাদকের সঙ্গে পঞ্চাননের তর্ক হইতেছিল। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—"আমি ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। সাহেবদের যাহা কিছু আছে তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমার কাছে তাহাদের কিছুই ভাল লাগে না। এমন কি, তাহাদের গায়ের সাদা রঙ্ পর্য্যন্ত আমার চোখে যেন ছুঁচ ফোটায়।"

পঞ্চানন বলিলেন—"রামধনুর সাত রকম রঙ্ একত্র মিশিয়া সাদা রঙ্ হয়। এই সাদা রঙ্ দেখিলে আপনার যখন চোখের যন্ত্রণা হয়, তখন বুঝিতে হইবে আপনার চোখের কোন গুরুতর রোগ হইয়াছে। এ বর্ণভীতি তাহারই লক্ষণ। আমার অনুরোধ, আপনি সত্বর একদিন মেডিকেল কলেজে গিয়া চক্ষু পরীক্ষা করাইয়া আসুন। এ রোগ না সারিলে আপনি ভগবানের সৃষ্টিসৌন্দর্য্য সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। পাশ্চাত্যের তুষার-ধবল বর্ণ, সুদূর প্রাচ্যের পীতাভ বর্ণ এবং ভারতের কৃষ্ণাভ বর্ণ—সকলই ভগবানের সৃষ্টি। ইহাদের সকলগুলিকে লইয়াই বিশ্বের বর্ণ-বৈচিত্র্য; ইহাদের কোনটিই সুস্থ চোখের পক্ষে কষ্টদায়ক হইতে পারে না।"

পঞ্চানন বাবুর এই সকল কিম্ভূত-কিমাকার মতবাদের জন্য অনেকে বলিত তাঁহার মাথায় কিঞ্চিৎ গোলযোগ আছে।

নন্দলালের 'স্বদেশী'।

স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ কৃষ্ণনগরেও লাগিয়াছিল। এ স্থানের কতকগুলি যুবক একজোট হইয়া একটি স্বদেশী সংকীর্ত্তনের দল গঠন করিয়াছিল। তাহারা নগরের হাটে পথে স্বদেশী গান গাহিয়া বেড়াইত, 'বন্দে মাতরং' ধ্বনি করিত এবং সকলকে বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করিতে অনুরোধ করিত। বিধুভূষণ নামে একটী যুবক এই দলের সর্দ্দার ছিল। আমাদের নন্দলাল এই হুজুগের সকল ব্যাপারে তাহার লেফ্‌টেনাণ্টের কাজ করিত। বিধুভূষণ কৃষ্ণনগর কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়িত এবং এক উকিল বাবুর বাসায় তাঁহার পুত্রের প্রাইভেট শিক্ষকরূপে অবস্থান করিত।

নন্দলাল স্বদেশী অর্থে বুঝিত কর্কচ লবণ, দেশী চিনি এবং তাঁতের কাপড়। বিধুভূষণ তাহাকে "লুণ চিনির স্বদেশী" বলিয়া ঠাট্টা করিত। বাস্তবিক, দেশী জিনিস পত্র ব্যবহার করা ব্যতীত স্বদেশীর মধ্যে আর কি থাকিতে পারে নন্দলাল তাহা বুঝিত না। তাহার বিদ্যার দৌড় এণ্ট্রান্স ফোর্থ ক্লাস পর্য্যন্ত। সে কাছারীতে মধ্যে মধ্যে "বসুমতী", "হিতবাদী" প্রভৃতি সংবাদপত্র পড়িত। তাহাতে অনেক স্বদেশী হাঙ্গাম-হুজ্জুতের কথা বাহির হইত। এই সকল লেখার কোন কোন অংশ সে ভাল রকম বুঝিতে পারিত না। যাহারা স্বদেশী প্রচার করে তাহাদের সঙ্গে পুলিসের অকৌশল হয় কেন? স্বদেশী সভায় পুলিস উপস্থিত থাকে কেন?

স্বদেশী যুবকদিগের উপর সি, আই, ডি, পুলিসের এত দৃষ্টি কেন? আবার তাহাদের কাহারও কাহারও পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়া থাকে কেন? কোন কোন স্বদেশী প্রচারক ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইয়া জেলে যায় কেন? আবার তাহারা খালাস হইলে তাহাদের জন্য 'লাঞ্ছিতের সম্মান' হয় কেন?—এই সকল ব্যাপার সে নিত্য সংবাদপত্রে পড়িয়াও সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। মোটের উপর নন্দলাল ঠিক করিয়া লইয়াছিল, যাহারা স্বদেশী করিতে গিয়া আইন ভঙ্গ করিবে তাহারা অবশ্যই দণ্ডার্হ।

যাহা হউক, বিধুভূষণের দল স্বদেশীর কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিল। একদিন তাহারা এক খরিদ্দারের নিকট হইতে একখানি বিলাতী কাপড় লইয়া বাজারের মধ্যে তাহার অগ্নিসংস্কার করিল। খরিদ্দার পুলিসে নালিস না করায় কোন কেস হইল না বটে; কিন্তু কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সম্ভবতঃ তাহা কর্তৃপক্ষেরও কাণে গিয়াছিল। কারণ, একদিন রাধাভল্লভ বাবু নন্দলালকে ডাকিয়া বলিলেন—"দ্যাখ নন্দ! তোমাদের নামে রিপোর্ট হইয়াছে। তুমি নাকি এখানকার স্বদেশীদলের একজন প্রধান পাণ্ডা। পুলিসের বড়সাহেব আমাকে একথা বলিয়াছেন। তুমি যে আমার মুহুরী তাহাও তিনি জানিয়াছেন। তুমি স্বদেশী-ফদেশী ছাড়িয়া দাও। ওসব হুজুগ করিয়া কোন লাভ নাই। ইংরেজরা হচ্চেন আমাদের রাজা। যে কাজ তাঁদের অপ্রিয় তাহা আমাদের করা উচিত নয়।"

নন্দলাল বলিল,—"দেশী কাপড় কিনিলে বা দেশী জিনিসপত্র ব্যবহার করিলে কি রাজার অপ্রিয় কাজ করা হয়?"

"দেশী জিনিসপত্র ব্যবহার করিলে বিশেষ দোষ হয় না সত্য ; তোমরা চুপে চুপে যত পার স্বদেশী করো না কেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু তোমরা পথে ঘাটে দল বেঁধে স্বদেশী গান গেয়ে বেড়াইলে, সকলে মিলে 'বন্দে মাতরং' বলে চীৎকার করিলে এবং যাহারা বিলাতী জিনিস কিনিবে তাহাদের উপর জোর-জবরদস্তি করিলে রাজপুরুষেরা বিশেষ কুপিত না হইয়া পারেন না।"

"কেবল নিজেরা দেশী জিনিসপত্র ব্যবহার করিলেই ত হবে না ; যাহাতে দেশের সকল লোক দেশী জিনিস কিনে তাহার জন্যও চেষ্টা করতে হবে। সেইজন্য আমরা সকল লোককে স্বদেশী মাল খরিদ করবার জন্য বুঝাইয়া বলি, সকলের প্রাণে স্বদেশী ভাব জাগাইবার জন্য আমরা স্বদেশী সংকীর্ত্তন করি এবং 'বন্দে মাতরং' ধ্বনি করি। আমরা ত কাহারও উপর জোর-জবরদস্তি করি না।"

"তবে আমি যে শুনিলাম, সে দিন বাজারে কে বিলাতী কাপড় কিনেছিল বলে, তোমরা নাকি তার সেই কাপড় নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলে?"

"আমরা তাকে দাম দিয়ে সন্তুষ্ট করে তার কাপড় নিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করেছিলাম।"

"কাপড়খানা পুড়িয়ে বাহাদুরী করবার কি দরকার ছিল? এ রকম বাহাদুরী না করলে কি 'স্বদেশী' করা হয় না?

"বাহাদুরী করবার জন্য নয়, সকলকে স্বদেশী শিক্ষা দিবার জন্য কাপড়খানা পোড়ান হইয়াছিল।"

"আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করিতে চাহি না। আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিলাম। কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার যেরূপ দহরম-মহরম আছে, আর তুমি যখন আমার মুহুরী, তখন তোমাকে আমার সাবধান করা আবশ্যক। তোমাকে লইয়া যদি কোন দিন একটা স্বদেশী পুলিস-কেস হয়, তাহোলে আমাকে সাহেবদের কাছে বড়ই লজ্জিত হ'তে হবে। অতএব তুমি ওসব হুজুগ ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে বার বার নিষেধ করছি।"

নন্দলাল আর কোন উত্তর করিল না।

---

[৯]

পিতৃ-বিয়োগ।

নন্দলাল বাসায় আসিয়া দেখিল বিধুভূষণ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সে বিধুভূষণকে রাধাবল্লভ বাবুর সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত বলিল। বিধুভূষণ রাধাবল্লভের উপর অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তাঁহার উদ্দেশে অনেক কড়া কথা বলিতে লাগিল। সুরেশ হা হা করিয়া হাসিয়া সকল কথা উড়াইয়া দিল; তাহার ভিতর বিশেষ পলিটিক্স্ ছিল না। পিতার পীড়ার জন্য সুরেশকে কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগরে আসিতে হইয়াছিল।

আজ তিন সপ্তাহ হইল নায়েব রামলাল মিত্র পক্ষাঘাত রোগে শয্যাগত। তাঁহার ডান পার্শ্বের সকল অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছিল। ডাক্তারী চিকিৎসা চলিতেছিল। ডাক্তার বাবু আসিয়া প্রত্যহ দুইবার শলা দিয়া প্রস্রাব করাইয়া যাইতেন। হেমাঙ্গিনী দিবারাত্র আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শুশ্রূষা করিত। রাধাবল্লভ বাবু মধ্যে মধ্যে নায়েব মহাশয়কে দেখিতে আসিতেন এবং তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা হেমাঙ্গিনীকে রোগীর সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিতেন।

বিশেষ চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নায়েব মহাশয় বিশেষ কষ্টে জড়াইয়া জড়াইয়া দু'চারটি কথা বলিতে পারিতেন। একদিন তিনি সুরেশকে বলিলেন—"বাবা! আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। আমাকে শীঘ্রই ভগবানের নিকট নিকাশ দিতে যাইতে হইবে। আমি তোমার জন্য বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারিলাম না। জীবনে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহা প্রায় সমস্তই সৎকাজে ব্যয় করিয়াছি; এবং তাহাতে প্রাণে বিশেষ শান্তি পাইয়াছি। সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যয় না হইলে তাহা অশান্তির কারণ হয়। আমার যেকিছু সামান্য সম্পত্তি রহিল তুমিই তাহার একমাত্র ওয়ারিস। সুতরাং আর এজন্য উইল করার আবশ্যক নাই। বাবা! তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ; সুতরাং তোমাকে আর কি উপদেশ দিব? তুমি ভগবানকে সর্ব্বদা ভক্তি করিবে এবং জীবনে যথাসাধ্য পরের উপকার করিবে। তুমি এই দুইটি কাজ করো কিনা তাহা আমি পরলোক হইতে লক্ষ্য করিব।"

সুরেশের চোখে জল আসিল।

তৎপরে নায়েব মহাশয় তাঁহার পত্নীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "গিন্নি! সুরেশের লেখাপড়া শেষ হয় নাই বলিয়া এতদিন তার বিবাহ দিই নাই। পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া যাইতে পারিলাম না, এই আমার দুঃখ রহিল। আমার দেহান্তে তুমি ভাল ঘরের একটি সুন্দরী লক্ষী মেয়ে দেখিয়া সুরেশের সঙ্গে বিহাহ দিবে। আর, তোমার পেটের মেয়ে নাই। এজন্য হিমু-মাকে তোমার মেয়ে বলে জ্ঞান করিবে। যতদিন না নন্দলাল নিজে রোজগার করিয়া আলাহিদা সংসার পাতিতে পারে, ততদিন তুমি তাহাদিগকে তোমার সংসারভুক্ত করিয়া রাখিবে।"

সেই রাত্রেই রামলাল মিত্র সম্পূর্ণ অবোল ও অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তাঁহার গভীর কোমা আসিয়া উপস্থিত হইল, নিশ্বাস টানা হইয়া দাঁড়াইল; নাড়ী পুষ্ট; সমস্ত শরীর স্পন্দহীন। এই ভাবে দুইদিন দুইরাত্র কাটিয়া তাঁহার প্রাণবায়ু অনন্তে লীন হইল।

[১০]

রাধাবল্লভের ব্যবস্থা।

নায়েব মহাশয়ের শ্রাদ্ধ শান্তিপুরে তাঁহার নিজ বাড়ীতেই হইয়াছিল। নন্দলালদেরও সেখানে যাইতে হইয়াছিল। শ্রাদ্ধান্তে সুরেশ কলিকাতায় চলিয়া গেল, তাহার অনেকদিন কলেজ কামাই

হইয়াছিল। নন্দলাল তাহার মাতা ও ভগ্নীকে শান্তিপুরে সুরেশ-দের বাটীতে রাখিয়া একা কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসিল। সে এখন হইতে রাধাবল্লভ বাবুর বাসায় আহারাদি করিয়া কাছারী যাতায়াত আরম্ভ করিল।

একদিন রাধাবল্লভ বাবু তাহাকে বলিলেন —"তোমার মা-বোনকে নায়েব মহাশয়দের দেশের বাড়ীতে রাখিবার প্রয়োজন কি? নায়েব মহাশয় স্বয়ং যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেন, সুতরাং দশজনকে অন্ন দিতে পারিতেন। তাঁহার পুত্রের কিছুই উপার্জ্জন নাই, সে কলিকাতার কলেজে পড়ে মাত্র। তার ঘাড়ে তোমাদের ভার চাপাইয়া দেওয়া ভাল দেখায় না। তুমি তোমার মা ও ভগ্নীকে এইখানে আনাইয়া লও। তাহারা ইচ্ছা করিলে আমাদের বাসা-তেই থাকিতে পারিবে। তাহোলে আমাদের নিত্য উড়ে বামণের হাতের রান্না খাওয়া ঘুচে যাবে। আর যদি তোমরা স্বতন্ত্র বাসা করিয়া থাকিতে চাও, তাহোলে নায়েব মহাশয়ের বাসা খালি পড়িয়া আছে, তোমরা সেই ঘর ভাড়া নিয়ে সেইখানে থাকিতে পার। তোমাদের সংসার যাহাতে চলিয়া যায় আমি তাহার একটা উপায় করিয়া দিব।"

সুরেশ তাহার বিশেষ বন্ধু হইলেও নন্দলালের ইচ্ছা নয় যে, সে তাহার স্কন্ধে তাহার মা-বোনের ভার চাপাইয়া রাখে। সুতরাং সে রাধাবল্লভ বাবুর পরামর্শমত তাহার মাতাকে পত্র লিখিল। রাধাবল্লভ বাবুর বাড়ীতে থাকিতে হেমাঙ্গিনী কিছুতেই রাজী হইল না। সুতরাং নন্দলালকে নায়েব মহাশয়ের শূন্য বাসায় স্বতন্ত্র সংসার পাতিতে হইল।

গোলাপী নাম্নী কাছারীর এক পানওয়ালী নন্দলালদের দোকান-বাজার করিয়া দিত এবং তাহাদের ঘরেরও দু'একটা হাল্‌কা কাজ-কর্ম্ম করিত। গোলাপ উহারই মধ্যে একটু সৌখীন লোক ছিল। সে জল তোলা বাসন মাজা কাপড় কাচা প্রভৃতি ছোট কাজ করিত না। এগুলি হেমাঙ্গিনী ও তাহার মাকেই করিতে হইত।

---

[১১]

গোলাপী পানওয়ালী।

আমাদের যে যে পাঠক কৃষ্ণনগরের কাছারীতে গিয়া গোলাপীর হাতের পান খাইয়া ও তাহার সহিত রসালাপ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আর আমাকে তাহার পরিচয় দিতে হইবে না। কিন্তু আমি জানি, অধিকাংশ পাঠকের অদৃষ্টে এ সুযোগ ঘটে নাই। সুতরাং তাঁহাদের সহিত গোলাপীর একটু পরিচয় করাইয়া না দিলে তাঁহারা দুঃখিত হইবেন, হয় ত কেহ কেহ আমার উপর কিছু রুষ্টও হইবেন।

তবে এই পরিচয় আমি দশ বৎসর পূর্ব্বে করাইয়া দিতে পারিলেই বিশেষ সুখী হইতাম। কারণ, তখন এই গোলাপ পূর্ণ প্রস্ফুটিত অবস্থায় সগৌরবে সৌরভ ছড়াইত। এখন লুণ্ঠিত-পরাগ নষ্টরাগ কাষ্ঠগোলাপ মাত্র। তথাপি মধুলোভী ভ্রমরবৎ

কাছারীর এক ধূমলোভী বকেয়া বৃদ্ধ পিয়াদা নিত্য আসিয়া তাহাকে 'বসরাই গোলাপ' বলিয়া সম্বোধন করিত এবং সেও তাহাকে 'দূর হ পোড়ারমুখো' বলিয়া অভ্যর্থনা করিত ও তামাক খাওয়াইত।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, গোলাপীর যখন বয়স ছিল তখন তাহার অন্য ব্যবসা ছিল। তখন তাহার অনেক খরিদ্দার জুটিত এবং সেই ব্যবসা চালাইয়া সে দশ পনেরখানা সোণাদানা ও কিছু নগদ টাকাও করিয়াছিল। শেষে এক শট লম্পটের প্রেমের ফাঁদে পড়িয়া তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। একদিন সেই মনচোর তাহার পেটারা হইতে গহনাপত্র ও টাকাকড়ি সমস্ত চুরি করিয়া অন্তর্দ্ধান হইল। গোলাপী পুলিসে ডায়রী করিল। পুলিসের বাবুরা তাহাকে লইয়া অনেকদিন ধরিয়া অনেক বাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু চুরির কিনারা করিতে পারিলেন না। এই সূত্রে দারোগা দীনদয়ালের সঙ্গে গোলাপীর বিশেষভাবে পরিচয় হয়। এইটুকুই তাহার লাভ। এই দারোগা বাবুর সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যতে দেখাশুনা হইবে।

গোলাপীর আর সাবেক ব্যবসায় চলিল না। তাহার বয়স গড়াইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং এখন তাহাকে কাছারীর বটবৃক্ষমূলে পানতামাকের বেসাতি লইয়া রার দিয়া বসিতে হইয়াছে। লোকের চিরদিন এক ব্যবসায় চলে না; কিন্তু এ ব্যবসাতেও তাহার পসার বড় কম ছিল না। স্থানীয় বার-লাইব্রেরীর সম্রাট্ কৃষ্ণনগরের ভাবী সরকারী উকিল স্বয়ং রাধাবল্লভ বাবু তাহার প্রধান খরিদ্দার ও পেট্রণ।

গোলাপীর কাছে তিনরকম তামাকের ব্যবস্থা ছিল। তামাকের পোড়া গুলগুলি গুঁড়াইয়া ভ্যালসার সঙ্গে সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সে একরকম তামাক তৈরী করিত, তাহা নিম্নশ্রেণীর মক্কেলদিগের জন্য। সে সারাদিন হরদম্ এই তামাক সাজিয়া যরে আসিতে পারিত না। তলপের অল্পতা প্রযুক্ত এই তামাকের সঙ্গে রসিকতার রসান দিয়া গোলাপ মামলাবাজ পদ্মরাজদিগকে তুষ্ট করিয়া দিত। এই করিয়াই তাহার আবার তাগা বালা ও মাকড়ী হইয়াছিল। সাধারণ উকিল মোক্তার ও পুলিসের কর্ম্মচারীদের জন্য সে মিঠেকড়ার সঙ্গে দাকাটা মিশাইয়া দিত। কেবল খোদ রাধাবল্লভ বাবুর জন্য সে প্রত্যহ একটু খাস অম্বুরি সংগ্রহ করিয়া আনিত; এবং তাঁহার জন্য যে পান সাজিয়া দিত তাহাতে স্ফূর্ত্তি ও ছোট এলাচ দিত। রাধাবল্লভ বাবু তাহাকে প্রতি মাসে দুটি করিয়া টাকা দিতেন। তৎসওয়ায় গোলাপী তাঁহার আর এক বিষয়ে কমিশন-এজেণ্ট ছিল।

একদিন কলিকাতা হইতে রাধাবল্লভ বাবুর এডিটার-বন্ধু তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। দুইজনে বার-লাইব্রেরীতে বসিয়া ৫৷৷০ টা পর্য্যন্ত অনেক রাজনৈতিক কথোপকথন হইল। এডিটার মহাশয় বিচারবিভাগ ও শাসনবিভাগ পৃথক্ করার পোষকতায় তাঁহার পত্রিকায় দুইটি প্রবন্ধ লিখিবার অনুরোধ করিয়া বিদায় হইলেন। অন্যান্য উকিল মোক্তার সকলেই চলিয়া গিয়াছিল। রাধাবল্লভ সেই ঘরের মধ্যে তখন একা; এমন সময়ে গোলাপী তাঁহার জন্য পান তামাক লইয়া উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন —"গোলাপ! অনেক দিন হয়ে গেল যে; একবার মুখ

বদ্‌লাইয়া দাও। ভাল মাল-টাল যোগাড় হোল ?”

গো। শুনতে পাচ্ছি নাকি তারিণী বাড়ীওয়ালীর বাড়ীতে কলকাতার সোনাগাছী থেকে ভাল নূতন মাল আমদানী হয়েছে। আজ খবর নেব অখন। মাল পছন্দ হলে বাবু আমাকে দশ টাকা বোস্‌কিস্‌ করতে হবে কিন্তু।

রা। তথাস্তু; আমি তোমাকে কবে খুসী করতে নারাজ গোলাপ? ভাল কথা মনে পড়েছে, তুমি ত নন্দদের বাসার কাজ-কর্ম্ম করে দাও? নন্দর বোনটাকে বাগাতে পার না? ছুঁড়ী ভারী সুন্দরী।

গো। সে আর আমায় বলে দিতে হবে না বাবু! আমি খুব চেষ্টায় আছি। কিন্তু ছুঁড়ী বড় ঘাগী। দেখা যাক, কতদূর কি করে উঠতে পারি।

[১২]

‘বন্দে মাতা’র তকরার।

নন্দলালদের বাসায় আসিয়া গোলাপী হেমাঙ্গিনীকে একা পাইলে তাহার কাছে প্রায়ই রাধাবল্লভ বাবুর কথা পাড়িত এবং তিনি যে কত উচ্চদরের ব্যক্তি, তাঁহার কিরূপ হাত দরাজ, তিনি কতদূর আমুদে ও রসিক লোক তাহা বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিত।

এইসকল কথার বেশী বাড়াবাড়ি করিয়া যখন সে দেখিত যে, হেমাঙ্গিনী বিরক্ত হইতেছে, তখন নন্দলালের কথা আনিয়া ফেলিত এবং কাছারীতে রাধাবল্লভ বাবু কত কৌশলে মক্কেলদের দ্বারায় নন্দবাবুকে কত রকমে কত টাকা পাওয়াইয়া দেন তাহা বলিয়া অপ্রিয় কথা চাপা দিত।

একদিন হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে গোলাপীর এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় বিধুভূষণকে সঙ্গে লইয়া নন্দলাল বাসায় আসিল। গোলাপী বিধুভূষণকে কৃষ্ণনগরের যত স্বদেশী গণ্ড-গোলের গুরুমহাশয় বলিয়া জানিত। তাহাকে দেখিয়া গোলাপী জিজ্ঞাসা করিল—"হঁ্যাগা বাবু! এবার তোমাদের সেই আর বছরের মত আরন্ধ আর রাখীবন্ধন হবে না ?"

বি। হবে বই কি গো! ৩০ শে আশ্বিন হচ্চে রাখীবন্ধনের দিন। এবারে ঐ দিনে তোমরা কাছারীতে পান-টান বেচতে পারবে না, সব দোকানপাট, সব বেচাকেনা বন্ধ করতে হবে।

গো। সে কি গো বাবু! কাছারী বন্ধ হবে নাকি ?

বি। না, কাছারী খোলা থাকবে।

গো। যদি কাছারী খোলা থাকে তাহোলে উকিল মোক্তার মক্কেল টক্কেলদের সকলকেই ত আসতে হবে। তারা পান তামাক খেতে পাবে না গা ?

হেমাঙ্গিনী বলিল—"একদিন পান তামাক না খেলে কি আর চলে না ?"

গো। তামাক না খেতে পেলে যে বাবুদের পেট ফুলে উঠবে; হঁ্যাগা বাবু! সে দিন তোমাদের আর কি কি হবে ?

বি। সংকীর্ত্তন হবে, সকলে নিশান ধরে গান গেয়ে নগর প্রদক্ষিণ করবে। বৈকালে বাজারে মস্ত সভা হবে, সেখানে অনেকে স্বদেশী বক্তৃতা করবে, সকলকে স্বদেশী প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

গো। সেই রকম সকলে 'বন্দে মাতা' বলে চ্যাঁচাবে? তোমরা 'বন্দে মাতা' বলে চ্যাঁচাও, আর দারোগা বাবু কত রাগ করে। তিনি বলে, পুলিসের বড়সাহেব 'বন্দে মাতা' শুনলে ভারি চটে যায়।

বি। সাহেবদের চটায় আমরা ভয় পাইনি।

গো। সে কি গো বাবু! সাহেবরা হচ্চে দেশের রাজা, তারা যে ধরে জেলে দিতে পারে।

হে। জেলে দেওয়া কিনা মুখের কথা? কোনও অপরাধ না করলে জেলে দেয় কার সাধ্য?

নন্দলাল বলিল—"অবিচার করে বিনা অপরাধে জেলে দিলেও হাইকোর্ট পর্য্যন্ত তার আপিল আছে।"

বি। আমি বিচার-ফিচার বুঝিনি। স্বদেশীর জন্য আমি জেলে যেতে প্রস্তুত আছি।

গো। তাহোলে তোমাদের স্বদেশী হচ্চে কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে বাদ করা!

এই কথা বলিয়া গোলাপী চলিয়া গেল।

রাধাবল্লভের ভৎ'সনার পর হইতে নন্দলাল স্বদেশী ব্যাপারে বড়একটা প্রকাশ্যভাবে যোগদান করিত না। বিধুভূষণ তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। এদিকে রাখীবন্ধনের দিন নিকট হইয়া আসিতে-

ছিল। নন্দলালের মত একজন উদ্যোগী কর্ম্মী পশ্চাৎপদ হয় ইহা বিধুভূষণ ইচ্ছা করিত না। এই হেতু সে আজ নন্দকে উত্তেজিত করিবার জন্য কাছারী হইতে তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল। নন্দলাল কাছারীর কাপড় ছাড়িয়া হাত মুখ ধুইয়া বিধুভূষণের সহিত বাহিরের ঘরে বসিয়া কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র, এমন সময় তাহার মাতুল পঞ্চানন রায় চৌধুরী ব্যাগ ও যষ্টি হস্তে আসিয়া উপস্থিত। অনেক দিন পরে তিনি তাঁহার ভগ্নীর অসুস্থ-সংবাদ পাইয়া দেখিতে আসিয়াছিলেন। হেমাঙ্গিনীর মাতার ইদানীং মধ্যে মধ্যে জ্বর হইতেছিল। পাঁচু মামাকে দেখিয়া বিধুভূষণ বিশেষ আনন্দিত হইল এবং তাঁহাকে কলিকাতার সকল স্বদেশী সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। পাঁচু মামাও বিধুভূষণকে সে রাত্রে এইখানেই আহার করিতে অনুরোধ করিলেন।

[১৩]

পঞ্চানন বনাম বিধুভূষণ।

বয়কট আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের একশ্রেণীর শিক্ষিত যুবকবৃন্দের প্রাণে যে একটা উচ্ছৃঙ্খল ও কঠোর ভাব দিন দিন জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহা পঞ্চানন বাবু বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—"যৌবনকালে আমাদের বসন্তের মলয়-পবন, কোকিলের কুহুধ্বনি, গোলাপের সুবাস, সঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কার বড়ই ভাল লাগিত। কিন্তু আজকালকার স্বদেশী ছেলেদের

কাছে এসকল নিতান্তই অর্থশূন্য। তাহারা ঝঞ্ঝাবাত উল্কাপাত বজ্রাঘাত ও ভূকম্পনের উপদ্রবের মধ্যে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়। প্রকৃতির মাধুর্য্য ও শান্তি তাহাদের ভাল লাগে না। যুবকদিগের স্বভাবের ঈদৃশ বিপর্য্যয় দেখিয়া পঞ্চানন ক্ষুণ্ণ হইতেন। সেকারণ তিনি কোনও উদ্ধত স্বদেশী যুবককে নিকটে পাইলেই তাহার সহিত তর্কবিতর্ক আরম্ভ করিয়া দিতেন; উদ্দেশ্য, তাহাকে সুবুদ্ধি দেওয়া—তাহাকে সৎপথে রক্ষা করা। বার্দ্ধক্য চিরদিনই যৌবনের উপর শিক্ষকতা করিবার অধিকার ও অভিলাষ রাখে।

পাঁচু মামা কৃষ্ণনগরে আসিলে বিধুভূষণের সঙ্গে তাঁহার নানাবিধ তর্ক বাধিয়া যাইত। এই উদ্দাম যুবকের সহিত পাঠকের আর একটু পরিচয় হওয়া আবশ্যক।

বিধুভূষণ অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন স্ফীতবক্ষ বলিষ্ঠ যুবক ছিল। তাহার আলিঙ্গনও তাহার হৃদয়ের অনুরূপ প্রশস্ত ছিল। সে মনে মনে সমগ্র দেশের লোককে আলিঙ্গন করিয়াছিল। বিধুভূষণের মা ছিলনা বলিয়া সে স্বদেশকেই সর্ব্বান্তঃকরণে মাতৃ সম্বোধন করিত। সে বলিত—"মা বলিয়া ডাকিবার জন্য যাহাদের স্বদেশ নাই এরূপ কোনও জাতি যেন পৃথিবীতে না থাকে।" বিধুভূষণ এক একটি দেশ-জননীর সকল সন্তানকে একত্রে ধরিয়া এক একটি জাতি বলিয়া গণনা করিত। তাহার মতে জাতি কখনও বর্ণ ও বংশগত হইতে পারে না—জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতা একই বস্তু।

বিধুভূষণ দেশবাসীর সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিত। খাদ্যদ্রব্য এত মহার্ঘ হইতেছে কেন? দেশের শিল্পবাণিজ্যের অবনতির কারণ কি? ধনীদিগের সঞ্চিত অর্থ কি উপায়ে দেশের কাজে

লাগাইতে পারা যায় ? কি উপায়ে লোক-সাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার হইতে পারে ? দেশের লোকের স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় কি ? সমাজ-শরীরের ভিতর কি কি মারাত্মক ব্যাধি আছে এবং তাহাদের প্রতীকারের পন্থা কি ? দেশবাসীর রাজনৈতিক স্বত্বাধিকার কিরূপে বৃদ্ধি পাইবে ? এইসকল বিষয় লইয়া বিধুভূষণ অনেক চিন্তা করিত।

স্বদেশের শোচনীয় অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে সে অনেক সময় উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়িত ; আবার কখন কখন নির্জ্জন গৃহে শয্যায় শয়ন করিয়া বালিশে মাথা গুঁজিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিত আর ইষ্টদেবীকে কাতর প্রাণে ডাকিয়া বলিত, "মা গো! তুমি একটা উপায় করিয়া দাও, একাজ কেবল মানুষের সাধ্যে কুলাইবে না।"

বিধুভূষণের প্রাণের সকল অবস্থা বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, এই যুবকের প্রাণ কুসুম হইতে কোমল হইলেও কখন কখন তাহা বজ্রাপেক্ষা কঠোর বলিয়া মনে হইত।

বিধুভূষণের প্রকৃতিতে বেশ একটু উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল। সে কোনও প্রকার বশ্যতা বা অধীনতার ভাব সহ্য করিতে পারিত না—নিজের পক্ষেও নহে, পরের পক্ষেও নহে। বিশ্বের সকল শৃঙ্খলার মূলে যে অধীনতা আছে, এবং এই অধীনতা মানিয়া না লইলে যে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার অস্তিত্ব থাকে না ইহা বিধুভূষণ স্বীকার করিত না। স্বদেশী আন্দোলনের বাতাস লাগিয়া তাহার এই দ্রোহিভাব এরূপ বাড়িয়া গিয়াছিল যে, একজাতি আর এক জাতির উপরে আধিপত্য করিবে ইহা সে অবিচলিত চিত্তে

কল্পনা করিতে পারিত না। তাহার মতে, ইহাতে উভয় জাতিরই অধোগতি অবশ্যম্ভাবী।

বিধুভূষণ অনেক দেশের ইতিহাস পড়িয়াছিল। সে দেখাইত,—পোলাণ্ডকে পরাধীন করিয়া, পোলদিগের জাতীয়তা নষ্ট করিতে গিয়া রাশিয়া নিজেরই ক্ষতি করিয়াছিল; গ্রীস ও থেসেলীকে পদানত করায় তুরস্কের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল; ইটালীর স্বাধীনতা হরণই অষ্ট্রীয়ার জাতীয় অবনতির মূল কারণ। বিধুভূষণ বলিত—"ভগবান স্বহস্তে সকল জাতির ললাটে জাতীয়তার তিলক পরাইয়া দিয়াছেন; দিগ্বিজয়ী রাজা তাহা মুছাইয়া দিতে পারেন না। তিনি এই চেষ্টা করিয়া কেবল নিজের শক্তির অপচয় করেন মাত্র। যে দেশ আজ ডুবিয়াছে, একদিন না একদিন তাহা আবার ভাসিয়া উঠিবে। জগতের ইতিহাস এই জাতীয় পুনরুত্থানের কথাই পুনঃ পুনঃ প্রমাণ করিয়া আসিতেছে। জাতীয় স্বত্বের তামাদি নাই।"

এই সকল পলিটিক্যাল্ কথা লইয়া সেদিন সন্ধ্যার পর নন্দলালদের বাড়ীতে প্রবীণ পঞ্চাননের সঙ্গে নবীন বিধুভূষনের অনেক তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। দেশের ও সমাজের কাজ কিভাবে করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিশেষ মতভেদ্ দৃষ্ট হইল। উভয়েই সমাজের আমূল পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী; উভয়েই স্বীকার করিতেন সমাজের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন-স্রোত অপ্রতিহত ভাবে চলা আবশ্যক, যেহেতু এই স্রোত বন্ধ হইয়া গেলে সমাজের জীবন-সলিলে আবর্জ্জনা জমিয়া তাহাকে পচাইয়া তুলিবে। পাঁচুমামা ইচ্ছা করিতেন, এই স্রোত সতত স্বচ্ছ অনাবিল ভাবে স্বাভাবিক অবিরাম গতিতে উন্নতিসাগরাভিমুখে চলিতে থাক্। বিধুভূষণ

চাহিত, এই স্রোত প্রচণ্ড জলপ্রপাতের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমাজের ভাল-মন্দ সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া যাক্। বিধুভূষণ ও পাঁচুমামা উভয়েই সমাজের সর্ব্বস্তরে আলোক প্রবেশ করাইতে ইচ্ছা করিতেন। পাঁচুমামা এই আলোকের জন্য রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষা করিতে চাহিতেন। তিনি বলিতেন; প্রভাতের অরুণ কিরণে সমাজ সুন্দররূপে আলোকিত হইবে এবং তাহাই বাঞ্ছনীয়। অধীর বিধুভূষণ নিশাবসানের অপেক্ষা না করিয়া সমাজগৃহে আগুন লাগাইয়া তাহারই বীভৎস আলোকে তাহাকে অলোকিত দেখিতে অভিলাষ করিত। সে বলিত, "যে অগ্নিশিখা দগ্ধ করে, তাহা আলোকও ছড়াইয়া দেয়।"

[১৪]

রাধাবল্লভের দয়া।

বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই শ্রাবণের ধারার সঙ্গে ম্যালেরিয়ার একটা নিকট সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এতদিন শুনিয়া আসিয়াছি, বর্ষাকালে খাল বিল পুষ্করিণীর আবদ্ধ জলে পাতা পচিয়া ম্যালেরিয়ার বিষ উৎপাদন করে এবং এনোফিলি নামক মশক তাহা গৃহে গৃহে সরবরাহ করে। এখন আবার কোন বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, যেখানে বর্ষার জল নিঃসরণের উপায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেইখানেই ঐ ঋতুতে ম্যালে-

রিয়া দেখা দেয়; এবং যেসকল স্থান বর্ষাকালে বেশ জলে ডুবিয়া থাকে সেসকল স্থানে এই রোগ আদৌ দৃষ্ট হয় না। এসকল হচ্চে পণ্ডিতদিগের মতবাদ। কিন্তু যাহাদের পেটে পাণ্ডিত্যের অভাব তাহাদের অনেকের মতে পুষ্টিকর খাদ্য ও পানীয় জলের ভাল পুষ্করিণীর অভাবেই বাঙ্গালার পল্লীগ্রামগুলিতে ম্যালেরিয়া শিকড় গাড়িয়া বসিতেছে।

যে কারণেই হউক, কৃষ্ণনগরে এবার ম্যালেরিয়া প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছিল। হেমাঙ্গিনীর মাতা এই জ্বরে আজ দুইমাস শয্যাগত। তাঁহাকে প্রথমতঃ প্রকাশ্য কুইনাইনঘটিত 'সিন্ধু' ও 'বিন্দু'-যুক্ত নামের অনেকরকম আরক খাওয়ান হইয়াছিল; এসকল ব্যর্থ হইলে গুপ্ত কুইনাইন মিশ্রিত জ্বরবজ্র-গজকেশরী প্রভৃতি নামের বহুবিধ বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় বড়ীও খাওয়ান হইতেছিল। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার সত্বর আরোগ্যের উপায় হইল না।

নন্দলালের মা'র এই অসুখের সময় রাধাবল্লভ বাবু মধ্যে মধ্যে দেখিতে আসিতেন। গোলাপী আসিয়া হেমাঙ্গিনীকে পূর্ব্বাহ্নে তাঁহার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া যাইত। রাধাবল্লভ আসিয়া রোগীর পথ্যাদির জন্য প্রায় দু'চার টাকা দিয়া যাইতেন। নন্দ উপস্থিত থাকিলে তাঁহার সাহায্যের মাত্রা ও অবস্থিতিকালের মাত্রা কিছু কম হইত। নন্দ না থাকিলে তিনি হেমাঙ্গিনীর হাতে নূতন কলের চক্‌চকে টাকা কিছু অধিক করিয়া দিতেন এবং অনেকক্ষণ রোগীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে নানাবিধ কথা কহিয়া তাহাকে কথা কহাইবার চেষ্টা করিতেন। হেমাঙ্গিনী তাঁহার সকল কথায় 'হাঁ', 'হুঁ', 'না' বলিয়া সারিয়া দিত।

একদিন রাধাবল্লভ এইরূপে হেমাঙ্গিনীকে একা পাইয়া বলিল —"হেমাঙ্গিনী, তোমার মা'র চিকিৎসার জন্য যদি বেশী টাকার দরকার হয়, আমাকে বলবে; আমার কাছে লজ্জা ক'র না।"

হেমাঙ্গিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। সে তাহার মাতার সঙ্কটাপন্ন পীড়ার কথা ভাবিল; অর্থাভাবপ্রযুক্ত চিকিৎসার ত্রুটির কথা ভাবিল; ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা, আপনি অনুগ্রহ ক'রে গোটা পঁচিশ ত্রিশ টাকা পাঠাইয়া দিবেন। আমার ইচ্ছা করে, একজন বড় ডাক্তারকে দু'চার দিন আনাইয়া একবার মাকে দেখাই; নাহোলে একটা ভারি দুঃখ থেকে যাবে।"

রাধাবল্লভ পকেট হইতে পঞ্চাশ টাকার নোট বাহির করিয়া হেমাঙ্গিনীর হাতে দিল। দিয়া বলিল—"হেমাঙ্গিনী, আমি তোমার কোন দুঃখ রাখব না, আমি তোমায় বড় ভালবাসি। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। তোমার যা যখন দরকার হবে আমাকে প্রাণ খুলে বলবে।"

হেমাঙ্গিনী চমকিয়া উঠিল, বিশেষ বিরক্ত হইল, আপনাকে অপমানিত বোধ করিল। সে একবার মনে করিল, টাকা ফিরাইয়া দিবে। কিন্তু তাহার মায়ের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাহা পারিল না। প্রত্যুৎপন্নমতি যুবতী তখন উত্তর করিল—"আমি আপনার ছোট বোন; আমরা আপনার আশ্রিত। আমাদের এ বিপদে আপনি না দেখলে কে দেখবে?"

এইকথা বলিয়া হেমাঙ্গিনী তাহার মাতার জন্য পথ্য প্রস্তুতের অছিলা করিয়া রন্ধনশালায় চলিয়া গেল। তাহার মা তখন নিদ্রা যাইতেছিলেন। রাধাবল্লভ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সেদিনের

মত বিদায় হইলেন। যাত্রাকালে মনে মনে এইরূপ জমাখরচ করিলেন যে আজ কাজ কিছু অগ্রসর হইয়াছে।

[১৫]

খণ্ড প্রলয়।

রোগ দীর্ঘস্থায়ী হইলে জরা ও মরণকে আহ্বান করে। যেখানে মরণ না আসে, সেখানে জরা আসিয়া উপস্থিত হয়। হেমাঙ্গিনীর মাতা অনেকদিন কঠিন রোগে ভুগিয়া মরিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার শরীর চিরদিনের জন্য ভাঙ্গিয়া পড়িল, সমস্ত চুল পাকিয়া গেল, গাত্রচর্ম্ম ও সর্ব্বাবয়ব শিথিল হইয়া আসিল।

এখন হইতে একা হেমাঙ্গিনীর উপরেই সংসারের সকল কাজের ভার পড়িল। তাহাকে ছড়া-ঝাঁট হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদীপের সলিতা পাকান পর্য্যন্ত সমস্তই করিতে হইত। হেমাঙ্গিনী মধ্যে মধ্যে বলিত, তাহার ভাই বিবাহ করিয়া একটি ডাগর-ডোগর বউ আনিলে তাহার অনেক আসান হইবে।

একদিন হেমাঙ্গিনীর দৈনন্দিন সমস্ত কার্য্য প্রায় সারা হইয়াছে, এমন সময়ে গোলাপী আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি ৮টা বাজিয়া গিয়াছিল। গোলাপী রাত্রে কখনও হেমাঙ্গিনীদের বাড়ীতে আসিত না। সেদিন সে কি মনে করিয়া আসিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। তবে নন্দলাল যে বাড়ী ছিল না, কলিকাতায়

গিয়াছে তাহা গোলাপী জানিত। সে জিজ্ঞাসা করিল—"নন্দবাবু আজ বাড়ী আসবেন না?"

হে। নন্দ ব'লে গেছে যদি আজ রাত্রে আসা ঘটিয়া না উঠে, তাহোলে কাল ১১ টার মধ্যে এসে কাছারী যাবে।

গো। পরশুদিন রাধাবল্লভ বাবু তাঁর একটা মক্কেলের কাছ থেকে নন্দবাবুকে দশ টাকা পাওয়াইয়া দিয়াছেন। সেই মক্কেলটার মোকদ্দমা জিত হয়েছিল। বাবু তাকে বল্লেন—'আগে আমার মুহুরীকে দশটি টাকা দিয়ে খুসী কর, তবে আমি খুসী হব।'

হে। হাঁ, নন্দ ঘরে এসে আমাদের সে কথা বলেছিল। মা শুনে কত আহ্লাদ করলেন।

গো। রাধাবল্লভ বাবুর নজরটা ভারি উঁচু দিদি। তোমার মা'র ব্যায়রামের সময় তিনি তোমার হাতে যে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন সে কথা সেদিন আমি তাঁর মুখে শুনলুম। তিনি আমাকে বল্লেন—'গোলাপ! তুমি হেমাঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা কোর, তার আরও টাকার দরকার আছে কি না?' তোমার উপর ভাই, বাবুর ভারি নেক নজর পড়েছে। আমাকে কেবলই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন। এইবারে ভাই তোমার বরাত খুলে যাবে।

এই কথায় হেমাঙ্গিনীর নিশ্চয়ই ক্রোধ হইয়াছিল। কিন্তু সে এই ক্রোধ প্রকাশ করিবার অবসর পাইল না, তাহা হঠাৎ ভয়ে পরিণত হইল। কারণ, এই সময় অকস্মাৎ রাধাবল্লভ মত্ত অবস্থায় টলিতে টলিতে 'গোলাপ গোলাপ' বলিয়া ডাকিতে ডকিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া গোলাপী বলিয়া উঠিল—"এই যে বাবু এসেছেন। বাবু! আপনারই কথা হচ্ছিল।"

হেমাঙ্গিনী এই সময় খিড়কীর দরজা দিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল। গোলাপী 'দাঁড়াও দাঁড়াও, পালিও না, ভয় নাই' বলিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে তাহার হাত ছাড়াইয়া পালাইয়া গেল।

রাধাবল্লভের সেদিন পানের মাত্রা কিছু অধিক হইয়া পড়িয়াছিল। গোলাপী সম্ভবতঃ তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল; কিন্তু সে তাহাকে এখানে আজ এরূপ সীমাতিরিক্ত মত্ত অবস্থায় দেখিবে, এরূপ আশা করে নাই।

"কৈ, হেমাঙ্গিনী কোথায়? আমি হেমাঙ্গিনীকে চাই! আমি হেমাঙ্গিনীকে চাই! যত টাকা চায় দেবো—এখনি দেবো। হেমাঙ্গিনীকো লেয়াও—আভী লেয়াও"—বলিয়া রাধাবল্লভ চীৎকার করিতে লাগিল।

"বাবু, চেঁচিও না, চুপ কর, চুপ কর"—বলিয়া গোলাপী তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে চেষ্টা করিতেছিল। মাতালকে মিষ্ট কথায় ঠাণ্ডা করিতে গেলে তাহার উপদ্রব আরও বাড়িয়া যায়। সুতরাং সে তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে পারিল না। তাহাকে ঠাণ্ডা করিল আর দুইজন লোক আসিয়া।

এই সময় নন্দলাল ও সুরেশ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সুরেশ রাধাবল্লভকে সজোরে একটি ধাক্কা মারিল। তাহাতে রাধাবল্লভ পড়িয়া গেল, কিন্তু আবার উঠিয়া দাঁড়াইল; নন্দলাল তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল। হেমাঙ্গিনীর মা তখন কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াছিলেন। গোলাপী—"ওগো মেরে ফেল্লে গো" বলিয়া

চীৎকার করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। পাড়ার দু'চারজন লোক গোলমাল শুনিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এইরূপে সগোলাপ রাধাবল্লভের সেরাত্রির অভিসারাভিনয় খণ্ড প্রলয়ে পরিসমাপ্ত হইল।

[১৬]

চিত্ত-বিক্ষোভ।

অনধিকারপ্রবেশের বিরুদ্ধে আইন আছে। সমাজের শৃগাল কুক্কুরের বিরুদ্ধেই তাহা প্রধানতঃ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সমাজের সিংহ শার্দ্দূলদিগকে এ আইনের ফাঁদে ফেলিতে বড় একটা কেহ সাহস করে না। রাধাবল্লভও সম্ভবতঃ একারণে এই ফাঁদে পড়িল না।

কিন্তু অনধিকার কাণাঘুসার বিরুদ্ধে কেন যে কোন আইন নাই তাহা বলিতে পারি না। এরূপ একটি আইন থাকিলে অনেকের মুখ বন্ধ হইত ও সমাজের অনেক গ্লানির উপশম হইত। এবং তাহা হইলে সম্ভবতঃ হেমাঙ্গিনীর অনিন্দ্য চরিত্র সম্বন্ধে রামীর মা, শ্যামীর মাসী, চমৎকারের পিসী ও সৈরভী গৈরবীর টীকাটিপ্পনী কাটা কিঞ্চিৎ স্থগিত থাকিত।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর হইতে নন্দলাল কাছারী যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল। সুরেশ তাহাদিগকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইতে পরামর্শ দিয়া চলিয়া গেল। সে নন্দলালের মা ও ভগ্নীর সঙ্গে দেখা করিতে

আসিয়াছিল। সুরেশ বলিয়া গেল, কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জলে বাস করা চলিবে না ; রাধাবল্লভ হচ্চে কৃষ্ণনগরের কুমীর।

এদিকে পাড়ায় ও কাছারীতে এ সম্বন্ধে অনেক রকম জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হইল। দুষ্টলোকে বলিল, নন্দর ভগ্নী রাধাবল্লভের নিকট হইতে অনেক টাকা খাইয়াছিল, এবং তাহার সম্মতিক্রমেই তিনি সে রাত্রে তাহাদের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। গোলাপীও ঠারে-ঠোরে এই কথার পোষকতা করিত। রাধাবল্লভ এই অপবাদে আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিলেন। "তেজীয়সাং ন দোষায়"। এই হোল আমাদের সমাজের বিচার। সমাজ অকলঙ্ক কমলিনীকেই কলঙ্কপঙ্কে নিমজ্জিত করিতে জানে।

এই সকল গুজবের দু'একটা কথার প্রতিধ্বনি মধ্যে মধ্যে নন্দলালের কাণে বাজিয়া তাহাকে মর্ম্মাহত করিত। একদিন রাধাবল্লভের বন্ধু দারোগা দীনদয়াল তাহাকে পথে দেখিতে পাইয়া বলিল—"নন্দলাল ! তুমি রাধাবল্লভ বাবুর সঙ্গে দেখা কর না কেন ? তিনি তোমাকে বড়-কুটম্বের মত জ্ঞান করেন, তোমাকে কত ভালবাসেন। আর তুমি তাঁর উপর অভিমান ক'রে কাছারীর কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে চুপ্‌টি ক'রে বাড়ী বসে আছ ? তোমার মত আহাম্মক ছেলেমানুষ ত আমি দুনিয়ায় দেখিনি। এরূপ ক'রে থাকলে তোমাদের দিন চলবে কি ক'রে ?"

এই কথায় নন্দলালের মনের মধ্যে ক্রোধের কটাহ টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া এই গরীব যুবককে মনের ক্রোধ মনেই মিটাইতে হইল। নন্দলাল পুলিস কর্ম্মচারীর সহিত বিবাদ করিতে চিরদিনই নারাজ।

একদিন গোলাপী আসিয়া নন্দলালকে বলিল—"আপনাদের উপর রাধাবল্লভ বাবুর সকল রাগ পড়িয়া গিয়াছে। আপনারা তাঁর যা 'খোয়ার' করেছিলে, তাও তিনি ভুলে গেছেন। বাবু আপনাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।"

নন্দলাল গোলাপীকে কড়াকড়া কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দিল এবং বলিয়া দিল যেন সে আর তাহাদের বাড়ীতে না আসে।

নন্দলাল তাহার মা ও ভগ্নীকে লইয়া কলিকাতায় যাইবে স্থির করিয়াছিল। কিছু টাকা যোগাড় হইলেই সে তাহা হইতে বাজার দেনা ও ঘরের ভাড়া যাহা বাকী পড়িয়াছিল তাহা মিটাইয়া দিয়া চলিয়া যাইবে। সে এই টাকার জন্য সুরেশকে পত্র লিখিয়াছিল। রাখীবন্ধনের দিন নিকট হইয়া আসিতেছিল। তাহার পূর্ব্বেই নন্দলালের কৃষ্ণনগর হইতে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল।

[১৭]

৩০শে আশ্বিন।

এ বৎসর ৩০ শে আশ্বিন বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র যেরূপ হইয়া থাকে কৃষ্ণনগরেও সেইরূপ হইল। প্রাতে 'স্বদেশী' যুবকেরা দলবদ্ধ হইয়া নদীতে স্নান করিয়া পরস্পরের হাতে রাখীবন্ধন করিল এবং স্বদেশী গান গাহিয়া ও বন্দে মাতরং ধ্বনি করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। দোকানপাঠ যাহাতে বন্ধ থাকে এবং সকল গৃহস্থই যাহাতে অরন্ধন-ব্রত পালন করে, তৎপ্রতি সকলেরই

দৃষ্টি। স্থানীয় কয়েকজন জুনিয়ার উকিল যুবকদলের নেতারূপে কার্য্য করিতেছিলেন। যুবকেরা যাহাতে জোর-জবরদস্তি করিয়া কাহারও দোকান বন্ধ না করে বা কোনরূপে শান্তিভঙ্গ না হয়, সে বিষয়ে পুলিসের লোক খুব নজর রাখিতেছিলেন।

সুরেশের নিকট হইতে এতাবৎ টাকা না আসায় নন্দলালদের কলিকাতায় যাওয়া হয় নাই। সে এবার এই রাখীবন্ধন ব্যাপারে পূর্ব্বের ন্যায় যোগদান করিল না। নন্দলাল সকলকে বলিয়াছিল, তাহার শরীর অসুস্থ। কিন্তু বিধুভূষণ ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গগণ তাহাকে ছাড়িবে কেন? তাহারা সদলবলে নন্দলালদের বাসায় গিয়া তাহার হাতে রাখীবন্ধন করিয়া দিল। নন্দলাল কিন্তু সেদিন কিছুতেই বাড়ীর বাহির হইল না। 'স্বদেশী' যুবকেরা ফিরিয়া আসিবার সময় পথে সংবাদ পাইল যে, দক্ষিণ পল্লীতে নটবর বিশ্বাসের ঘরে উনান জ্বালা হইয়াছে এবং সেখানে রন্ধন-কার্য্য চলিতেছে। শ্রবণমাত্র তাহারা নটবরের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া বন্দে মাতরং ধ্বনি করিল; এবং বাস্তবিকই সেখানে রন্ধন হইতেছে দেখিয়া তাহারা নটবরকে তাহা বন্ধ করিবার জন্য নানারকমে বুঝাইতে লাগিল। কিন্তু নটবর কিছুতেই সম্মত হইল না; সে ক্রমেই স্বদেশী ছেলেদের উপর গরম হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন বিধুভূষণও রাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বলিল—"তোমরা যদি স্ব-ইচ্ছায় রান্না বন্ধ না কর, তাহা হইলে, আমি রসুই ঘরে ঢুকিয়া তোমাদের উনানে জল ঢালিয়া দিব। আর এজন্য যদি আমাদের মেয়াদ খাটিতে হয় আমরা তাহাতেও প্রস্তুত।" ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দারোগা মোবারেক আলি নটবরের ঘরের কানাচ হইতে সদলে বাহির

হইয়া যুবকদিগকে গ্রেপ্তার করিল এবং বলিতে লাগিল—"ভাল, দেখা যাক্ তোমরা কেমন মেয়াদ খাটিতে প্রস্তুত।" বিধুভূষণের সঙ্গে আর তিনজন যুবক ধৃত হইল। পুলিস তাহাদিগকে থানায় লইয়া গেল।

অপরাহ্নে বাজারে যে বিরাট সভা হইয়াছিল, তাহাতে পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অনেকগুলি পাহারাওয়ালা লইয়া স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থলে যখন একজন বক্তা ঐ যুবকদিগের গ্রেপ্তারের কথা উত্থাপন করিলেন, তখন শ্রোতৃবৃন্দ কিছু রোষবিচলিত হইয়া উঠিল। শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা দেখিয়া পুলিসের সাহেব সভা ভাঙ্গিয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

তৎপরে সভার প্রধান পাণ্ডা উকিলবাবুরা বার-লাইব্রেরীতে সমবেত হইয়া 'কিং-কর্ত্তব্য' বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। স্বয়ং রাধাবল্লভ বাবু সংবাদপত্রে পাঠাইবার জন্য চুপেচুপে একখানি টেলিগ্রামের মুসবিদা করিয়া দিলেন। এইরূপ দেশের কাজে তিনি বরের ঘরের পিসী ও কনের ঘরের মাসী। এই টেলিগ্রাম উকিল যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া কলিকাতার কয়েকখানি ইংরাজী দৈনিকপত্রে প্রেরিত হইল। তাহা এই,—

The Rakhi-day celebration at Krishnagar did not pass off smoothly. Four boys have been put under arrest on a charge of criminal intimidation and wrongful restraint. The Superintendent of Police with the help of a *posse* of constables dispersed a peaceful public meeting held in the after-

noon for protesting against the partition of Bengal. The public were mortified at this high-handed proceeding.*

[১৮]

খেলোয়াড়ের চাল।

থানার ইন্‌স্পেক্টর রঘুবাবু এই 'স্বদেশী' মোকদ্দমার একটু তদন্ত করিয়াই বুঝিতে পারিলেন, দারোগা মোবারেক আলি তিলকে তাল করিয়াছে। তিনি কর্ত্তৃপক্ষদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আসামী-গণ বাদীর উপর বিশেষ কিছুই অত্যাচার করে নাই। এরূপ কোনও অত্যাচার যে হইয়াছিল, তাহার পোষকতায় পুলিসের লোকের সাক্ষ্য ব্যতীত আর কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। এমতে আসামীদিগের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ হইতে মোকদ্দমা চালাইলে তাহা ফাঁসিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

* অর্থঃ—কৃষ্ণনগরে রাখীবন্ধনের ব্যাপার বিনা গোলযোগে সমাধা হয় নাই। অবৈধ ভয় প্রদর্শন ও বলপ্রয়োগের অজুহাতে চারজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অপরাহ্নে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করিবার জন্য যে সভা হইয়াছিল তাহা পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব একদল কনেষ্টবল লইয়া আসিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এই জুলুমের জন্য সাধারণে মর্ম্মাহত হইয়াছে।

রঘুবাবুর সত্যবাদীতার উপর ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের বিশেষ আস্থা ছিল। তিনি তাঁহাকে Reformed Hindu বলিয়া জানিতেন। সুতরাং তিনি পুলিসের সাহেবকে রঘুবাবুর এই রিপোর্ট দেখাইলেন। শেষে উভয়ে পরামর্শ করিয়া মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র রাধাবল্লভ বাবুর নিকট তাঁহার মতামতের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। সরকারী উকিল পীড়িত বলিয়া রাধাবল্লভ বাবুই কিছুদিন হইতে সরকারী উকিলের কাজ করিতেছিলেন।

পরদিবস রাধাবল্লভ ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কুঠিতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন যে ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য। তবে যে-চারিজন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, কেবল তাহাদিগকে লইয়া মোকদ্দমা দাঁড় করাইলে তাহা না টিকিতে পারে। তিনি বলিলেন, এখানকার সকল স্বদেশী উপদ্রবের একজন প্রধান পাণ্ডা হচ্চে তাঁহার ভূতপূর্ব্ব মুহুরী নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়। স্বদেশী দোষের জন্য তিনি তাহাকে মুহুরীর কাজ হইতে ছাড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি সঠিক অবগত হইয়াছেন, আসামীগণ নন্দলালের বাসায় গিয়া তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া তাহারই আদেশমতে রাখীবন্ধনের দিন নটবর বিশ্বাসের বাড়ীচড়াও করেছিল। সুতরাং নন্দলালকে আসামীশ্রেণীভুক্ত না করিলে মোকদ্দমায় জোর হইবে না। মোকদ্দমার তদন্তের প্রধান অংশ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। নন্দলালের বিরুদ্ধে এখনও প্রমাণ সংগ্রহ হয় নাই।

শেষে রাধাবল্লভ বাবু একটু ইঙ্গিতে বলিলেন যে, ইন্‌স্পেক্টর রঘুবাবু হচ্চেন ভালমানুষ। অনেক সময় ভালমানুষ অর্থে গর্দ্দভ

বুঝায়। বিশেষতঃ রঘুবাবুর দ্বারা কোনও স্বদেশী মোকদ্দমার প্রমাণের কিনারা হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর ভিতরে ভিতরে বিলক্ষণ 'স্বদেশী' আছে। এ সকল বিষয়ে কাজের লোক হচ্চে দারোগা দীনদয়াল। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এই দারোগাকে খুব দক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া মনে করেন।

পরদিন রাধাবল্লভবাবু তাঁহার রিপোর্টসহ মোকদ্দমার কাগজপত্র ফেরত দিলেন। রিপোর্টে লিখিলেন—"Evidence is insufficient; further enquiry necessary."

বলা নিষ্প্রয়োজন, এই দারোগার উপরেই তদন্তের ভার পড়িল।

[১৯]

দারোগা দীনদয়াল।

দারোগা দীনদয়াল যে একজন দক্ষ কর্ম্মচারী সে বিষয়ে আমাদিগেরও সন্দেহ নাই। কোন কোন পুলিস অফিসার মাতৃগর্ভ হইতে পুলিস হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। দীনদয়ালও এই শ্রেণীর লোক ছিল। সে ধ্রুব বিশ্বাস করিত সরকারী কর্ম্মচারী, বিশেষতঃ পুলিসের লোকদের কখনও ভ্রমপ্রমাদ হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত দেশের আর সকল লোক আইন ভঙ্গ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাকে সর্ব্বদা ইহাদের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পেটে কিঞ্চিৎ এলেম না থাকিলে কেহ দারোগা হইতে পারে না। দীনদয়াল যখন দারোগা, তখন বুঝিতে হইবে, সে নিরক্ষর ছিল না। সে বাংলায় রিপোর্ট লিখিতে পারিত। তাহার রিপোর্টের মধ্যে অনেক ফারসী লব্জও থাকিত; সুতরাং তাহার ভাষার মধ্যে কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়ার ব্যাকরণসঙ্গত সম্বন্ধ না থাকিলেও কোন ক্ষতি হইত না। তৎসওয়ায় দীনদায়ল দু'চারটি ইংরাজী রাজনৈতিক শব্দও উচ্চারণ করিতে পারিত। সে মডারেট্‌কে বলিত ম্যাডারেট্‌, আর এক্‌স্ট্রীমিষ্ট্‌কে বলিত এক্‌ষ্ট্রীমিটিজ্‌, পলিটিক্যাল্‌কে বলিত পলিকৃটিক্যাল্‌, কংগ্রেসকে বলিত কংগ্রাস্‌। একদিন দীনদয়াল কন্‌ফারেন্স্‌ বলিতে গিয়া সারকম্ফারেন্স্‌ বলিয়া ফেলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল যে ঠিক বলা হয় নাই এবং সে জন্য আপনাকে একটু অপ্রতিভ বোধ করিয়াছিল।

ধর্ম্মানুষ্ঠানে দীনদয়ালের বেশ একটু আস্থা দেখিতে পাওয়া যাইত। তারিণী বাড়ীওয়ালীর বাড়ীতে রাধাবল্লভ বাবু কাচের গ্লাসে হুইস্কি ঢালিয়া তাহাকে দিলে, সে তাহার উপরে কর ধরিয়া কয়েকবার বীজমন্ত্র জপ না করিয়া তাহা মুখে তুলিত না। দীনদয়াল বলিত, কলিতে তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকার সাধনা করিলে সত্বর সিদ্ধিলাভ হয়।

এই তারিণীর বাড়ীতে সে রাধাবল্লভ বাবুর সঙ্গে এই মোকদ্দমা সংক্রান্ত যাবতীয় পরামর্শ করিতে যাইত। কেবল এই মোকদ্দমা কেন, তারিণীর বাড়ী হইতে দীনদয়াল অনেক মোকদ্দমা ও ফেরার আসামীর কিনারা করিয়া লইত। তারিণীর বয়স পঞ্চাশের এদিকে ছিল। সুতরাং তাহাকে এখনও কুঁড়োজালি হাতে করিতে

হয় নাই। তাহার একটি মনের মানুষ ছিল। এই মানুষটির নাম ছিল প্রেমচাঁদ কড়ারী এবং বাড়ীওয়ালী মাসীর বাড়ীতে যে সকল স্ত্রীলোক ভাড়াটিয়া থাকিত, তাহারা প্রেমচাঁদকে বাড়ী-ওয়ালা মেসো বলিয়া সম্বোধন করিত। দারোগা দীনদয়ালের আদেশ ও উপদেশ অনুসারে এই সরকারী মেসোর একটি বিশেষ কাজ ছিল। কৃষ্ণনগরের হাট-বাজার কাছারীতে কোন নূতন লোককে দেখিয়া দীনদয়ালের মনে কিছু সন্দেহ হইলে, সে প্রেমচাঁদকে সংবাদ দিত। প্রেমচাঁদ সেই আগন্তুককে কৌশলে তারিণীর বাড়ীতে লইয়া গিয়া বাসা লওয়াইত এবং তাহার পিছনে একটি পছন্দসই মেয়েমানুষ ভিড়াইয়া দিত। এই মেয়েমানুষ ঐ আগন্তুককে প্রেমের কলে ফেলিয়া মদের মুখে তাহার পেটের সকল কথা বাহির করিয়া লইত। এমন পুরুষ কে আছে, যাহার পেটের মধ্যে মদ প্রবেশ করাইলে সেখানকার সকল কথা মুখ দিয়া বাহির করিয়া না দেয়? দীনদয়াল এই উপায়ে দুইটি খুনী আসামী গ্রেপ্তার করিয়া উপরওয়ালাদিগের নিকটে বিশেষ প্রশংসা পাইয়াছিল। সে এই জন্যই বলিত—"কলিতে পঞ্চমকারের যোগে সাধনা করিলে সত্বর সিদ্ধিলাভ হয়; অতএব দক্ষ পুলিস কর্ম্মচারীর তান্ত্রিক হওয়া আবশ্যক।"

পাঁচদিনের মধ্যেই দারোগা দীনদয়ালের তদন্তের অন্ত হইল। তদন্তের অধিকাংশই অকুস্থানে না হইয়া তারিণী বাড়ীওয়ালীর বাড়ীতেই হইয়াছিল। অবশেষে দারোগা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই মর্ম্মে রিপোর্ট করিল যে,—নটবর বিশ্বাসের উপর স্বদেশী যুবকেরা যে ভয় প্রদর্শন ও জবরদস্তি করিয়াছিল তাহার সন্তোষ-

জনক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যে চারজনা আসামীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহারা জনেক নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ের হুকুমমতে এই অপরাধ করিয়াছে। এই নন্দলালই স্থানীয় স্বদেশীদলের সর্দ্দার। আর এরূপ মালুম হয় যে ইহাদিগের মধ্যে পলিকৃটিক্যাল ষড়যন্ত্র চলিতেছে। অতএব হুকুম হইলে নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া তাহাকে ১নং আসামী করা যায়।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ইতিপূর্ব্বে সরকারী উকিলের মুখে নন্দলালের অপরাধের কথা শুনিয়াছিলেন। দীনদয়ালের রিপোর্টে তাহার সম্পূর্ণ পোষকতা হইল। দলপতিকে বাদ দিয়া দলকে শাসন করা যায় না। সুতরাং তিনি নন্দলালের সম্বন্ধে দারোগাকে যথাকর্ত্তব্য করিতে অনুমতি দিয়া খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা স্বাক্ষর করিয়া পাঠাইলেন।

এই হুকুম থানায় পৌঁছিলে ইন্সপেক্টর রঘুবাবু তাঁহার দারোগার কেরামতির দৌড় দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন। দীনদয়াল সেই রাত্রেই তারিণীর বাড়ীতে রাধাবল্লভের সঙ্গে দেখা করিল। তাহাদের মধ্যে কি কথোপকথন হইয়াছিল বলিতে পারি না।

[২০]

খানাতল্লাস।

পরদিন প্রাতে নন্দলালদের বাড়ী খানাতল্লাস হইল। দারোগা দীনদয়াল পঁচিশ ত্রিশজন পুলিস লইয়া তাহাদের বাড়ী ঘেরাও করিল। রঘুবাবু থানার ইন্‌স্‌পেক্টার বলিয়া সার্চ্চ-পার্টির কর্ত্তা হইয়া আসিয়াছিলেন। চারিদিকে একটা মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। অনেকে দেখিতে আসিল, কিন্তু পুলিস তাহাদিগকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিল না, তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের মধ্যে পানওয়ালী গোলাপীও ছিল, সেও দেখিতে আসিয়াছিল।

নন্দলালের ঘর সার্চ্চ করিয়া বাল গঙ্গাধর তিলকের একখানি ফটো, একখানি সন্ধ্যা, এবং গত বৎসরের এক স্বদেশী সভার কয়েকখানি বিজ্ঞাপন দারোগা দীনদয়ালের হস্তগত হইল। সে নন্দলালকে গ্রেপ্তার করিয়া হাত বাঁধিয়া তাহাকে চারিজন কনষ্টেবলের জিম্মা করিয়া দিল। এই দেখিয়া নন্দলালের মাতা মূর্চ্ছিতা হইলেন। হেমাঙ্গিনীও ভয় পাইয়াছিল। রঘুবাবু তাহার মায়ের চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে তাঁহার সংজ্ঞা হইল। বৃদ্ধা চক্ষু মেলিলেন, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল।

রঘুবাবু হেমাঙ্গিনী ও তাহার মাকে বলিলেন—"আপনাদের কোন ভয় নাই; আমি আছি, আপনারা কিছুমাত্র ভয় পাবেন না; আপনারা আমার মা বোন।"

হেমাঙ্গিনীর মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"বাবা, আমার

নন্দকে রক্ষা কর ; ও ছেলেমানুষ, কোন অপরাধ করেনি ; ওকে ছেড়ে দাও বাবা ! দোহাই তোমাদের !"

রঘুবাবু বলিলেন—"আপনার ছেলের উপর কোন অত্যাচার হবেনা ; আপনি ব্যাকুল হবেন না, স্থির হোন, কোন চিন্তার কারণ নাই ; ভয় নাই, নন্দলাল আমার কাছে রহিল।" এই বলিয়া তিনি নন্দলালের বন্ধন খুলিয়া দেওয়াইলেন। বৃদ্ধা কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—"আঃ বাবা, তুমি দীর্ঘায়ু হও ; আমার মাথায় যত চুল, তোমার তত বৎসর প্রমাই হোক।"

রঘুবাবুর উপদেশমত তখন হেমাঙ্গিনী তাহার মাকে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া বিছানায় শয়ন করাইয়া দিল।

দীনদয়াল রঘুবাবুকে বলিল—"বেশ কথা ; আপনি তবে আসামীর কাছে থাকুন, সে আপনার জিম্মায় রহিল। আমি একবার এই ঘরটা সার্চ করিয়া লই।" এই কথা বলিয়া সে প্রেমচাঁদকে সঙ্গে লইয়া হেমাঙ্গিনীর ঘরে প্রবেশ করিল। তল্লাসীর সাক্ষ্যরূপে প্রেমচাঁদকে তারিণীর বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনা হইয়াছিল।

"দাঁড়াও, আমিও যাচ্ছি"—বলিয়া রঘুবাবুও তাহাদের সঙ্গে প্রবেশ করিলেন। ইহাতে দীনদয়াল বিশেষ বিরক্ত হইল, কিন্তু আপত্তি করিতে পারিল না। রঘুবাবু তাহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী।

হেমাঙ্গিনীর ঘরে একটি মাত্র তোরঙ্গ ছিল। হেমাঙ্গিনী তাহার চাবি খুলিয়া দিল। রঘুবাবু স্বয়ং তাহার ভিতরের জিনিসপত্রগুলি একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া সকলকে লইয়া বাহিরে আসিলেন। দীনদয়াল হেমাঙ্গিনীকে দু'একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিল। রঘুবাবু তাহাকে একটু রূক্ষভাবে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে,

সে স্ত্রীলোক, এবং তাহার নামে কোন পরোয়ানা নাই।

তৎপরে রঘুবাবু হেমাঙ্গিনী ও তাহার মাকে বলিলেন যে, নন্দলালকে একবার তাঁহার সঙ্গে থানায় যাইতে হইবে। থানাতল্লাস করিয়া বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নাই। সুতরাং সাহেবকে এই-কথা জানাইয়া নন্দলালকে সত্বর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে; তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই।

পুলিসের দলবল নন্দলালকে লইয়া চলিয়া গেলে গোলাপীর গলাবাজী আরম্ভ হইল। সে সকলকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল - "এ সর্ব্বনেশে 'বন্দে মাতা' করা কেন বাপু? আহা, ভালমানুষের ছেলে গো! কি বিপদ দেখদেখি! মিছামিছি 'বন্দে মাতা বন্দে মাতা' ক'রে এ বিপদ ডেকে আনা কেন? কোম্পানির সঙ্গে বিবাদ করলে কি কারো ভালাই আছে?"

প্রতিবেশীদের সঙ্গে গোলাপীও সেদিন নন্দলালদের বাড়ীতে ঢুকিয়া হেমাঙ্গিনী ও তাহার মাতাকে আশ্বাস দিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল। সে বলিল—"যাতে নন্দবাবুকে খালাস দেওয়া হয় আমি সেজন্য দারোগাবাবুর পায়ে পর্য্যন্ত ধরব।"

সমূহ বিপদের সময় লোকে শত্রুমিত্র ভুলিয়া যায়। হেমাঙ্গিনীও পূর্ব্বের কথা ভুলিয়া গোলাপীর হাতে ধরিয়া অনুনয় করিতে লাগিল যেন সে তাহার ভাইকে খালাস করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

পাড়ার নরহরি রায় ও গোবিন্দ ঘোষাল বলিল, সরকারী উকিল রাধাবল্লভবাবু মনে করিলে নন্দকে এখনি খালাস করিয়া দিতে পারেন। তিনি যদি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও পুলিসের সাহেবকে একটু বলেন যে, নন্দর বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ নাই, তা'হলে তারা

এখনি তাকে ছাড়িয়া দিবার হুকুম দেন।

গোলাপী বলিল—"আমি এখনি গিয়ে রাধাবল্লভবাবুর পায়ে ধরব। যদি তাঁর হাত থাকে, তা'হোলে তাঁকে একাজ করতেই হবে। নাহলে আমি তাঁর কাছে আত্মহত্যা হব। আমি চল্লুম।"

গোলাপী চলিয়া গেল। সেদিন আর কেহ হেমাঙ্গিনী ও তাহার মাতাকে জলস্পর্শ করাইতে পারিল না।

[২১]

স্বদেশী কেস।

নন্দলালকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। গোলাপী একবার দীনদয়ালের কাছে, একবার রাধাবল্লভের কাছে এবং একবার হেমাঙ্গিনীর কাছে নিত্য ছুটাছুটি করিত। সে একদিন হেমাঙ্গিনাকে বলিল,—"ভাই, আমার সাধ্যে যাহা ছিল তাহা করেছি। আমি রাধাবল্লভ বাবুকে নিমরাজী করেছি। কিন্তু তুমি একটিবার তাঁর বাসায় গিয়া কান্নাকাটি না করিলে তিনি তোমার ভাইয়ের জন্য পুলিসের বড় সাহেবকে কিছু বলবেন না। আমি কাল তাঁর পা জড়াইয়া ধরেছিলাম। তিনি আমাকে বল্লেন, 'গোলাপ! তুই নন্দর জন্য রোজ আমার কাছে কান্নাকাটি কচ্ছিস। কিন্তু কই যার ভাইকে বাচাব, সে কি একবার এসে আমায় বল্‌তে পারে না যে আমার ভাইকে বাঁচাও?' আমি ভাই বল্লুম, 'কেন আস্‌বে না? আলবৎ আস্‌বে। বাবু, তুমি যদি ভরসা দাও, তা'হলে সে নিশ্চয়ই আস্‌বে।' আমি ভাই এই পর্য্যন্ত করেছি।

এখন দিদি তোমার হাত।”

হেমাঙ্গিনী কিছু উত্তর করিল না। সে মনে মনে কি ভাবিতে লাগিল। গোলাপী বলিল “ভাব্‌ছ কি? কিছু ভেব না। রাধাবল্লভ বাবু বলেছেন, তুমি গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করলেই, তিনি নন্দবাবুকে খালাস করে দেবেন।”

হেমাঙ্গিনী বলিল—“আচ্ছা, কাল আমি ঠিক করে তোমায় বল্‌ব। যেতে হয় ত তোমার সঙ্গেই যাব ”

হেমাঙ্গিনী সুরেশকে তাহার ভাইয়ের গ্রেপ্তারের কথা জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিল। আমরা গ্রন্থারম্ভে তাহা পাঠককে বলিয়াছি। সুরেশ সেই পত্র লইয়া কলিকাতার কয়েকজন ‘স্বদেশী’ নেতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। তাঁহারা এই মোকদ্দমার জন্য একজন দেশী জুনিয়ার ব্যারিষ্টারকে ঠিক করিয় দিলেন সুরেশ ব্যারিষ্টার সাহেবকে লইয়া কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইল। ব্যারিষ্টার উকিল যোগেশ-বাবুর বাসায় থাকিলেন।

যোগেশবাবু নূতন উকিল হইলেও তাঁহার পসার একটু একটু করিয়া বাড়িতেছিল। ভবিষ্যতে যে তিনি ব্যবসায়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন, তাহার কিছু কিছু লক্ষণ এখন হইতে তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইত যোগেশবাবু অধ্যাবসায়ী, সাহসী, মেধাবী, সুবক্তা ও স্বদেশানুরাগী ছিলেন। সাধারণের সকল হিতকর কার্য্যে তিনি উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। বিপন্ন স্বদেশী যুবক-দিগের পক্ষে তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া মোকদ্দমা লইয়াছিলেন। এই মোকদ্দমার তদ্বির পর্য্যন্ত অনেক সময় তাঁহাকে নিজব্যয়ে চালাইতে হইত। দু'চারিজন উকিল মোক্তার ও স্থানীয় ভদ্রলোক

তাঁহাকে এ বিষয়ে সাধ্যমত সাহায্যও করিত।

সুরেশ কলিকাতা হইতে ব্যারিষ্টার লইয়া আসাতে হেমাঙ্গিনী ও তাহার মাতার অনেকটা ভরসা হইয়াছিল যে মোকদ্দমার সুরাহা হইবে।

হেমাঙ্গিনী একদিন রাত্রে সুরেশকে গোলাপী যাহা প্রস্তাব করিয়াছিল তাহা বলিল। রাধাবল্লভের পূর্ব্বকাহিনী ও তাহার উপস্থিত মতলবের কথাও বলিল। সমস্ত শুনিয়া সুরেশ শিহরিয়া উঠিল। তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, নারকী রাধাবল্লভ ও দারোগা দীনদয়ালের চক্রান্তে নন্দলালকে আসামী করা হইয়াছে। বাড়ী খানাতল্লাসীর সময় ইন্‌স্‌পেক্টর রঘুবাবুর সদয় ও মনুষ্যোচিত ব্যবহারের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি সুরেশের ভক্তির উদ্রেক হইল। সে মনে মনে বলিল, পুলিসের মধ্যে এইরকম সাধুলোক আছে বলিয়াই ইংরেজ দেশকে সুশাসন করিতে পারিতেছেন।

সুরেশ পরদিন যোগেশবাবুকে লইয়া থানায় গিয়া রঘুবাবুর সঙ্গে দেখা করিলেন, এবং তাঁহাকে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাহাতে এই মোকদ্দমা সহজে মিটিয়া যায় তাহার চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। রঘুবাবু স্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিলেন, "সাহেব খুব ভাল লোক। আসামীদিগের যে বিশেষ দোষ নাই, একথা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে পারিলে, সম্ভবতঃ তিনি কেস withdraw করিতে হুকুম দিবেন। যাহা হউক আমি চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

রঘুবাবু তাঁহার অঙ্গীকারমত পরদিবসেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

সাহেবের কুঠিতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে উভয়ে অনেক কথা হইল। কিন্তু রঘুবাবুর মূল অনুরোধ রক্ষা হইল না; সাহেব মোকদ্দমা আপোষ করিতে রাজী হইলেন না। তিনি ইতিপূর্ব্বে রঘুবাবুর অনেক অনুরোধ অনেক-বার রক্ষা করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে কেন তাঁহার অনুরোধ রক্ষা হইল না, তাহা ভাবিয়া রঘুবাবু কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। রাধাবল্লভ যে সাহেবের কাণভারী করিয়া গিয়াছিলেন তাহা তিনি জানিতেন না।

সাহেব রঘুবাবুকে বলিলেন—"Babu, are you a *Swadeshee?*" রঘুবাবু স্বীকার করিলেন তিনি "honest স্বদেশী"। সাহেব হাসিয়া বলিলেন—"Yes B[illegible], honesty is the best policy' even in *Swadeshism.*"

রঘুবাবু বিদ্রুপকাণবিদ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন তিনি কাছারীতে যোগেশ বাবুকে বলিলেন যে সাহেব কেস মিটাইতে রাজী হইলেন না।

ব্যারিষ্টার সাহেব আসামীদিগকে জামিনে খালাস করিবার জন্ম দরখাস্ত করিলেন। তাহা নামঞ্জুর হইল।

যথাকালে মোকদ্দমার শুনানি আরম্ভ হইল। স্বদেশী মোক-দ্দমায় চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। আদালতে প্রত্যহ লোকারণ্য হইত। রাধাবল্লভ বাবু সরকারের পক্ষে কেস চালাই-তেন। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব নিত্য মোকদ্দমার হালচাল বুঝিতেন। বাদীপক্ষের প্রধান সাক্ষ্য প্রেম-চাঁদ কড়ারী ব্যারিষ্টারের জেরায় একপ্রকার কবুল করিয়া বসিল,

সে পুলিসের গোয়েন্দা। কিন্তু গোয়েন্দা হইলে কি সত্যকথা বলিতে নাই? সুতরাং হাকিম তাহার এজাহার বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। পাঁচজন আসামীর মধ্যে চারজনের দণ্ড হইল। নন্দলালের সশ্রম ছয়মাস মেয়াদ হইল।

রাধাবল্লভ ও দীনদয়ালের আহ্লাদের সীমা রহিল না। হিংসি-তের নিগ্রহে হিংসুক এক বীভৎস আনন্দ উপভোগ করে।

[২২]

উপায়।

জজ সাহেবের কাছে আপিল করিতে পরামর্শ দিয়া ব্যারিষ্টার সাহেব চলিয়া গেলেন। আপিল ও হেমাঙ্গিনীদের সংসার খরচের জন্য কিছু টাকার আবশ্যক। তাহা আনিবার জন্য সুরেশও কলিকাতায় চলিয়া গেল।

পরদিন গোলাপী হেমাঙ্গিনীদের বাটীতে আসিয়া কান্নাকাটিতে যথারীতি যোগদান করিল। সে নন্দলালের মাকে অনেক প্রকারে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিল—বুঝাইল যে, আপিল করিলে নন্দবাবু খালাস পাইবে; যেহেতু রাধাবল্লভ বাবু তাহাকে বলিয়াছিল যে, তাহার বিরুদ্ধে বিশেষ প্রমাণ নাই। গোলাপী যাইবার সময় হেমাঙ্গিনীর কাণে কাণে বলিল, "দিদি! নন্দবাবুর মেয়াদের জন্য তুমিই দায়ী। তবে এখনও উপায় আছে।"

হেমাঙ্গিনী কোন উত্তর করিল না। সে অনেকগুলি ব্যাপারের

আভাস পাইতেছিল, কিন্তু কোনটিই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল না। গোলাপীর এই বিদ্রুপাত্মক ভৎর্সনা তাহার নিকট নিতান্ত প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইল না।

হেমাঙ্গিনী একটু চিন্তা করিয়াই বুঝিতে পারিল যে, রাধাবল্লভের কামাগ্নিতে সে আপনার সতীত্ব আহুতি দিতে পারিল না বলিয়া এই অগ্নি ক্রমে প্রচণ্ড রোষাগ্নিতে পরিণত হইয়া তাহার নিরপরাধ ভ্রাতাকে গ্রাস করিয়াছে।

হেমাঙ্গিনী এ জগতে তাহার মা ভাই ভিন্ন আর কিছুই জানিত না। নন্দলালের কারাদণ্ডে তাহার মাতার যে প্রাণসংশয় হইবে, তাহাও সে বুঝিত। কিন্তু উপায় কি? সে ভাইয়ের কারামুক্তির জন্য নিজের সুখ শান্তি এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। ভাইয়ের জন্য সে এ সকলই পারে। গোলাপী বলিয়া গিয়াছিল—"এখনও উপায় আছে"। কি উপায়? হেমাঙ্গিনী বুঝিল, সে স্বয়ং নরকে প্রবেশ করিলে তাহার ভ্রাতার কারামুক্তি ও তাহার মাতার জীবন রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু সশরীরে সজ্ঞানে নরকে প্রবেশ করা যে প্রাণ দেওয়া অপেক্ষাও সহস্র গুণে কঠিন।

হেমাঙ্গিনীর মাথা ঘুরিয়া গেল। নানাবিধ পরস্পরবিরোধী চিন্তার ঘূর্ণিবায়ু তাহার প্রাণকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল।

সঙ্গীন অবস্থায় পড়িলে কাহার কাহার সঙ্গীন বুদ্ধি যোগাইয়া থাকে। ঘনঘটাচ্ছন্ন গগনে ঘোর দুর্য্যোগের সময় বিদ্যুৎছটার ন্যায় ইহা পথভ্রান্ত পথিককে তমসাবৃত অরণ্যমধ্যে পথ দেখাইয়া দেয়।

প্রত্যুৎপন্নমতি অবলা হঠাৎ পথ দেখিতে পাইল। গোলাপী যে পথের নির্দ্দেশ করিয়াছিল, সে পথ নহে। হেমাঙ্গিনী সয়তানকে

প্রতারণা করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিবে স্থির করিল। রাধাবল্লভ সয়তানী করিয়া তাহার ভাইকে জেলে পুরিয়াছে। হেমাঙ্গিনী মনে মনে ঠিক করিল যে, সয়তানের সঙ্গে সয়তানী করিলে পাপ হইবে না, কিন্তু এ পথে তাহার নামে হয় ত একটা মিথ্যা কলঙ্ক রটিতে পারে। তাহাতেই বা ভয় কি? সে ত আপনার মনের কাছে খাঁটি থাকিবে।

[২৩]

স্বদেশী নেতা।

যোগেশবাবু এই স্বদেশী মোকদ্দমার একটি বিস্তৃত রিপোর্ট লিখিয়া কলিকাতার প্রধান স্বদেশী দৈনিকপত্রে পাঠাইয়াছিলেন। এই পত্রের সম্পাদকই রাধাবল্লভ বাবুর বন্ধু। সম্পাদক মহাশয় জেলার বড় বড় উকিল ও হোমরা চোম্‌রা লোককে হাতে রাখিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন নামজাদা পলিটিকাল নেতা হইতে হইলে সমাজের শীর্ষস্থানীয় এই সকল লোককে হাতে রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। সুতরাং তিনি ন্যায় ও সত্যকে নিত্য বলি দিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে এই পথের অনুসরণ করিতেন।

পূর্ব্বোক্ত রিপোর্ট তাঁহার কাগজে বাহির হইল না। কারণ রিপোর্টের মধ্যে রাধাবল্লভের সওয়াল-জবাবের যেটুকু উদ্ধৃত করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের উপর যথেষ্ট ঠাট্টা-বিদ্রূপ ছিল। এই রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে, সম্পাদকবন্ধু

রাধাবল্লভের অপকীর্ত্তি ঘোষিত হইত।

যোগেশবাবুর পত্র পাইয়া সুরেশ উক্ত সংবাদপত্রের আফিসে গিয়া সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিল। সুরেশ বলিল—"আমি কৃষ্ণনগরের উকিলবাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপদেশ-মতে আপনার নিকট একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। যোগেশবাবু আপনার নিকট একটি স্বদেশী মোকদ্দমার রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন। এই মোকদ্দমায় কৃষ্ণনগরের চারজন স্বদেশী ছেলের মেয়াদ হইয়াছে। আপনার কাগজই স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান মুখপত্র। যোগেশবাবু জানিতে চাহেন, আপনার কাগজে কি কারণে এই রিপোর্ট ছাপা হইল না।"

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—"রাধাবল্লভ বাবু হচ্ছেন কৃষ্ণনগরের শ্রেষ্ঠ প্লিডার। তিনি এই মোকদ্দমায় সরকারী পক্ষে appear হইয়া-ছিলেন। এই রিপোর্ট পাইয়া আমরা তাঁহাকে পত্র লিখিয়া-ছিলাম। তিনি প্রত্যুত্তরে আমাদিগকে জানাইয়াছেন এই মোকদ্দমার মধ্যে স্বদেশীর নামগন্ধ নাই এবং ইহাতে কোন অবি-চারও হয় নাই। আমরা রাধাবল্লভ বাবুর কথায় অবিশ্বাস করিতে পারি না। সুতরাং রিপোর্ট প্রকাশ করিবার কোন কারণ দেখি না।"

সুরেশ তখন এই মোকদ্দমার আমূল বৃত্তান্ত সম্পাদক মহাশয়কে শুনাইতে আরম্ভ করিল। রাখীবন্ধনের দিন কিরূপে চারজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহা বলিল। তারপর কিরূপে রাধাবল্লভ বাবু দারোগা দীনদয়ালের সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া নন্দলালকে নিরপরাধে জেলে পুরিয়াছেন, তাহা যখন সুরেশ বলিতে লাগিল,

তখন সম্পাদক মহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"রাধাবল্লভ বাবু হচ্ছেন কৃষ্ণনগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল এবং প্রধান political leador। তাঁহার মত লোকের বিরুদ্ধে এই সকল গ্লানিকর কথা শুনিবার আমার অবকাশ নাই। ৫টার সময় আমাদের আজ কংগ্রেস কমিটির মীটিং আছে। এখন পৌনে ৫টা বাজিয়াছে। সুতরাং আমি আর বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারি না।"

এই বলিয়া ব্যস্তবাগীশ সম্পাদক মহাশয় দেশের কাজের জন্য দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মত স্বদেশী নেতাদের প্রত্যেক মিনিটের মূল্য আছে।

[২৪]

অভিনয়।

দুইদিন বাদে গোলাপী প্রাতে হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। হেমাঙ্গিনী তাহাকে বলিল—"আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম যে, রাধাবল্লভ বাবু ভিন্ন আর কেহই আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। গোলাপদিদি, চল আমি এখণি তোমার সঙ্গে তাঁর বাড়ী যাব। গিয়ে তাঁর পায়ে কাঁদিয়া পড়িব। দেখি, তিনি আমার ভাইয়ের একটা কিনারা করতে পারেন কি না?"

গোলাপী আগে রাধাবল্লভ বাবুকে খবর দিয়া সন্ধ্যার পর হেমা-

ঙ্গিনীকে লইয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু চতুরা রমণী তাহাকে সে অবসর দিল না ; বলিল, "না, এখনি যাইতে হইবে। আমি তাঁর মুখের আশ্বাস না পাইলে আজ জলস্পর্শ করিব না।"

অগত্যা দূতী শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া রাধাবল্লভের উদ্দেশে যাত্রা করিল। তবে অভিসারের সময়টা তত সুবিধাজনক হয় নাই। যেহেতু রাধাবল্লভের তখন গোষ্ঠে যাইবার বেলা হইয়াছিল। তিনি ধড়া চূড়া পরিয়া শ্রীদামসুদামরূপী মক্কেল-মুহুরি সমভি-ব্যাহারে আদালতে গোচারণে যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিলেন। এমন সময় হেমাঙ্গিনীকে লইয়া গোলাপী উপস্থিত। একেবারে মেঘ না চাহিতে জল !

গোলাপী বলিল—"বাবু! হেমাঙ্গিনী আপনার কাছে তার ভাইয়ের জন্য কান্নাকাটি করতে এসেছে, নন্দবাবু যাতে খালাস পায় তোমাকে তা করতেই হবে।"

হেমাঙ্গিনীর মুখে কিন্তু তখন কান্নাকাটির ভাব আদৌ ছিল না। সে হাসিমুখে বিলোল কটাক্ষে রাধাবল্লভকে পঞ্চশরবিদ্ধ করিতেছিল। পাঠক তাহার অদ্যকার লজ্জাশীলতার অভাব ও অশিষ্ট ব্যবহার দেখিয়া চমকিত হইবেন না। রঙ্গমঞ্চে যে অভি-নেত্রীর লজ্জার আতিশয্যে দার্ঢ্যতার অভাব হয় সে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে না। হেমাঙ্গিনী আজ অভিনয় করিতে আসিয়াছিল, জয় করিতে আসিয়াছিল। সে এখানে লজ্জা দেখাইতে বা কাঁদিতে আসে নাই, এবং কাঁদিবার প্রয়োজনও ছিল না। রমণীকে প্রেমি-কের কাছে কাঁদিতে হয়, চরিত্রবান্ ব্যক্তির কাছে লজ্জা দেখাইতে হয়। ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুর সম্মুখে শিষ্টাচার ও রোদন

উভয়ই নিষ্ফল। পশুপ্রকৃতির শঠ-লম্পটের কাছে হাসিয়া, দাঁত দেখাইয়া, ভ্রূকুটি করিয়া, কাজ হাঁসিল করিতে হয়। হেমাঙ্গিনী তাহা জানিত। বিশেষতঃ, সে জীবনে কখনও লজ্জাশীলতা অভ্যাস করে নাই। সর্ব্বদা হাস্য করাই তাহার স্বভাব ছিল। যে রমণীর সুন্দর দন্তপংক্তি থাকে, হক্-না-হক্ হাস্য করাই তাহার এক রোগ হইয়া দাঁড়ায়।

রাধাবল্লভ নিশীথে নিভৃতে হেমাঙ্গিনীর এই হাসি দেখিতে ইচ্ছা করিত। তাই সে গোলাপীকে বলিল—"এখন ত আমি কাছারী যাচ্ছি। তুমি আজ রাত্রে হেমাঙ্গিনীকে নিয়ে এস। তখন ধীরে-সুস্থে সকল কথা হবে।"

হেমাঙ্গিনী বলিল—"না, আপনাকে এখনি বলতে হবে, আপনি আমার ভাইকে খালাস করে দেবেন,—নইলে আমি ছাড়ব না।"

গোলাপী বলিল—"বাবু! আপনি আশ্বাস না দিলে হেমাঙ্গিনী আজ জলস্পর্শ করবে না।"

হেমাঙ্গিনী বলিল—"আমার ভাই যদি খালাস পায়, তা'হলে আমি চিরদিন আপনার কেনা বাঁদী হয়ে থাকব। আপনিই আমাদের বল-বুদ্ধি-ভরসা; আপনিই আমাদের সকল বিপদের কাণ্ডারী!"

এই কথা বলিয়া সে সতৃষ্ণনয়নে রাধাবল্লভকে আর একবার কটাক্ষবাণবিদ্ধ করিল। এই অস্ত্রাঘাতেই তাহাকে ধরাশায়ী হইতে হইল।

রাধাবল্লভ বলিল—"হেমাঙ্গিনি! তুমি যখন এসে ধরেছ, তখন

আমাকে একাজ করতেই হবে। তোমার অনুরোধ কি আমি এড়াতে পারি? তুমি যদি আগে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে, তা'হলে কি আর তোমার ভাইয়ের জেল হ'ত?"

হেমাঙ্গিনী বলিল—"আমার সে অপরাধ মাপ করতে হবে। গোলাপী আমাকে সে কথা অনেকবার বলেছিল। আমার বড় লজ্জা করে ব'লে আপনার কাছে এতদিন আসতে পারিনি। সেজন্য আমার যথেষ্ট সাজা হয়েছে। এখন ত' আমি এসেছি? এখন থেকে আপনাকে আমাদের মুখের দিকে তাকাতে হবে,—নাহ'লে আমি আত্মহত্যা করব।"—বলিয়া হেমাঙ্গিনী আবার হাসিয়া ফেলিল।

আমরা তাহার এই দম্ভরুচিকে স্নিগ্ধ কৌমুদীর সহিত তুলনা না করিয়া, প্রখর সূর্য্যরশ্মির সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, ইহা রাধাবল্লভের হৃদয় হইতে রোষহিংসার অন্ধকারকে দূরীভূত করিল, এবং নন্দলালের প্রতি নিষ্ঠুরতার হিমানীকে বিগলিত করিয়া দিল। তিনি যে-কোনও উপায়ে তাহাকে কারামুক্ত করিয়া দিবেন, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া হেমাঙ্গিনীকে বিদায় দিলেন, এবং বলিয়া দিলেন যেন শীঘ্র জজ-সাহেবের কাছে আপিল দায়ের করা হয়।

আসিবার সময় হেমাঙ্গিনী বলিল—"আমার ভাই যতদিন না খালাস হবে, ততদিন আমি আর কাউকে আমার এ পোড়ামুখ দেখাব না।"

আপিলে খালাস।

আপিলের জন্য যোগেশবাবু সত্বর রায়ের নকলের দরখাস্ত করিলেন। রাধাবল্লভ বাবু একদিন বার-লাইব্রেরীতে তাঁহাকে চুপি চুপি বলিয়া দিলেন যে, গোয়েন্দা প্রেমচাঁদের সাক্ষ্য ভিন্ন আসামী নন্দলালের বিরুদ্ধে আর কোনও প্রমাণ নাই—এই কথাটি যেন আপিলের গ্রাউণ্ডে পরিষ্কাররূপে লেখা থাকে; এবং আপিল শুনানির সময় যেন ঐ কথার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। কারণ, তাহা হইলে অন্ততঃ একজন আসামীও খালাস পাইবে।

সাতদিনের মধ্যে আপিল রুজু হইল। দুই সপ্তাহ পরে একদিন তাহার শুনানি আরম্ভ হইল। যোগেশবাবুই আসামীদের পক্ষে সওয়াল-জবাব করিলেন। তিনি সকল আসামীর সাফাই করিয়া যাহাকিছু বলিবার ছিল তাহা বলিয়া নিঃশেষ করিলেন। প্রত্যুত্তরে রাধাবল্লভ বাবু কেবল আসামী নন্দলালের নির্দ্দোষিতার পোষকতায় যোগেশবাবু যেটুক বলিয়াছিলেন তাহা মানিয়া লইয়া বলিলেন যে, কেবল এই আসামীকে খালাস দিলেই ন্যায় বিচারের মর্য্যাদা রক্ষা হইতে পারে; কিন্তু অন্যান্য আসামীগণ যে সম্পূর্ণ দোষী, তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে।

শুনানির তিনদিন পরে জজ-সাহেব রায় দিলেন। তিনি বিধুভূষণ ও আর তিনজন আসামীর দণ্ড বাহাল রাখিয়া নন্দলালকে খালাস দিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নন্দলাল জেল হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। হারানিধি ফিরিয়া পাওয়ায় তাহার মাতার আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। মহা ধূমধামের সহিত তুলসীতলায় হরির লুট দেওয়া হইল; এবং কলিকাতায় সুরেশকে এই মুক্তি-সংবাদ টেলিগ্রাফ করা হইল।

পরদিন সুরেশ কৃষ্ণনগরে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে কাছারীতে যোগেশবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। যোগেশবাবু তখন বটতলায় গোলাপীর দরবারে ডাবা হুঁকা হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। অনেক লোক তাহার সঙ্গে এই স্বদেশী মোকদ্দমার কথা কহিতেছিল। তিনি যে প্রধান আসামী নন্দলালকে আপিলে খালাস করিতে পারিয়াছেন, সেজন্য সকলেই তাঁহার অদ্বিতীয় শক্তির প্রশংসা করিতেছিল। তাহা শুনিয়া গোলাপী বলিল—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ! ঝড়ে কাক মরে, আর ফকিরের কেরামতি বাড়ে।" সুরেশ গোলাপীর এই হেঁয়ালির অর্থ বুঝিতে পারিল না। তারপর সে নন্দলালদের বাড়ীতে আসিয়া সকলের আনন্দে যোগদান করিল।

আহারাদির পর হেমাঙ্গিনী সুরেশকে তাহার 'অভিসারের' কিছু আভাস দিল। সে অনন্যোপায় হইয়া গোলাপীর সঙ্গে গিয়া কিরূপে রাধাবল্লভকে ঠকাইয়া তাহার ভাইকে খালাস করিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিল। সুরেশ তখন গোলাপীর সেই "ঝড়ে কাক মরে, আর ফকিরের কেরামতি বাড়ে" কথার অর্থ বুঝিতে পারিল। সে হেমাঙ্গিনীকে বলিল—"দিদি! তুমি অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ করেছ। রাধাবল্লভ যখন বুঝতে পারবে যে

তুমি তাকে বঞ্চনা করেছ, তখন সে ক্রোধে অন্ধ হয়ে তোমাদের নানাপ্রকার বিপদের ফাঁদে ফেলতে চেষ্টা করবে। অতএব তোমাদের আর একদিনও এখানে বাস করা হ'বে না।"

পরদিন প্রত্যুষেই সুরেশ নন্দলালদের লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল। গোলাপী রাধাবল্লভের নিমন্ত্রণ লইয়া যথাসময়ে আসিয়া দেখিল, পাখী পালাইয়াছে, শূন্য পিঞ্জর পড়িয়া আছে। সে ফিরিয়া গিয়া রাধাবল্লভ বাবুকে জানাইল যে শিকার পালাইয়াছে। শুনিয়া রাধাবল্লভ বলিল—"শালী বড্ড ঠকিয়েছে!"

[২৬]

নবীনে প্রবীণে।

নন্দলাল কলিকাতায় আসিয়া সুরেশের মেসের নিকট একটি ছোট বাসা ভাড়া করিয়া, সেইখানে তাহার মাতা ও ভগ্নীকে লইয়া বাস করিতে লাগিল; এবং চারিদিকে চাকরির চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিল। তাহার মাতুল পঞ্চানন বাবু তাহার নিকট শুনিলেন যে, কৃষ্ণনগরে বিধুভূষণ জেল খাটিতেছে। জেলখানার উপরে পাঁচুবাবুর বড়ই ঘৃণা ছিল। আলিপুরের জেলখানার ডাক্তার রজনীবাবু তাঁহার বন্ধু ছিলেন। পূর্ব্বে রজনীবাবুর সঙ্গে পঞ্চানন একদিন জেল দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তদবধি তিনি বলিতেন—"কারাগারের কামারশালে, নির্ম্মমতার এনভিলে, নির্য্যাতনের হাতুড়ী দিয়া পিটিয়া কয়েদীদের হৃৎপিণ্ডকে কঠিন করা

হয়। এই নরকের মধ্যেই নারকীদের প্রকৃত গঠন হয়।"

একদিন রজনীবাবুর মুখে পঞ্চানন অবগত হইলেন যে, কৃষ্ণনগরের জেল হইতে বিধুভূষণ নামে একজন স্বদেশী কয়েদী আলিপুরের জেলে আসিয়াছে। পঞ্চানন রজনীবাবুকে বলিলেন, "আমি বিধুভূষণকে বিশেষরূপ চিনি; সে একজন শিক্ষিত যুবক, কিন্তু মাথাপাগলা ও উদ্ধত প্রকৃতির লোক। আমি একদিন তাহার সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছা করি।"

পঞ্চানন কয়েকখানি গ্রন্থে রাশিয়ার কারাগারের ভীষণ বর্ণনা, এবং সেখানে নিহিলিষ্ট কয়েদীদিগকে নাছিকরা লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া নিবিড় অন্ধকারময় নির্জ্জন কারাগৃহে কি কঠোর নির্যাতনের মধ্যে রাখা হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করিয়াছিলেন। এদেশে স্বদেশী কয়েদীদিগকে কি অবস্থায় রাখা হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই তিনি বিধুভূষণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন।

রজনীবাবু একদিন তাহাকে জেলখানায় লইয়া গিয়া বিধুভূষণের সঙ্গে দেখা করাইয়া দিলেন। বিধুভূষণ প্রণাম করিয়া পঞ্চাননের পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহাকে কারাবেশে দেখিয়া পঞ্চানন কুণ্ঠিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিধুভূষণ! তুমি কেমন আছ?"

বি। আমি বেশ আছি, আমার কোন কষ্ট নাই।

প। তুমি কি হাইকোর্টে মোশন করেছিলে?

বি। না।

প। কেন মোশন কর নি? মোশন করলে হয়ত খালাস পেতে পারতে।

বিধুভূষণ একটু হাসিয়া বলিল—"সকলেই যদি হাইকোর্টে গোপন ক'রে খালাস হবার চেষ্টা করবে, তা'হলে 'স্বদেশী'র জন্য জেল খাটবে কে ?

প। কেন, জেল না খাটলে কি স্বদেশী করা হয় না ?

বি। সাদামাটা স্বদেশীতে জেলখাটা দরকার হয় না। কিন্তু যাকে স্বদেশীর পথ ধরে স্বরাজে পৌঁছিতে হবে, তাকে জেলখানার ভিতর দিয়ে যেতে হবে ; অন্য পথ নেই।

প। জেলখানা যে নরক।

বি। স্বর্গের পথে যুধিষ্ঠিরকেও নরক দর্শন করতে হয়েছিল।

পঞ্চানন বুঝিলেন,—বিধুভূষণের মস্তিষ্কের মধ্যে যে "স্বদেশী" ভাব আদিতে ডিম্বাকারে ছিল, কারাদণ্ডের আঘাতে ফাটিয়া তাহা হইতে এখন স্বরাজের বাচ্ছা বাহির হইয়াছে। তিনি জানিতেন, মানুষ নিগৃহীত হইয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহা তাহার মন হইতে সহজে বিতাড়িত হয় না। সুতরাং পঞ্চানন স্বদেশী ও স্বরাজের তর্ক ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—"বিধুভূষণ ! তোমার কি বিশ্বাস যে বিনা অপরাধে তোমার মেয়াদ হইয়াছে ?"

বি। না, আমি যথার্থ অপরাধ করিয়াছিলাম। রাখীবন্ধনের দিন আমি কৃষ্ণনগরের নটবর বিশ্বাস নামক এক গৃহস্থের রান্না বন্ধ করিবার জন্য বলপ্রয়োগে উদ্যত হইয়াছিলাম। আইনের চোখে ইহা নিশ্চয়ই অপরাধ। আমার অবিচারে দণ্ড হয় নাই।

প। প্রত্যেক লোকেরই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে। রন্ধন-কার্য্যে নটবর বিশ্বাসেরও স্বাধীনতা থাকিতে পারে। বিধুভূষণ, তুমি

মুক্তি-পথের পথিক হয়ে তার সে স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে গেলে কেন? তুমি শিক্ষিত যুবক হয়ে এ অন্যায় কাজ কেন করলে?

বি। স্বদেশীর জন্য আমি যে জেল খাটিতে প্রস্তুত, তাহা প্রমাণ করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। আমি martyr হইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম।

প। তুমি স্বদেশবাসীর উপর অত্যাচার করিয়া martyrdom লাভ করিবে,—এ তোমার কি রকম স্বদেশী? এ বাতুলতার জন্য কি অনুতাপ হয় না?

এই কথায় বিধুভূষণের হৃদয়ে বোধ হয় একটু আঘাত লাগিয়াছিল। সে ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল—

"পাচু মামা! আপনি যদি আবার স্বদেশী যুবক হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, তা'হলে আমাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন। ভগবান্ আমাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়বৃত্তি প্রবল করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু এ বৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায় নাই। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের স্বদেশভক্ত শিক্ষিত যুবকেরা দেশের জন্য, সাম্রাজ্যের জন্য, রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার অধিকার পায়; এবং তাহা করিয়া তাহারা রাজ-সম্মান লাভ করে। আমরা বাঙ্গালী বলিয়া এ অধিকারে বঞ্চিত। যদি উষ্ণ শোণিতের তাড়নায় আমরা ভ্রমক্রমে আমাদের শক্তি-সামর্থ্যকে অসৎ পথে পরিচালিত করি, তা'হলে আমাদিগকেই কি ষোল আনা দোষী করিতে হইবে?"

বিধুভূষণের কথায় পাঁচু মামাকে কিছু ভাবিতে হইল। একটু চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন—"বিধুভূষণ! কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি

পাইলে তুমি সৈনিক হইতে সম্মত আছ?”

বি। হাঁ, নিশ্চয়ই।

প। যে সকল শিক্ষিত যুবকের প্রাণে বিন্দুমাত্র দ্রোহিভাব আছে, তাহাদিগকে সৈনিক হইবার অধিকার দেওয়া সঙ্গত কি না তাহা এক অতি গুরুতর সমস্যা। রাজপুরুষেরা এ সমস্যার মীমাংসা করিবেন। কিন্তু বিধুভূষণ! আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে দু'একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। আশা করি, তুমি সত্য কথা বলিবে, এবং মনের ভাব গোপন করিবে না।

বি। আপনি জিজ্ঞাসা করুন; আমি আমার জ্ঞান-বিশ্বাস-মত আপনার সকল প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিব।

প। সৈনিক মাত্রেরই গুরুতর দায়িত্ব আছে, তাহা তুমি স্বীকার কর?

বি। হাঁ, করি।

প। সৈনিককে প্রতি পদে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর আজ্ঞাধীন হইয়া চলিতে হয়, তাহা তুমি জান?

বি। জানি।

প। আজ যদি গভর্ণমেণ্ট তোমাদের মত পাঁচ শ বা এক হাজার শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবককে experiment বা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সৈনিক হইবার অধিকার দেন, তাহলে তোমরা সৈনিক পদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সেনাবিভাগের যাবতীয় discipline বা শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে?

বি। অবশ্য পারিব।

প। সাম্রাজ্যের আবশ্যকমত রাজাজ্ঞায় তোমরা বহিঃশত্রুর

সঙ্গে প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে পারিবে?

বি। নিশ্চয়ই পারিব।

প। বেশ কথা। বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণ করা সৈনিকের যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, দেশের মধ্যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইলে, তাহা দমন করাও তাহার তেমনই অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমরা সৈনিক হইয়া, আবশ্যক হইলে, তাহা করিতে পারিবে?

বিধুভূষণ কোন উত্তর করিল না। পঞ্চানন বলিলেন—"বিধুভূষণ! প্রশ্নের উত্তর দাও; তুমি মনোভাব গোপন না করিয়া উত্তর দিবে বলিয়াছিলে?"

বি। আমাদের উপর প্রজা-বিদ্রোহ দমনের আদেশ হইলে আমরা যদি তাহা না করি?

প। সম্রাটের সৈনিক হইয়া তোমরা তাহা করিতে বাধ্য; না করিলে তোমাদের মিউটিনি করা হইবে। যাহারা মিউটিনি করে, কোর্ট মার্শালের বিচারে যুদ্ধক্ষেত্রেই তাহাদের গুরুদণ্ড প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে। তোমাদের মত মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী সৈন্যের কোর্ট মার্শাল করিতে অধিক সময় লাগিবে না। ছিঃ বিধুভূষণ! তুমি আমার নিকট পরীক্ষায় পাশ হইতে পারিলে না। হৃদয়ে পাপ অভিসন্ধি লুকাইয়া রাখিয়া সৈনিক হইবার অভিলাষ করিও না। মিউটিনির দ্বারা বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নষ্ট হইবে না। ১৮৫৭ সালে এদেশে ইংরেজ-শাসন তত দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত ছিল না। সে সময়ের ভীষণ সিপাহী-বিদ্রোহেও এ সাম্রাজ্য নষ্ট হয় নাই। মিউটিনি হোচ্চে brainless riot of the soldiery। ইহাতে বড় বড় আধুনিক সাম্রাজ্যগুলি বিপর্য্যস্ত হয় না।

বিধুভূষণ নিবিষ্টচিত্তে এইসকল কথা শুনিতেছিল। পাঁচু-

মামা বলিলেন—

"আয়র্ল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকায় কিয়দংশ প্রজার মধ্যে দ্রোহী-ভাব প্রচ্ছন্নভাবে আছে বলিয়া মনে হয়। যদি কোনও দিন সেখানে ক্ষিপ্ত প্রজাগণ অস্ত্রবিপ্লব উপস্থিত করে, তা'হলে দেখিবে, সেখানকার ভলাণ্টিয়ার সৈন্যদলই রাজাজ্ঞায় সর্ব্বাগ্রে ঐ বিপ্লব দমনে অগ্রসর হইবে, এবং তাহাতে প্রজা-বিদ্রোহ অচিরে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। রাশিয়ার নিহিলিষ্টগণ মিউটিনির দুরভিসন্ধি লইয়া মধ্যে মধ্যে সেনাবিভাগে প্রবেশ করিত। একবার কয়েকজন নিহিলিষ্ট যুবক গোলন্দাজ সৈন্য হইয়া রাজপ্রাসাদের সম্মুখে তোপ লইয়া কুচ কাওয়াজ করিতেছিল। সম্রাট যখন প্রাসাদের জানালায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটি সত্যিকার 'শেল্' ছুড়িল! ঈশ্বরের কৃপায় সম্রাট্ আহত হইলেন না; কিন্তু নিহিলিষ্ট সৈন্যদিগের মিউটিনির অপরাধে প্রাণদণ্ড হইল।"

অবশেষে পঞ্চানন বাবু বলিলেন—"শুন বিধুভূষণ! যতদিন তোমাদের প্রাণে সম্রাটের প্রতি যথার্থ ভক্তি এবং সাম্রাজ্যের প্রতি অনুরক্তি সঞ্চারিত না হইবে, ততদিন তোমরা সৈনিক হইবার আকাঙ্ক্ষা করিও না; করিলে মহাপাতক হইবে।"

তৎপরে তিনি জেলের মধ্যে স্বদেশী কয়েদীরা কিরূপ অবস্থায় থাকে, সে সম্বন্ধে বিধুভূষণকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, রাশিয়ার কারাগার নরক হইলে, এ দেশের কারাগার তাহার তুলনায় স্বর্গ। এখানে কয়েদীদিগকে নির্দ্দয়ভাবে শাসন করিবার জন্য knout নাই, wheel-barrow নাই। এখানে নৃশংস

নির্যাতনের অভাব বলিয়া রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে hunger-strike বা অনশনে আত্মহত্যার চেষ্টা করিতে হয় না।

[২৭]

ঝুমন।

বিধুভূষণ শিক্ষিত যুবক বলিয়া জেলে প্রুফ-রীডারের কাজ পাইয়াছিল। সে প্রত্যহ সকল শ্রেণীর কয়েদীদিগের অবস্থা বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিত। বিধুভূষণ লক্ষ্য করিয়াছিল, কয়েদীদিগের অধিকাংশই সমাজের অতি নিম্নস্তরের পশুপ্রকৃতির লোক। ইহারা ঘোর অজ্ঞানান্ধকারের সূতিকাগৃহে ভূমিষ্ঠ হইয়া দারুণ দুঃখ-দুর্দ্দশার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া বর্দ্ধিত হয়। এই হতভাগ্যদিগের এক অতি পরাক্রমশালী অধিনায়ক আছে, তাহার নাম 'অভাব'। এই নায়কের তাড়নায় তাহারা না করিতে পারে এমন কর্ম্ম নাই। এই সকল কর্ম্মের ফলেই তাহাদিগের বন্ধনদশা ঘটে।

জেলের ডাক্তার রজনীবাবু প্রায় রোজই বিধুভূষণের তত্ত্ব লইতেন। তিনি একদিন একটি বালক-কয়েদীকে বিধুভূষণের নিকট লইয়া আসিলেন। বালকটির নাম ঝুমন, বয়স অনুমান বার তের বৎসর। প্রথমবারের অপরাধে তাহাকে Reformatoryতে থাকিতে হইয়াছিল। এবার পকেটমারার অপরাধে তাহার তিন মাস মেয়াদ হইয়াছিল। সে এই বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত।

বিধুভূষণ বলিল, এই সকল পিক্‌পকেটের চোখে একপ্রকার

রঞ্জেন্ রশ্মি থাকে। সেজন্য ইহারা লোকের পকেটের মধ্যে মনিব্যাগের ভিতর লুকানো ধাতুমুদ্রাগুলি পরিষ্কার দেখিতে পায়। রজনীবাবু বলিলেন, সোণারূপার কোনও বিশেষ গন্ধ থাকিতে পারে যাহা এই শ্রেণীর কুকুরদিগের নাকে, মালুম হয়।

ঝুমনের রকম-সকম দেখিয়া বিধুভূষণ বুঝিয়া লইল, সে খুব ধড়িবাজ ছেলে। ঝুমন তাহার মায়ের নাম বলিতে পারিত, কিন্তু কে তাহার বাপ, তাহা সে জানিত না। মাছের মায়ের মত ইহাদের মা জন্ম দিয়াই খালাস। পুষ্করিণীতে তাড়াহুড়া খাইয়াই মাছ বাড়ে। ঝুমনের মত মাতৃসন্তানগণ সমাজ-সরোবরে সাধারণের লাথিঝাঁটার তাড়া খাইয়া নিত্য তিল তিল বাড়িয়া থাকে। ইহারা কাহারও বাড়ীতে ঢুকিলে অনধিকার প্রবেশ হয়। সেজন্য ইহারা কোম্পানীর সদর রাস্তায় দিবারাত্র বাস করে। রাজমার্গে অনধিকার প্রবেশ হয় না, তাই রাজমার্গই ইহাদের ঘরবাড়ী। তবে যে ইহারা মধ্যে মধ্যে জেলখানার আতিথ্য গ্রহণ করে, সেটা কেবল বিনামূল্যে রাজার অন্ন ধ্বংস করিবার মতলবে—রাজভোগের লোভে।

জেলখানার মধ্যে ঝুমনের সঙ্গে বিধুভূষণের বেশ সোট-পোট হইয়া গেল। সে বিধুভূষণের পা টিপিয়া দিত। তাহার বিনিময়ে বিধুভূষণ তাহাকে নিজের রসদ হইতে কিছু কিছু খাওয়াইত। জেল আইনে নিষেধ থাকিলেও ঝুমন কি জানি কোথা হইতে বিড়ী আনিয়া হাজির করিত। বিধুভূষণ তাহা খাইত না বলিয়া ঝুমন তাহা নিজেই নিঃশেষ করিত। ঝুমনের ছোটখাট রকমের হরেক-রকম নষ্টামি-দুষ্টামি দেখিয়া বিধুভূষণ তাহার কারাজীবনের মধ্যে

বিশেষ আনন্দ অনুভব করিত। সে তাহাকে হাসেসাই বলিত—"স্ত্রাথ্ ব্লুমন! ঐ জেল থেকে বেরিয়ে আর পকেট-টকেট্ মারিস নি; একটা কোন বিড়ীর দোকানে চাকরি করিস।"

[২৮]

স্বরাজিস্ট্ শিরোমণি।

একদিন 'সন্ধ্যা'-কার্য্যালয়ে টীকিশিখাশুভ্রধারী এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সঙ্গে পঞ্চানন বাবুর কথোপকথন হইতেছিল। এই ব্রাহ্মণকে সকলে শিরোমণি মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করিত। ইনি সন্ধ্যা-কার্য্যালয়ের একটি গৃহে বাস করিতেন। শিরোমণি মহাশয় অনেক স্বদেশী সভায় বক্তৃতা করিতেন এবং আপনাকে একজন স্বরাজপন্থী বলিয়া পরিচয় দিতেন। পূর্ব্বদিবস এক স্বদেশী সভায় হিন্দু-মুসলমানের একতার পোষকতায় তিনি কি কি বলিয়াছিলেন, তাহা পঞ্চাননের নিকট বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতেছিলেন। এমন সময় মৌলভী লিয়াকত্ হোসেন আসিয়া শিরোমণি মহাশয়ের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে পাকড়াও করিলেন। অনুরোধ এই যে, সেইদিন বৈকালে গোলদীঘিতে মৌলভী সাহেবের এক স্বদেশী সভা হইবে, সেই সভায় শিরোমণি মহাশয়কে বক্তৃতা করিতে হইবে। তিনি স্বীকৃত হইলে লিয়াকত্ হোসেন চলিয়া গেলেন। তখন শিরোমণি মহাশয় ঈষৎ বিরক্ত হইয়া তাঁহার ঘরের মধ্যে পানীয় জলের যে কলসী ছিল, তাহা লইয়া বাহিরে ফেলিয়া

দিলেন। সম্ভবতঃ মৌলভী সাহেবের গৃহপ্রবেশে এই কলসীর অবতারণা হইয়াছিল। কলসী ফেলিয়া দেওয়া দেখিয়া পঞ্চানন বাবু শিরোমণি মহাশয়কে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"মহাশয়! আমি দেখিতেছি, আপনার স্বরাজের আর বড় বিলম্ব নাই।"

এই সময়ে বিধুভূষণ আসিয়া পঞ্চাননকে প্রণাম করিল। পূর্ব্ব-দিবস সে কারামুক্তি লাভ করিয়াছে। পঞ্চানন বিধুভূষণের গৈরিক বেশ দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন—"কি হে বিধু-ভূষণ! জেল থেকে বেরিয়ে তুমি সংসারত্যাগী হলে নাকি?"

বি। সংসার আমার কবেই বা ছিল যে আজ ত্যাগ করলাম?

প। তবে এ বেশ কেন?

বি। এখন কিছুদিন হরিদ্বারে এক মঠে থাকব স্থির করেছি।

প। মঠে থেকে কি করবে?

বি। কিছু দেশের কাজ করবার ইচ্ছা আছে।

প। গেরুয়া প'রে মঠে না থাকলে কি দেশের কাজ করা যায় না?

বি। ধুতি চাদর প'রে শ্বশুরবাড়ী যাওয়া চলে, আর কোট প্যান্টালুন প'রে অফিসে যাওয়া চলে। কিন্তু গেরুয়া না প'রে সর্ব্বত্যাগী হয়ে দেশের কাজ করা চলে না। পাঁচুদাদা! আপনি ত 'আনন্দমঠ' পড়েছেন। বলুন দেখি, সন্তানেরা গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী না হলে কি অমন ভাবে দেশের কাজ করতে পারত?

প। আনন্দমঠের সন্তান-সম্প্রদায় কেবল একটা সামান্য উপন্যাসের নায়কমাত্র। তাঁদের চেষ্টা কি সফল

হয়েছিল? দ্যাখ বিধুভূষণ! এই বিংশ শতাব্দীর wireless টেলিগ্রাফ, ষ্টীম এঞ্জিন, আর হাউইট্জার কামানের সামনে, কেবল আনন্দমঠের কেন, কোন মঠের সন্ন্যাসীর দলই তিলার্দ্ধকাল দাঁড়াতে পারবে না।

সন্ন্যাসী ও গৈরিকের উপর পঞ্চাননের বড়ই বিতৃষ্ণা ছিল। এই গৈরিক লইয়া সন্ধ্যা-সম্পাদকের সঙ্গে তাঁহার প্রায়ই বাদানুবাদ হইত। পঞ্চানন বাবুর এই ধারণা হইয়াছিল যে, মঠের সাধু সন্ন্যাসীর দল সমাজ-বৃক্ষের উপরে পরগাছা, অথবা সমাজদেহের গাত্রে অর্ব্বুদবিশেষ। ইহারা আশ্রয়দাতা গৃহস্থদের রস-কস শোষণ করিয়া আপনারা পুষ্ট হয়। পঞ্চানন মনে করিতেন, মানব-সমাজের বাল্যাবস্থায়, তাহার পশুত্ব দমন করিয়া দেবত্ব জাগাইয়া রাখিবার জন্য মঠের আবশ্যক থাকিলেও, তাহা সমাজের বর্ত্তমান সাবালক অবস্থায় অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক। তিনি দেখিতেন, ত্যাগ ও ধর্ম্মের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বহুবিধ ভোগ ও অধর্ম্ম আসিয়া আধুনিক সন্ন্যাসী-জীবনকে কলুষিত করিয়া তোলে। বিলাস, আলস্য, মাদকসেবন ও গোপনে নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করা তিনি সাধারণ সন্ন্যাসী-জীবনে প্রায়ই লক্ষ্য করিতেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের বৌদ্ধসঙ্ঘগুলি যে পরিণামে কি পর্য্যন্ত পাপের লীলা-ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা তিনি পুরাতত্ত্ব পাঠে সম্যক্ অবগত হইয়াছিলেন।

এই কারণে পঞ্চানন বিধুভূষণের সঙ্গে গৈরিক ও সন্ন্যাসধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক তর্ক করিয়া শেষে বলিলেন—"বাপু হে, তুমি আর সন্ন্যাসীর নম্বর বাড়াইও না। দেশের কাজ করিতে হয় ত, গেরুয়া ছাড়িয়া সাদা কাপড়চোপড় পরিধান কর। এখন আমাদের দেশের অসংখ্য যুবককে জ্ঞান বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষায় বড় [illegible]

বর্ষের বাহিরে নানাদেশে যাইতে হইবে। ইহাদের আর গেরুয়ার পথ দেখাইও না, দোহাই তোমার !"

এই কথা শুনিয়া শিরোমণি মহাশয় বলিয়া উঠিলেন,—"পঞ্চানন বাবু! আপনি দেখিতেছি গৈরিকের উপর বড়ই বিরূপ। গৈরিকের অপরাধ কি? গৈরিক যে ত্যাগ-মার্গের নিশানা। ত্যাগের পথেই মুক্তি, আর ভোগের পথেই বন্ধন। ভারতবাসীকে বিদ্যা ও আদর্শের অন্বেষণে অন্যদেশে যাইতে হইবে না। ভারতবর্ষের যে একটা প্রাচীন শ্রেষ্ঠ সভ্যতা আছে, একথা আপনি ভুলিয়া যান কেন? পাশ্চাত্য জাতি বিজ্ঞানবলে যাহা করিতে না পারিবে, ভারতবাসী যোগবলে তাহা করিতে সক্ষম হইবে। ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে কি পাশ্চাত্য বিদ্যার তুলনা হইতে পারে?"

পঞ্চানন বলিলেন, "ভারতের যে একটা বিশেষত্ব ও প্রাচীন সভ্যতা আছে তাহা আমি অস্বীকার করি না। আমি ইহাও স্বীকার করি যে, বর্ত্তমান হচ্চে অতীতের উত্তরাধিকারী। পুরাতনের কাছে নূতনকে চিরদিনই ঋণী থাকিতে হইবে; কিন্তু সে ঋণ, কেবল যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, ততটুকুর জন্য। বহুপ্রাচীন কালের সমাজ আমাদের বর্ত্তমান সমাজের আদর্শ হইতে পারে না। যে তরকারী মান্ধাতার আমলে রন্ধন করা হইয়াছে, তাহা আজ খাইলে নিশ্চয়ই উদরাময় হইবে। যে পরিচ্ছদ বালককালে পরিয়াছি এখন তাহা ছোট হইয়া গিয়াছে। তাহাকে এ বয়সে টানিয়া বুনিয়া গায়ে চড়াইলে নিশ্চয়ই হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। অতীতকে ডাকিয়া আনিয়া বর্ত্তমানের স্কন্ধে চাপাইলে এইরূপই হয়। আমাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহগণ যে চরণামৃত ভক্তিপূর্ব্বক পান করিয়াছেন, আমরা

এক্ষণে তাহার একবিন্দু অণুবীক্ষণের নিম্নে রাখিয়া তাহাতে রোগের বীজ ও কীটাণুর অনুসন্ধান করিবার অধিকার লাভ করিয়াছি। সেকালের অন্ধভক্তির সামগ্রী একালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না।"

শিরোমণি বলিলেন—"আধুনিক বিজ্ঞানের দৌড় অতি অল্পদূর মাত্র। আপনার বিজ্ঞান আমাদের যোগশক্তি ও মন্ত্রশক্তিকে বিশ্লেষণ করিতে পারে না। মহাপুরুষদত্ত এক একটি মাদুলীর যে কি অলৌকিক গুণ থাকিতে পারে, তাহা আধুনিক বিজ্ঞান কল্পনাও করিতে পারে না।"

পঞ্চানন বলিলেন—"পাশ্চাত্য জাগরণ বা রেণেসাঁসের পূর্ব্বে ইউরোপের লোকসাধারণ গুণগ্যান তুক্‌তাক্‌, মন্ত্রতন্ত্র, মাদুলী ও ইষ্টকবজ লইয়া উন্মত্ত হইত। তখন ইউরোপের চারিদিকে অসংখ্য 'মনাষ্টারি' বা মঠ ছিল, এবং এইসকল মঠের সন্ন্যাসী-দিগকে 'মঙ্ক' বলিত। সমাজের লোকসাধারণ ইহাদিগকে অত্যন্ত ভক্তি করিত এবং ইহাদের বাক্যের উপর অন্ধের মত নির্ভর করিত। এখন এক রাশিয়া ভিন্ন পাশ্চাত্যদেশের সকলস্থান হইতে অন্ধ-বিশ্বাসের যুগ চলিয়া গিয়াছে। আমাদের ভারতবর্ষে কিন্তু সেই বজেয়া বুজরুকীর যুগ এখনও পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে। তাই বলি, আমাদের জাগরণের দেরি আছে।"

এ তর্কের মীমাংসা নাই। পঞ্চানন ও শিরোমণি উভয়েই ক্লান্ত হইয়া নিরস্ত হইলেন। বিধুভূষণ সেদিন সন্ধ্যা-কার্য্যালয়ে থাকিয়া পরদিবস নিজের গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় খণ্ড

[১]

বাবু কাশীনাথ বসু।

রাজধানী কলিকাতাকে এক হিসাবে একটি বড় অরণ্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই অরণ্যে অসংখ্য প্রকারের জীবজন্তু বাস করিয়া থাকে। এখানে নরাকার কুক্কুর শৃগাল হইতে দ্বিপদ ষণ্ড শার্দ্দূল পর্য্যন্ত সকলেই বিচরণ করে। ইহাদের মধ্যে বাগ-বাজারের কাশীনাথ বাবু যে কোন্ শ্রেণীর জীব তাহা আমরা বলিতে পারি না। পাঠকবর্গের সহিত ইঁহার পরিচয় হইলে তাঁহারাই ঠিক করিয়া লইবেন।

কাশীনাথ বাবু একজন বুনিয়াদী ঘরের বড়লোক, চেহারা ও মেজাজ তদনুরূপ; বয়স অনুমান পঞ্চান্ন বৎসর হইবে। তিনি হিন্দু স্কুলে থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে মূর্খ বলা চলে না। তাঁহার বৈঠকখানায় পাঁচটি আলমারি বোঝাই বই ছিল। তাহার মধ্যে শব্দকল্পদ্রুম, কালীসিংহের মহাভারত এবং ওয়েভার্লি নভেল পর্য্যন্ত ছিল। এই ঘরে তাঁহার একখানি জীবনপ্রমাণ অয়েল পেন্টিং ছবি ছিল। তাহাতে তিনি চোগা-চাপ-

ক্যান ও গার্ডচেইন পরিয়া সামলা মাথায় পুস্তক হস্তে দণ্ডায়মান। এই ছবি হইতে প্রমাণ হইত যে কাশীনাথ বাবু একজন শিক্ষিত জাঁদরেল জাণ্টল্‌ম্যান।

এই ছবিখানি যে বয়সের, সে বয়সে কাশীবাবুর প্রাণে খুব স্ফূর্ত্তি ছিল। তখন সহরে ভাল মেয়েমানুষ রাখিতে না পারিলে কেহ বড়মানুষ বলিয়া গণ্য হইত না। এইজন্য কাশীবাবুকে দমদমার বাগানে একটি অবিদ্যা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছিল। এই শ্রীমন্দিরে তিনি প্রতি সপ্তাহে মধুবারে মাইফেল দিতেন। কেল্‌-নারের বাড়ী হইতে গ্রীনসীল ও বীহাইভের কেস আসিত অনেক মধুলোভী ইয়ার-বক্সী মধুচক্রে আসিয়া যোগ দিত। এই যুব-জনোচিত আনন্দের অধিকারী হইবার জন্য কাশীনাথ বাবুকে সপ্তাহে দুই দিন চুলে কলপ লাগাইতে হইত।

বালককাল হইতে গান বাজনার উপরে কাশীবাবুর বিলক্ষণ সখ ছিল। তিনি তখনকার পাঁচালী হাফ-আকড়ার দলের আশে পাশে ঘুরিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত ও মোহন চাঁদের নাম করিতে তাঁহার মুখে লাল পড়িত। এখনকার যাত্রা থিয়েটারকে তিনি 'চুটকি আমোদ' বলিতেন। কাশীবাবু বেশ পাখোয়াজ বাজাইতে পারি-তেন। তবে মাঝে মাঝে সোমের ঘরে তেহাই মারিয়া বসিতেন, আর বলিতেন—"বিস্তর পয়সা খরচ ক'রে ওস্তাদ রেখে এবিদ্যা শেখা হয়েছে, ফাঁকি দিয়ে আদায় হয়নি।"

ইদানীং কাশীনাথ বাবুর বয়স গড়াইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ঋণ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি ঋণে ভয় পাইতেন না। বলিতেন—"বড়লোকেই দেনা করিতে পারে; দেনা নাই এমন

বড়লোক ত সহরে দেখিতে পাই না। যার বিষয় আছে, অথচ দেনা নাই, সে বড়লোক নয়—সে ব্যাটা বেণে।”

কাশীবাবুর ভিতর ধর্ম্মবিশ্বাস ছিল। তিনি ফলিত জ্যোতিষ ও তন্ত্রোক্ত করণ-কারণে বিশ্বাস করিতেন। একবার এক সন্ন্যাসীর দ্বারা বহুব্যয়ে বশীকরণ করাইয়া ঠিক ফল পাইয়াছিলেন। সেই অবধি তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের উপর তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা হইয়াছিল। তিনি দক্ষিণ বাহুতে একটী সোণার মাদুলীতে কবজ ধারণ করিতেন; এবং প্রত্যহ স্নানের পর বাম হস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া তাহাতে ঐ মাদুলী ঠেকাইয়া পান করিতেন। বুনিয়াদী ঘরের বড়মানুষদের এইসকল বিশ্বাস থাকা চাই।

কাশীবাবু তাঁহার কর্ম্মচারী ও চাকরদাসীদিগের তাহাদের নিজ নিজ জেলার নামে নামকরণ করিয়াছিলেন এবং সকলকেই তুই মুই করিয়া ডাকিতেন। তাঁহার এক গোমস্তার বাড়ী ছিল বর্দ্ধমান জেলায়। তাহাকে তিনি ‘বর্দ্ধমেনে’ বলিতেন। এক স্থূলাঙ্গী চাকরাণীর বাড়ী ভাগলপুরে থাকায় তাহার নাম হইয়াছিল ‘ভাগলপুরে গাই’। মালী কটক জেলার লোক বলিয়া তাহাকে তিনি ‘কটকী মাড়া’ বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার এক চাকর মুঙ্গের জেলার লোক বলিয়া, এবং সে একটু বেঁটেখেঁটে থাকায়, তাহাকে তিনি ‘মুঙ্গেরে মট্‌কি’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এই সকল মধুর সম্বোধনে তাঁহার লোকজনেরা তাঁহার উপর বড়ই সন্তুষ্ট ছিল। তাহার উপর তিনি তাহাদিগকে চড়টা চাপড়টা দিয়া আরও খুসী করিতেন।

‘তোফা’, ‘লজ্‌ঝড়’ ও ‘বদারেশন্‌’—এই তিনটি শব্দ কাশীবাবুর

কথার মাত্রা ছিল। তিনি এই তিনটি কথা খুব বেশীরকম ব্যবহার করিতেন। ব্রাহ্মণ ও গুরু-পুরোহিতকে তিনি মামুলী খাতির ভক্তি করিতেন। তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলে তিনি মাথা নিচু না-করিয়াও কপালে হাত তুলিয়া প্রণাম করিতে পারিতেন এবং তাঁহাদিগকে নগদ টাকাটা সিকাটা দিয়া বিদায় করিতেন, এবং বলিতেন,—"বুনিয়াদী ঘরের লোকদের এ সকল বদারেশন্ সহ্য করিতে হয়।" কাশীবাবু যে কেবল গুরু-পুরোহিতের প্রতি বদান্যতা দেখাইতেন তাহা নহে। দুইজন সন্তানবতী বারবনিতার জন্যও তিনি নিঃস্বার্থভাবে কিঞ্চিৎ মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। দুষ্টলোকে বলিত, তিনি খোরপোষের নালীশের ভয়ে এ কার্য্য করিতেন। কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাও এক কম বদারেশন্ নয়?

[২]

সুলোচনা ও পারুল।

যে বহির্ম্মুখীন পুরুষের স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনাও না হইবে, তিনি যেন তাঁহার স্ত্রীর হাতে সংসারের আয়ব্যয়ের তহবিল ছাড়িয়া দেন। স্বামীর হৃদয়ের চাবিকাঠির বিনিময়ে তাঁহার ক্যাশবাক্সের চাবিকাঠি পাইলেও স্ত্রী নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইবে না। সে নোট ভাঙ্গাইয়া টাকা করিবে, টাকা গাঁথাইয়া নোট করিবে; সংসারের খরচ, কেনাবেচা লোক-লৌকিকতা করিবে; টাকা জমাইয়া গহনা গড়াইবে, প্রতি-

বেশীনীদিগকে টাকা কর্জ্জ দিবে, এবং বাপের বাড়ীর ও ভাবের লোকদের অর্থকষ্ট দূর করিবে। স্ত্রী যখন এই সকল কাজে ব্যাপৃতা থাকিবে, স্বামী বেচারী সেই অবকাশে দুদণ্ড বাহিরে চরিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবেন। স্ত্রীলোক কাজ পাইলেই সন্তুষ্ট; সে বেকার থাকিলেই অনর্থ বাধাইবে।

কাশীনাথ বাবু স্ত্রী-চরিত্র বুঝিতেন। তাই তিনি তাঁহার স্ত্রী সুলোচনার হাতে সংসারের তহবিল নিঃস্বত্বে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সুলোচনা তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের সংসার, বয়স ২৪।২৫ বৎসর হইবে। সে বড়ঘরের মেয়ে না হইলেও দেখিতে খুব সুন্দরী ছিল। কিন্তু স্ত্রী সুন্দরী হইলেই কি স্বামীকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে? বিশেষতঃ কাশীনাথ বাবু সে পাত্রই নহেন। তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীও খুব রূপসী ও গুণবতী ছিলেন। তিনিও এই ষণ্ডপ্রকৃতি স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিতা হইয়া মনের দুঃখে অল্প বয়সে একটী সুন্দর কন্যাসন্তান প্রসব করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। সুলোচনা বন্ধ্যা। সুতরাং এই কন্যাই কাশীবাবুর একমাত্র সন্তান। তাঁহার ভগ্নী কৃপাময়ী এই কন্যাটীকে মানুষ করিয়াছিলেন এবং তাহার নাম রাখিয়াছিলেন পারুল।

পারুল তাহার বাপের বিশেষ আদরের মেয়ে ছিল। কাশীনাথ বাবুর অতৃপ্ত হৃদয়ের প্রেম তাঁহার স্ত্রী সুলোচনাকে লঙ্ঘন করিয়া স্নেহরূপে পারুলে আসিয়া পড়িয়াছিল। পারুলের বিমাতা যে তাহাকে দেখিতে পারিত না, ইহা তাহার অন্যতম কারণ। বিশেষতঃ, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বলিয়া সুলোচনার প্রগল্‌ভা ও মুখরা হইবার অধিকার ছিল। তাহার কথায় ঘরের দরজা শার্সী খড়খড়ি

হইতে মানুষ বিড়াল পর্য্যন্ত সকলেই কাঁপিত। কেবল কাঁপিত না কৃপাময়ী। কৃপাময়ী কাশীবাবুর অপেক্ষা দশ বার বৎসরের বড়। তিনি খুব রাশভারী স্ত্রীলোক ছিলেন। সুলোচনা যখন পারুলের উপর থন্‌থন্‌ ঝন্‌ঝন্‌ করিত, তখন কৃপাময়ী "হ্যাঁলা বৌ, তুই যে বড্ড বাড়িয়েছিস্" বলিয়া সপ্তমে চড়িতেন। তাহাতে সুলোচনা একআধটা চোপা করিয়া চুপ করিত। পারুলের পিসীমার অতিস্নেহে তাহার বিমাতার অস্নেহের কাটান হইয়া যাইত।

কৃপাময়ী কিঞ্চিৎ কালা থাকায়, সুলোচনার অনেক দম্ভপূর্ণ কথা তাঁহার কাণেই আসিত না; সুতরাং সংসারের অশান্তিও অনেকটা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। কিন্তু কাশীবাবু বধির ছিলেন না। এজন্য সুলোচনার অনেক বাঁকা কথা সর্ব্বদাই তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিত। তিনি বুঝিলেন, সংসারে তাঁহার স্ত্রী যে ঈর্ষার আগুন জ্বালিয়াছে, তাহা নির্ব্বাপিত করিবার একমাত্র উপায় হচ্চে পারুলকে পাত্রস্থ করিয়া পরের ঘরে পাঠাইয়া দেওয়া।

কাশীবাবু বুনিয়াদী ঘরের লোক বলিয়া সমাজ-সংস্কারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিতেন—"যাহারা আইবড় মেয়েকে বড় করিয়া বিবাহ দেয়, তাহাদের নিশ্চয়ই চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হয়। ঋতুমতী কন্যার বিবাহ দেওয়া, আর তাহাকে গলা টিপিয়া সোণা-গাছীতে পাঠাইয়া দেওয়া একই কথা।" সুতরাং পারুলের বয়স যখন নয় বৎসর, তখন কাশীনাথ বাবু একটি 'তোফা' পাত্র সংগ্রহ করিয়া তাহার সহিত মহাসমারোহে কন্যার বিবাহ দিলেন কিন্তু বিবাহের পরবৎসর পারুল বিধবা হইল। শ্বশুরালয়ে তাহারি অপয়া মেয়ে বলিয়া বদনাম হওয়ায়, সে পিত্রালয়ে চলিয়া আসিল।

তদবধি সে এইখানেই থাকিয়া গেল।

পাড়ার একজন আধাব্রাহ্ম প্রতিবেশী একদিন কাশীবাবুর নিকট পারুলের পুনরায় বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কাশীবাবু বলিয়াছিলেন—"আমি জানি, বিদ্যাসাগর অক্ষত-যোনী বিধবার বিবাহের আইন করে গেছে। কিন্তু আমি কি লজ্‌ঝড় বেহ্মজ্ঞানী যে বিদ্যাসাগরের মতে মেয়ের আবার বিবাহ দিব? বুনিয়াদী ঘরে নিকে হয় না হে!"

এঁড়েদহে কাশীনাথ বাবুর এক বাগান-বাড়ী ছিল। গঙ্গার উপরে বিস্তৃত উদ্যানমধ্যে সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকা। এখানে কাশীবাবুর স্বর্গীয়া মাতা ঠাকুরাণী একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কাশীবাবু মুখরা সুলোচনার সঙ্গে কলহ করিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভগ্নী ও কন্যাকে লইয়া এই বাগান-বাড়ীতে আসিতেন। কিন্তু মাছ যেমন জল ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, তিনিও তেমনি সহর ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। পল্লীগ্রামে আসিলে কাশী-বাবু হাঁপাইয়া উঠিতেন। সেকারণে তিনি এঁড়েদহের বাগান-বাড়ীতে দু'এক দিন থাকিয়াই আবার কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেন।

বৃদ্ধা কৃপাময়ী কিন্তু এই বাগানবাড়ীতে বাস করিতে বড়ই ভালবাসিতেন এখানে তাঁহার একপ্রকার গঙ্গাগর্ভে বাস ও নিত্য গঙ্গাস্নানের সুবিধা ছিল। তাহার উপর বাগানের মধ্যেই তাঁহার মায়ের স্থাপিত শিবমন্দির—সোণায় সোহাগা। এইজন্য তিনি এঁড়েদহের বাগান-বাড়ীকে ক্ষুদ্র বারাণসী বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ভাইয়ের সংসারে সুলোচনার সঙ্গে তাঁহার অবনিবনা

ক্রমেই বাড়িতেছিল। সেকারণে কৃপাময়ী ইদানীং কাশীবাবুকে সম্মত করিয়া এঁড়েদহের বাগান-বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে-ছিলেন। পরিবারবর্গের যে যেখানে থাকিয়া সন্তুষ্ট হয়, তাহাতে কাশীবাবুর আপত্তি ছিল না। তিনি সংসারের সকলকে তাহাদের স্ব স্ব ইচ্ছার বিরুদ্ধে একত্রে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিতেন না। তাঁহার সংসারের বন্ধন কিছু শিথিল ছিল। আজকাল তিনি নিজে দমদমার বাগানেই অনেক দিন কাটাইতেন ; এবং পনের কুড়ি দিন অন্তর এঁড়েদহে গিয়া তাঁহার ভগ্নী ও কন্যাকে দেখিয়া আসিতেন। বাগবাজারে তাঁহার নিজ বাড়ীতে সুলোচনা এক প্রকার নিষ্কণ্টকে একাধিপত্য করিত। বাড়ীর সমস্ত দাসদাসী ও কর্ম্মচারী তাহার আজ্ঞাকারী ; বিশেষতঃ সোণা-ঝী ও গোমস্তা রসিকলাল সুলোচনার বড় প্রিয়পাত্র ছিল।

[৩]

প্রস্ফুটিত পারুল।

পারুল তাহার পিসীমার সঙ্গে এঁড়েদহের বাগান-বাড়ীতেই থাকিত। এখানে তাহাদের লোকজনের মধ্যে ছিল একজন বৃদ্ধ পরিচারিকা, একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও দুইজন মালী। শেষোক্ত তিন জনেই উড়িষ্যা দেশের লোক।

বাগানখানি দীর্ঘে প্রায় চার রশি এবং প্রস্থে প্রায় দুই রশি হইবে। ইহার মধ্যে ফলপাকড়ের গাছই অধিক ছিল ; তাহাতে

প্রচুর পরিমাণে আম, কাঁটাল, নারিকেল, বেল, কালজাম, গোলাপ জাম, সবেদা, বাতাবিলেবু, কলা, তাল, ও সুপারি ফলিত। জাতী, যুথী, মল্লিকা, বেল, গোলাপ, টগর, গন্ধরাজ, করবী, মাধবী, এবং স্থলপদ্ম, চম্পক, বক, বকুলাদি যাবতীয় দেশী ফুলের ছোটবড় অনেক রকম গাছ ছিল। পারুলের বড় ফুলগাছের উপর ঝোঁক ছিল। সে মালীদের দ্বারা দমদমার বাগান হইতে বহুবিধ বিলাতি ঋতুফুলের চারা গাছ আনাইয়া বাগানের এক নিভৃত ফাঁকা জায়গায় নিজে পছন্দ করিয়া বসাইয়াছিল। তাহার মধ্যে ছিল অ্যাষ্টার, প্যান্সী, পিঙ্ক্‌, হোলিহক্‌, ক্রাইসেন্থেমাম্‌, ভায়োলেট্‌, নষ্টেসিয়াম্‌ ও ড্যালিয়া। কতকগুলি ভালজাতের গোলাপ ও রজনীগন্ধাও এখানে স্থান পাইয়াছিল। বড় বাগানের মধ্যে পারুলের এই ছোট বাগানখানি বসন্তকালে যেন একখানি বিচিত্র মণিমুক্তাখচিত কার্পেট বলিয়া বোধ হইত। ইহার অদূরে কয়েকটি ঘনসন্নিবিষ্ট তরুলতার শাখা প্রশাখা জড়িত হইয়া একটি কুঞ্জের সৃষ্টি করিয়াছিল। মালীদের শৈথিল্যও ইহার একটি কারণ বটে। যাহা হউক, পারুল এখন মালীদের এই সুন্দর স্বাভাবিক লতাকুঞ্জটিকে নষ্ট করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল।

পারুল আর এখন বালিকা নহে। সে বরাবর শুনিয়া আসিয়াছে সকলে তাহাকে "দিব্যি ফুটফুটে মেয়েটি" বলিত। সেও আপনাকে এতদিন একটি ফুটফুটে মেয়ে বলিয়াই জানিত। তাহাদের বাগানের ভিতর দিয়া গ্রামের অনেক স্ত্রীলোক গঙ্গায় স্নান করিতে যাইত। একদিন পারুলকে দেখাইয়া একটি স্ত্রীলোক আর একটি স্ত্রীলোককে বলিতেছিল,—"দ্যাখ দ্যাখ ভাই! মেয়েটীর রূপ

যেন ফেটে পড়ছে !" এই কথা পারুলের কাণে গেল। সে মনে মনে বলিল, "সত্যি কি আমার খুব রূপ আছে ?" সে তৎক্ষণাৎ গৃহে গিয়া দর্পণে নিজের রূপ ভাল করিয়া দেখিল, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। দর্পণও তাহাকে সেই কথা বলিল। সেই দিন হইতে পারুলের রূপবোধ হইল। সে সেইদিন হইতে প্রত্যহ আয়নাতে সাধ করিয়া নিজের রূপ দেখিতে আরম্ভ করিল। সেই দিন হইতে তাহার বসন-ভূষণের দিকে দৃষ্টি পড়িল।

সে আজ ছয় মাসের কথা। এই ছয়মাসের মধ্যে পারুলের আকৃতি-প্রকৃতির একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জীবনে যৌবনের বন্যা আসিয়া তাহার বালিকাসুলভ চপলতা, সরলতা ও উচ্চহাসি ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। পূর্ণ পঞ্চদশ বৎসর বলিলে যেসকল পরিবর্ত্তন বুঝায়, পারুলের মধ্যে তাহার সকলগুলিই দেখা দিয়াছিল। এই পরিবর্ত্তনগুলি লইয়া তাহাকে কিছু বিব্রত হইতে হইয়াছিল। সে মাথায় কখন কখন কাপড় দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে। কোন কোন পুরুষ দেখিলে সে বদনের ব্রীড়াভাব ও নয়নের বক্রভাব অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে ঢাকিতে চাহিত। মাতৃত্বের পূর্ব্বাভাস বক্ষের স্ফীততাকে সে বস্ত্রের দ্বারা আবরণ করিতে চেষ্টা করিত। নিতম্ব ঈষৎ ভারি হওয়ায় তাহার চরণের চাঞ্চল্য প্রতিপদে প্রতিহত হইত। সেকারণে পারুল আর এখন পূর্ব্বের ন্যায় প্রজাপতি ধরিবার জন্য তাহার পিছু পিছু ছুটিতে চাহিত না। কণ্ঠস্বরের এমন এক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, যে-কারণে সে তাহা সকলকে সর্ব্বদা শুনাইতে লজ্জাবোধ করিত। ছয়মাস পূর্ব্বে তাহার এই সকল লক্ষণ ছিল না। কৈশোরের কোরক

ফুটিতে অধিক সময় লাগে না। কাল যাহা কুঁড়ি দেখিয়াছি, আজ তাহা পূর্ণপ্রস্ফুটিত পারুলরূপে রূপ ও সৌরভ বিকীর্ণ করিয়া ভ্রমরকে আহ্বান করিতেছে।

বৃদ্ধ পিসীমার কাছে পারুল এখনও সেই বালিকাই আছে। কৃপাময়ী প্রত্যহ বৈকালে স্বহস্তে তাহার চুল বাঁধিয়া গা মুছাইয়া দিতেন। তারপর সে একখানি মিহি ঢাকাই কাপড় পরিয়া বাগানে বেড়াইতে যাইত এবং পছন্দমত ফুলের মালা গাঁথিয়া কণ্ঠে ও কবরীতে পরিত। হাতে পায়ে ও গণ্ডে স্বাভাবিক রক্তরাগ থাকায় তাহার আর আল্‌তা পরিবার আবশ্যক হইত না। পারুল কোনও দিনই বৈধব্যোপযোগী সংযম করিতে শিখে নাই। তাহার জীবনের কোন্ প্রভাতে বিবাহযোগ ও বৈধব্যযোগ একযোগে চলিয়া গিয়াছিল, তাহা তাহার স্মরণ ছিল না। বিশেষতঃ, কাশীনাথ বাবুর সংসার কোনও দিনই সংযম শিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল না। পারুল স্বীয় চরিত্রে তাহার গুণবতী মাতার গুণগুলিরও কিছু কিছু পাইয়াছিল এবং বিলাসী পীতার দোষগুলিরও কিছু কিছু পাইয়াছিল। কৃপাময়ীর আদরে তাহার এই দোষের মাত্রা কিছু বর্দ্ধিত হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু এই সকল সামান্য দোষে পারুলের অন্তঃপ্রকৃতির স্বচ্ছতা ও সরলতা নষ্ট হয় নাই। তাহার প্রাণে বিন্দুমাত্র দ্বেষ হিংসা ছিল না। গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে তাহাদের বাগানে ফুল তুলিতে বা ফল পাড়িতে আসিলে পারুল তাহাদিগকে নিষেধ না করিয়া বরং উৎসাহ দিত।

[৪]

সমাজের নিম্নস্তর।

পাঠক বোধ করি নন্দলাল ও হেমাঙ্গিনীদের ভুলিয়া যান নাই। ইহারা কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতায় আসিয়া সুরেশের মেসের নিকট স্বতন্ত্র বাসা করিয়া প্রায় একমাস ছিল। পরে কামারহাটির চটকলে নন্দলালের একটি চাকরি হইয়াছিল; বেতন পঁচিশ টাকা, কিছু উপরিও ছিল। কামারহাটির চটকলে প্রায় চার হাজার কুলি কাজ করে। সেজন্য সেখানে ঘরের ভাড়াও অধিক এবং স্থানও কিছু অস্বাস্থ্যকর। নন্দলালেরা এই কারণে সহরের প্রান্তভাগে কর্ম্মস্থান হইতে কিছু দূরে বাসা করিয়াছিল।

কলেজ বন্ধ থাকিলে সুরেশ প্রায়ই কামারহাটিতে নন্দলালদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিত। ইহাতে তাহার পল্লীশোভা সন্দর্শনেরও সুবিধা হইত। এক রবিবার সে এখানে আসিয়া পাঁচুমামার সাক্ষাৎলাভ করিল। পঞ্চানন সুরেশকে বড় স্নেহ করিতেন। সে সায়েন্স্ কোর্সে বি, এ, পাশ করিয়াছে শুনিয়া তিনি ভারি সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাহাকে ডাক্তারি লাইনে যাইতে পরামর্শ দিলেন। বলিলেন—"সুরেশ, তুমি ডাক্তার হইতে পারিলে অনেকের জীবন রক্ষা করিতে পারিবে। আমি ওকালতির চেয়ে ডাক্তারিকে ভাল বলি।' সুরেশেরও ডাক্তারি শিখিবার ইচ্ছা ছিল। তবে সে সংকল্প করিয়াছিল যে বি, এ, পাশ না করিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইবে না।

আজ হেমাঙ্গিনীর কাজ কিছু বাড়িয়া গিয়াছিল। সে যত্নের সহিত

অনেকগুলি তরকারী রন্ধন করিয়া সকলকে তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করাইল; আর কলের ছোট সাহেব যে তাহার ভাইকে বিশেষ ভালবাসেন এবং সম্প্রতি তাহার পাঁচ টাকা মাহিনা বাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহাও জ্ঞাপন করিল।

আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়া পঞ্চানন বাবু সুরেশ ও নন্দলালকে লইয়া সহরে বেড়াইতে গেলেন। ছুটি বলিয়া সে দিন কলের কাজ বন্ধ ছিল। সুতরাং তাঁহারা কুলি-লাইন পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। পঞ্চানন নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত দরিদ্র লোকদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারিতেন। তিনি বলিতেন, এই শ্রেণীর মধ্যে এমন একটা সরলভাব দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য। অজ্ঞ নিম্ন শ্রেণীর লোক কখনও নিজের ভুল বুঝিতে পারিলে তাহা তৎক্ষণাৎ কবুল করিবে। কিন্তু লেখাপড়াজানা ভদ্রলোক নিজের ভ্রম-প্রমাদ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন। শিক্ষিত ব্যক্তি বিদ্যাবুদ্ধির কেরামতি দেখাইয়া তাঁহার ভ্রান্ত মত হইতে এক এক ধাপ করিয়া নামিয়া একেবারে বিপরীত মতে আসিয়া দাঁড়াইবেন, অথচ বলিবেন যে তাঁহার মতের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই—তাহা পূর্ব্বেও যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। নিজের বোধশক্তির পরাভব স্বীকার করা তাঁহার কোষ্ঠীতে লেখে না।

পঞ্চানন সুরেশকে বলিলেন—"অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমার সংস্কার হইয়াছে, সমাজের যে স্তর যত উপরে, তাহার মধ্যে সরলতার তত অভাব।"

সুরেশ বলিল—"কিন্তু এই নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পশুপ্রকৃতির

বিস্তর জঘন্য লোক দেখিতে পাওয়া যায়।”

পঞ্চানন বলিলেন—“সে কথা সত্য বটে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে এমন অনেক লোক দেখিতে পাইবে, যাহাদের ভিতর এরূপ দয়ামায়া, ধর্ম্মজ্ঞান ও মনুষ্যত্ব আছে, যাহা ভদ্রঘরের অনেক বড়লোকের ভিতরেও নাই।”

তিনি সুরেশকে বুঝাইয়া দিলেন যে, কঠোর দুঃখ-দারিদ্র্যের আগুনে গালাইয়া বিধাতা অধিকাংশ মানুষের ভবিষ্যৎ গঠন করিয়া থাকেন। যাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধাতু থাকে, সে এই অগ্নি-পরীক্ষা হইতে উজ্জ্বলকান্তি লাভ করিয়া দেবতারূপে নিষ্ক্রান্ত হয়; আর যাহার নিকৃষ্ট ধাতুতে গঠন, সে ইহা হইতে লৌহময় নির্ম্মম নারকী হইয়া বাহির হয়। পঞ্চানন বলিলেন—“কুলি-মজুরেরাও মানুষ; তাঁহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই মনুষ্যত্ব অস্ফুট ভাবে আছে। এই শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানালোক প্রবেশ করাইতে পারিলে তাহারা দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া নিজেদের মনুষ্যত্ব ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইবে, এবং কেহ কেহ বা উন্নতির সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিতে পারিবে।” পাঁচুমামা সুরেশকে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট লিংকলন, গারফিল্ড প্রভৃতির জীবনী পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি রামায়ণ মহাভারত হইতে নজীর বাহির করিলেন না বলিয়া পাঠক দুঃখিত হইবেন না।

কুলি লাইনের আশে পাশে চারিদিকে ঘুরিয়া পঞ্চানন লক্ষ্য করিলেন, এখানে জনমজুরদিগের জন্য মুদিখানার দোকানও আছে, শুঁড়িখানা আছে, তাড়িখানা আছে, একটি ছোট বেশ্যাপল্লীও আছে; অধিকন্তু, তাহাদের আশু অর্থাভাব নিবারণের জন্য মাড়োয়ারীও

কাবুলী মহাজনও আছে। কিন্তু এখানে নাই কেবল কোন নৈশবিদ্যালয় বা শ্রমজীবী-সমিতি। তিনি বুঝিলেন যে, কুলি-মজুরদিগকে নরকের দিকে লইয়া যাইবার সকল ব্যবস্থাই আছে; নাই কেবল তাহাদিগকে স্বর্গের দিকে টানিয়া তুলিবার কোনও উপায়। পঞ্চানন ব্যথিত হইয়া সুরেশকে বলিলেন—"The nation dwells in the cottage. এই সকল নিম্ন-শ্রেণীর লোককে উন্নত না করিতে পারিলে দেশ উন্নত হইবে না। স্বদেশী যুবকদিগের সম্মুখে এই এক বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এই সকল যুবক কেবল বয়কট্ ও বন্দে-মাতরং করিয়া নিজেদের যে শক্তি ও সময়ের অপচয় করে, তাহা যদি এই কাজে লাগায়, তাহা হইলে দেশের একটা মহৎ কাজ হয়।"

এইখানে আমরা পাঠককে সংক্ষেপে বলিয়া রাখি যে, পঞ্চানন বাবুর উৎসাহে, সুরেশ ও নন্দলালের সামান্য চেষ্টায় এবং কতকগুলি স্থানীয় শিক্ষিত যুবকের বিশেষ উদ্যোগে অল্প দিনের মধ্যেই কামারহাটিতে একটি নাইট-স্কুল ও একটি শ্রমজীবী-সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সমিতি হইতে কুলি-দিগের দরখাস্ত ও চিঠিপত্রাদি লিখিয়া দেওয়া হইত, এবং তাহাদের রোগে শোকে, বিপদে আপদে সাহায্য করা হইত। স্থানীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ নাইট্-স্কুলে কুলিদিগকে শিক্ষাদান করিত। চট-কলের ছোট-সাহেব নন্দলালের অনুরোধে শ্রমজীবী-সমিতির ও নৈশবিদ্যালয়ের প্রধান পেট্রণ হইয়াছিলেন। তাঁহারই অর্থ-সাহায্যে এই দুইটি এক-

প্রকার চলিয়া যাইত। স্বার্থান্বেষণে সাহেবরা প্রাচ্যে আসিলেও, তাঁহারা যে আধুনিক বিশ্বসভ্যতার প্রজ্জলিত বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া আসেন; তাহার উজ্জ্বল আলোকের জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট ঋণী। একথা স্বীকার না করিলে অধর্ম্ম হইবে।

[৫]

এই সেই।

দেশের যুবকবৃন্দ দলবদ্ধ হইয়া যখন কোনও সাধারণের হিতকর কার্য্যে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে থাকে, তখন সে দৃশ্য দেখিয়া কাহার প্রাণে না আনন্দ হয়? কলিকাতায় অর্দ্ধোদয় যোগের সময়, এবং বর্দ্ধমান জেলায় জলপ্লাবনের সময় বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবকগণ দেশবাসীর জন্য যাহা করিয়াছিল, তাহা কি দেশের লোক কখনও ভুলিতে পারিবে? দেশের কত স্থানে মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও মেলা উপলক্ষে বাঙ্গালী যুবকেরা এইরূপ কত দেশহিতকার্য্য সাধন করিতেছে তাহার সকল খবর সংবাদপত্রে বাহির হয় না; সুতরাং সকলে তাহা জানিতে পারে না। কামারহাটির শ্রমজীবী-সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণ যে কুলিমজুরদিগের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কত পরিশ্রম করিত তাহাই বা কয়জনে জানে?

সম্প্রতি এখানে কুলি-লাইনে কলেরা দেখা দিয়াছিল। একটি বালক-কুলি এইরোগে আক্রান্ত হইয়া হিমাঙ্গ হইয়া

গিয়াছিল। কলের ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করিতেছিলেন। শ্রমজীবী-সমিতির তিনজন স্বেচ্ছাসেবক বালকটির শুশ্রূষা করিতেছিল। রোগীর আত্মীয়স্বজন কেহই ছিল না। সমিতির ছেলেরা স্বহস্তে তাহার মল ও বমনাদি স্থানান্তরিত করিতেছিল, ঘড়ি ধরিয়া ঔষধপত্র খাওয়াইতেছিল, হাতেপায়ে সেক দিতেছিল, এবং ডাক্তারবাবু যেরূপ দেখাইয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবে দুইঘণ্টা অন্তর রেক্ট্যাল্ স্যালাইন্ ইন্‌জেক্‌সন্ করিতেছিল। সমস্তরাত্র এইরূপে কাটিয়া গেল। প্রত্যুষে ডাক্তারবাবু আসিয়া হাত দেখিয়া বলিলেন, নাড়ী আসিয়াছে এবং রোগীর বাঁচিবার রাহা হইয়াছে। সেবা ও চিকিৎসা সমানভাবে চলিতে লাগিল। সমস্ত দিন এইভাবে কাটিয়া গিয়া রাত্রি ৮টার পর রোগীর প্রস্রাব হইল।

তিনদিন পরে বালকটিকে অন্নপথ্য দেওয়া হইল। কিন্তু তাহার শরীরের অবস্থা তখনও অত্যন্ত শোচনীয়। কিছুদিন সে কলের কাজকর্ম্ম করিতে পারিবে না। এই অবস্থায় তাহাকে দেখিবার শুনিবার কেহ না থাকায় নন্দলাল বালকটিকে নিজের বাসায় লইয়া আসিল। এই বালকটির সকল ভার এখন হেমাঙ্গিনীর উপর পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর স্নেহও বালকটির উপর পড়িল। এইরূপই হইয়া থাকে। সরকারী দিদি এখন হইতে এই বালকটিরও দিদি হইল।

রবিবার সুরেশ কামারহাটিতে আসিয়া এই বালকটিকে দেখিল এবং তাহার রোগের কথা শুনিল। নন্দলাল বলিল—

"কলেরা হইয়া এর নাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছিল; আমাদের সমিতির ছেলেরা অনেক কষ্ট ক'রে একে বাঁচিয়েছে। সুরেশ বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোর বাপ-মা আছে?"

"না।"

"তোর বাড়ী কোথায়?"

"কল্‌কাতায়।"

"তোরা কি জাত?"

"কুর্ম্মি।"

"তা'হলে তুই খোট্টা?"

"খোট্টা কেন? আমি বাঙ্গালী।"

"বাঙ্গালী কি কুর্ম্মি হয়?"

"কেন হবে না? তবে আমি কুর্ম্মি হলুম কি করে? আমি ত বাঙ্গালী।"

"তোর নাম কি?"

"ঝুমন্।"

সে যে কেমন বাঙ্গালী তাহা সুরেশ বুঝিতে পারিল। জিজ্ঞাসা করিল—"চট-কলে তুই কতদিন চাকরি কচ্ছিস্?"

"এই একমাস।"

"এর আগে তুই কি কর্‌তিস্?"

"কল্‌কাতায় এক বিড়ির দোকানে চাকরি কর্‌তুম্।"

"সেখানে কত ক'রে মাহিনা পেতিস্?"

"দশটাকা করে।"

ঝুমন্ এই কথাটি মিথ্যা বলিয়াছিল। নিজের দর বাড়াইবার জন্ত অনেকেই মিথ্যা বলিয়া থাকে। সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল—"এখানকার কলে কত ক'রে মাহিনা পাস্?"

"ছ' টাকা করে।"

"তবে সে-চাকরি ছেড়ে এখানে এলি কেন? সেখানে ত বেশী মাহিনা পেতিস্।"

সুরেশের জেরায় ঝুমন্ ফাঁপরে পড়িল। কিন্তু সে ঠকিবার ছেলে নয়। বলিল—"জেলখানার বিধুবাবু আমাকে বিড়ির দোকানে চাকরি কর্‌তে বলেছিল। তাই আমি সে চাকরিতে গিয়েছিলুম। কিন্তু যার দোকানে চাকরি কর্‌তুম সে শালা বড় বজ্জাত। আমি তার বাক্স থেকে টাকা চুরি করেছি বলে শালা আমাকে ধরে থানায় নিয়ে যাচ্ছিল। আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শালার নাকে এক ঘুসি মেরে একেবারে ভোঁ দৌড়!"

"জেলখানার বিধুবাবু কে রে?"

"সেই যে গো, বিধুবাবু একজন কয়েদী। আমি তার কাজকর্ম্ম কর্‌তুম, পা টিপে দিতুম্। সে খুব ভাল লোক ছিল। সেই ত আমাকে বল্‌ত, 'ঝুমন্, তুই আর পকেট টকেট্—তুই আর কিছু করিস্‌নি; জেল থেকে গিয়ে কল্‌কাতার কোন বিড়ির দোকানে চাকরি করিস্'।"

"তুই তা'হলে জেল খেটেছিলি?"

"জেল খাটব কেন? আমি সেখানে বিধুবাবুর চাকরি কর্‌তুম।"

এই চাকরির অর্থ কি তাহা বুঝিতে পারিয়া সুরেশ হাসিয়া ফেলিল। বলিল—"ঝুমন্, তুই লেখাপড়া শিখ্‌বি ?"

ঝুমন্ বলিল—"লেখাপড়া শিখ্‌লে মন্দ হয় না। তা'হলে আমার বড় চাকরি হবে, অনেক টাকা রোজগার কর্‌তে পারব ; খুব বড় মানুষ হ'ব।"

দেহে বল পাইয়া ঝুমন্ যখন কলের কাজে যাইতে লাগিল, তখন তাহাকে নৈশবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হইল। সে প্রাতে হেমাঙ্গিনীর ফাইফরমাস খাটিত, এবং আহার করিয়া নন্দবাবুর সঙ্গে চাকরিতে যাইত। পাঠক বুঝিয়াছেন, এ সেই আলিপুরের জেলখানার পিক্‌পকেট ঝুমন্। স্কুলে পড়িয়া বড় লোক হইবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহার নাইট-স্কুল ভাল লাগিত না।

ছুটির দিনে ঝুমন্ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিত, এবং বনের পাখীর ন্যায় ইচ্ছামত চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইত। সে দিন সে গ্রামের বালকদিগের সর্দ্দার হইয়া তাহাদিগকে লইয়া ঘোড়্‌দৌড় খেলিত। কখনও বা কাহারও বাগানে ঢুকিয়া গাছের ফল পাড়িত, ডাল ভাঙ্গিত ; এবং যাহার বাগান সে তাড়া করিয়া আসিলে বেড়া ডিঙ্গাইয়া একলাফে পগার পার হইয়া তাহাকে বক দেখাইয়া পালাইয়া যাইত। অভ্যাসের গুণগুলি যাইবে কোথায় ?

[৬]

বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ।

কলিকাতা হইতে কামারহাটি যাইতে হইলে রেলে আগড়পাড়া বা বেলঘরিয়ায় নামিয়া যাওয়া যায়; অথবা ষ্টিমারে করিয়া এঁড়েদহের ঘাটে নামিয়াও যাওয়া যায়। সুরেশ উভয় পথই ব্যবহার করিত। এঁড়েদহের ভিতর দিয়া যাইবার সময় তাহাকে কাশীনাথ বাবুর বাগানের ধার দিয়া যাইতে হইত।

এই বাগানে অনেক ফলের গাছ থাকায় ঝুমনের এখানেও গতিবিধি ছিল। সে মালীদের সঙ্গে পোটসোট করিয়া লইয়াছিল। ঝুমন্ বাগানে আসিলে পারুল তাহাকে দিয়া কোন কোন গাছের ফল পাড়াইয়া লইত এবং দু'চারিটি তাহাকে খাইতে দিত। বেলগাছের খুব উচ্চ ডাল হইতে উৎকৃষ্ট বিল্বপত্র পাড়িয়া দিয়া সে পারুলের পিসীমার কাছ থেকেও দুএকটা পয়সা বক্‌শিস্ আদায় করিত।

সুরেশ এই বাগানের পাশ দিয়া যাইবার সময় দু'একদিন পারুলকে দেখিয়াছিল। চক্ষু অনেক সময় ক্যামেরার গবাক্ষের কাজ করে। পারুলের ফুটন্ত রূপ এই গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়া সুরেশের হৃদয়পটে মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু পারুল তাহা জানিত না—জানা সম্ভবও নহে। বাগানের ধার দিয়া কত লোক যাতায়াত করে, সে তাহা লক্ষ্য করিবে কেন? তাহার ত একটা লজ্জাশীলতা আছে! পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে

পারেন, তবে পারুল ভাল সাজগোজ করিত কেন? উত্তর—ভাল দেখাইবার জন্য, ভাল দেখিবার জন্য নহে। তবে যাহা ভাল, তাহা যে দেখিতে না চাহে তাহারও দৃষ্টির পথে দৈবাৎ আসিয়া পড়ে, এবং তখন হইতেই গোল বাধে।

ইদানীং সুরেশ এঁড়েদহের ভিতর দিয়াই কামারহাটি যাওয়া পছন্দ করিত। একদিন সে কাশীবাবুর বাগানের ধার দিয়া নন্দলালদের বাটীতে যাইতেছিল। ঝুমন্ তখন এই বাগানের একটা পিয়ারা গাছে উঠিয়া পিয়ারা পাড়িতেছিল; পারুল গাছতলায় দাঁড়াইয়া ছিল। সুরেশের দৃষ্টি পারুলের উপর নিবদ্ধ থাকায় সে গাছের উপর ঝুমন্‌কে লক্ষ্য করে নাই। ঝুমন্ কিন্তু তাহাকে যাইতে দেখিয়া "সুরেশবাবু!" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

সুরেশ বলিল—"কি রে ঝুমন্, ওখানে কি করছিস্?" সুরেশের কণ্ঠস্বর পারুলের কাণে গেল। যুবতীর তখন অন্য দিকে মুখ ছিল। সে রাজহংসীর ন্যায় গ্রীবা বক্র করিয়া সুরেশের দিকে চাহিয়া দেখিল। পদার্থ-বিজ্ঞানের বিপরীত বিদ্যুতাক্রান্ত দুইটি বস্তুর ন্যায় এই যুবক ও যুবতীর চোখে চোখে মিলন হইল। এই চোখোচোখিই বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ বা স্পার্ক। সুরেশচন্দ্রের ঘনকৃষ্ণ কেশদাম, প্রজ্ঞাব্যঞ্জক বিশাল ললাট, অপরিমিত অনুরাগরঞ্জিত নাসারন্ধ্র, শুভ্রমুক্তাবযুক্ত মুখশ্রী, উচ্চাকাঙ্ক্ষাপূরিত স্ফীতোন্নত বিস্তৃত বক্ষঃ, অঙ্গসৌষ্ঠবসুন্দর দেহযষ্টি, স্বচ্ছশুভ্রাভ বর্ণ—সমস্তই যুগপৎ পারুলের নেত্রপথে পতিত হইয়া তাহার প্রাণ স্পর্শ করিল। সুরেশ লজ্জায়

চক্ষু ফিরাইয়া লইল। পারুল কিন্তু একাধিকবার তাহার প্রতি অতৃপ্ত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। পুরুষ-রমণীর প্রথম প্রেমদৃষ্টির সময় পুরুষ লজ্জিত হয়, কিন্তু রমণী সাহসের পরিচয় দেয়। উভয়ে উভয়ের প্রকৃতির কিঞ্চিৎ অনুকরণ করে।

সুরেশকে ঝুমন্ বলিল—"আমি পিয়ারা পাড়ছি।"

সুরেশ। তুই ঘরে যাবিনি? যাস্ ত আয়।

ঝুমন্। আপনি যান্; আমি যাচ্ছি।

সুরেশ চলিয়া গেল। পারুল ঝুমন্‌কে জিজ্ঞাসা করিল—"ও বাবুটি কে রে?"

ঝুমন্ বলিল—"তুমি ওকে চেন না দিদিমণি? ও যে আমাদের সুরেশবাবু!"

[৭]

অপরাধীর ভয়।

সুরেশচন্দ্রের যদি কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, পাঠক তাহা মার্জ্জনা করিবেন। সে পারুলকে প্রেমের দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল। এই যুবতীর জাতিকুল, এমন কি নাম পর্য্যন্ত না জানিয়া—সে কুমারী, কি সধবা, কি বিধবা তাহাও না জানিয়া—তাহার প্রতি সুরেশের এরূপ দৃষ্টিনিক্ষেপ করা হয় ত উচিত হয় নাই। কিন্তু প্রেমের তড়িৎ স্পর্শে হৃদয় আপনি স্পন্দিত হয়, দৃষ্টি

বল্গাবিচ্যুত অশ্বের ন্যায় স্বতঃই ধাবিত হয়। এ কার্য্যে ভালমন্দ, ন্যায়ান্যায়, বৈধাবৈধের তর্ক চলে না।

অনেক সময় রমণীর হৃদয় জয় করিতে পুরুষকে অনেক যুদ্ধ করিতে হয়। ইহাতে বেশভূষায় রণসজ্জা, নয়নবাণ নিক্ষেপ এবং রসালাপের তূর্য্যধ্বনি করিতে হয়। সুরেশ এখন এই যুদ্ধের পথে। সে নন্দলালদের বাসায় এখন কিছু ঘন ঘন আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার বেশভূষাতেও বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছিল। সে কাশীবাবুর বাগানের মধ্যে পারুলকে দেখিলে তাহার প্রতি অব্যর্থসন্ধানে কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করিতে বিরত হইত না। কেবল তাহার সহিত প্রেমালাপের সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এই কাজটি আপাততঃ ঝুমনের মারফতে পরস্মৈপদে চলিতে লাগিল।

সুরেশ ও পারুলের কাছে এখন ঝুমনের দর বাড়িয়া গিয়াছিল। পারুল তাহার নিকট শুনিয়াছিল যে, সুরেশবাবু কলিকাতায় থাকে এবং মধ্যে মধ্যে কামারহাটিতে তাহার এক বন্ধু নন্দলালবাবুর বাসায় আসে। ঝুমন্ বাগানে আসিলেই পারুল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত—"হ্যাঁরে, তোদের সুরেশবাবু কবে আসবে?" ঝুমন্ কখনও বলিত—"রবিবারে আস্‌বে।" আবার কখনও হয় ত বলিত—"কবে আস্‌বে তা জানিনি দিদিমণি, সুরেশবাবু কিছু বলে যায়নি।" ঝুমন্ বেশ বুঝিতে পারিত যে, এই শেষোক্ত জবাবে তাহার দিদিমণির মেজাজ কিছু বিগড়াইয়া যাইত। তাই সে একদিন সুরেশকে বলিল

—"সুরেশবাবু, তুমি কবে আস্‌বে, তা আমাকে ব'লে যেও। বাবুদের বাগানের দিদিমণি আমাকে কেবল জিজ্ঞাসা করে তুমি কবে আস্‌বে। আমি না বলতে পারলে সে আমার উপর রাগ করে।"

সুরেশ বুঝিল, সে যাহাকে মনে মনে ভালবাসিয়াছে, সেও তাহাকে দেখিতে চায়, সেও তাহাকে সম্ভবতঃ ভালবাসে। নচেৎ তাহার আগমন-সংবাদ না পাইলে সে রাগ করিবে কেন? সুরেশ ঝুমনকে বলিল—"আচ্ছা, আমি যেদিন আস্‌ব, তা আগে থেকে তোকে ঠিক করে বলে যাব।"

সুরেশের পারুলপিপাসা চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইল। কণ্ঠের পিপাসায় পানীয় এবং হৃদয়ের পিপাসায় প্রেম। ঈপ্সিত বস্তু যতই নিকট হয়, তাহার জন্য পিপাসা ততই বাড়িয়া যায়।

ঝুমন্ তাহার দিদিমণির নাম জানিত না। সুতরাং সুরেশও পারুলের নাম জানিতে পারে নাই। তাহাতে আসে যায় কি? সুরেশ একদিন তাহার অজ্ঞাতনামা প্রণয়িনীর উদ্দেশে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখিয়া তাহা ঝুমনের হাতে দিয়া বলিয়াছিল—"তুই এই কাগজখানি নিয়ে গিয়ে তোর দিদিমণিকে দিতে পারিস্? দেখিস্ যেন কেউ টের পায় না।"

এই কবিতার মধ্যে চাঁদ ছিল, চকোর ছিল, বসন্তের মলয়-হিল্লোল ছিল এবং কোকিলের কুহুরব ছিল। ঝুমন্ তাহা পারুলের হাতেও দিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় পারুল তাহা পড়িতে পারিল না। কাশীবাবু স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন বলিয়া পারুলকে তিনি লেখাপড়া শিখিতে

দেন নাই। তিনি বলিতেন, মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখিলে পরপুরুষের সঙ্গে চিঠি চালাচালি করিবে। তিনি ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন; অন্ততঃ নিজের কন্যা সম্বন্ধে বটে।

পারুলের বর্ণজ্ঞান না থাকিলেও সে এই কাগজখানি একহিসাবে পড়িতে পারিয়াছিল। সে ঠিক করিয়া লইল যে, সুরেশবাবু যখন ইহা তাহাকে লিখিয়াছে, তখন ইহা নিশ্চয়ই প্রণয়পত্র; সুতরাং ইহাতে অবশ্য 'প্রিয়ে', 'প্রেয়সী,' 'প্রাণেশ্বরী' আছে। পারুল অনেকবার থিয়েটার দেখিয়াছিল। অতএব সে ঝুমনকে কিছু না বলিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল, এবং কাগজখানি ইষ্ট-কবচ করিবার অভিপ্রায়ে আপাততঃ যত্নপূর্ব্বক বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিল। আমাদের মনে হয়, পাছে ঝুমন্ তাহাকে জবাব লিখিয়া দিতে বলে, এই ভয়ে পারুল পালাইয়া গেল।

ঝুমন্ ফিরিয়া আসিলে সুরেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে, তুই তার হাতে দিতে পেরেছিলি?"

"হাঁ, দিয়েছিলুম।"

"সে পড়েছিল?"

"হাঁ—"

"পড়ে কি বল্লে? খুব খুসী হয়েছিল?"

"দিদিমণি কিছু বল্লে না; চিঠিখানা নিয়েই বাড়ীর ভিতর চলে গেল।"

এই কথা শুনিয়া সুরেশের প্রাণে দারুণ ভয় হইল, পাছে তাহার কবিতাটি কাহাকেও দেখান হয় বা কেহ দৈবাৎ

দেখিয়া ফেলে। সুরেশ মনে মনে বলিল, কাজটা ভাল হয় নাই। সে তাই এঁড়েদহের পথ পরিত্যাগ করিয়া রেল-পথে কামারহাটি যাতায়াত আরম্ভ করিল। ঝুমন্ হাতে করিয়া কবিতাটি তাহার দিদিমণিকে দিয়াছিল। সে-কারণে সুরেশ তাহাকেও এঁড়েদহের বাগানে যাইতে নিষেধ করিয়া দিল।

[৮]

প্রেমের প্রকৃতি।

প্রেমের এক বিশেষ গুণ আছে। ইহার রশ্মি প্রেমিকের হৃদয় হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তুতে প্রতিবিম্বিত হয়, এবং তাহাতে প্রতিহত হইয়া পুনরায় প্রেমিকের প্রাণে ফিরিয়া আসে। পারুল উদ্যানে গিয়া দেখিত, অলিকুল কেতকীকিংশুকের পরাগ অপহরণপূর্ব্বক আপনাদের অঙ্গরাগ করিয়া ফুল্লকুসুমের মধুলুণ্ঠন করিতেছে। কেন না করিবে? যে কাল, তাহার কি পাউডার মাখিয়া প্রিয়জনের নিকট সুন্দর সাজিতে সাধ যায় না? পারুল বুঝিত, কুসুম তাহার শোভা, সৌরভ ও মধু লুটাইয়া দিয়াই জীবন সার্থক করে।

পারুল দেখিত, প্রদোষসময়ে বিহঙ্গমকুল কুঞ্জে ফিরিয়া আসিয়া বৃক্ষপত্রদের নিকট কলকূজনে নিজেদের যাবতীয় দৈনন্দিন কাহিনী বিবৃত করিত; পত্রাবলীও মর্ম্মরকণ্ঠে তাহার প্রত্যুত্তর দিত; এবং এইরূপ প্রেমালাপ করিতে করিতে

অধিক রাত্রি হইলে পাখিগণ তাহাদের কোলে ঘুমাইয়া পড়িত। প্রেম অন্তর্জগতের আলোক হইলেও ইহার জ্যোতিতে বহির্জগতের যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠে।

উদ্যানমধ্যস্থ তাহার সাধের কুঞ্জের একদিকে পারুল লক্ষ্য করিয়াছিল, একটী ব্রততী ঊর্দ্ধমুখে অবলম্বন ভিক্ষা করিতেছে, এবং তাহা দেখিয়া প্রেমিক বনস্পতি তাহার দিকে হেলিয়া পড়িয়া শাখাবাহু বাড়াইয়া দিতেছে। যাহার অবলম্বন আবশ্যক, সে তাহার ঈপ্সিত অবলম্বনকে আলিঙ্গন না করিবে কেন? পারুলেরও অবলম্বনের আবশ্যক হইয়াছিল। যে-নারী যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, তাহার অবস্থাও ঠিক এই অবলম্বনপ্রয়াসী লতার মত হয়। কিন্তু তাহার নির্ব্বাচনশক্তির অনেক সময় একান্ত অভাব ঘটে। হয় ত সে ভাগ্যক্রমে দেবমন্দিরের স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া সগৌরবে স্বর্গের দিকে উঠিতে থাকিবে, না হয় তাহার দুরদৃষ্টবশতঃ কোন ভঙ্গুর শুষ্কতরুকে জড়াইয়া সে নর্দ্দামার নরককুণ্ডে ঝুঁকিয়া পড়িবে।

নারীর মহত্ত্ব এই যে, সে সহজে পুরুষকে হৃদয় দান করিতে উদ্যত হয়। অনেক নৃশংস পুরুষ তাহা না লইয়া কেবল তাহার রক্তমাংস গ্রহণ করে। বঞ্চিতা অবলা তাই অনেক সময় অকূলে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হয়।

পারুল যে অবলম্বনকে মনে মনে বরণ করিয়াছিল, তাহা দেবমন্দিরের স্তম্ভ কি শুষ্কতরু তাহার এখনও কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাহার এই কয়েকদিনের অদর্শনে পারুলের প্রাণে বিশেষ আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। আজ প্রায়

দুইসপ্তাহ হইল সে সুরেশকে দেখিতে পায় নাই। ঝুমন্‌ও আর তাহাদের বাগানে আসে না। ইহার কারণ কি? যতই দিন যাইতে লাগিল, পারুলের ততই উৎকণ্ঠা বাড়িতে লাগিল। সে প্রত্যহই মনে করিত, আজ তাহাকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে। এইরূপে অনেক 'আজ' চলিয়া গেল। নিষ্ঠুর বর্ত্তমান এইরূপে আশাকে নিত্য নিরাশ করিয়া অতীতে গিয়া আত্ম-গোপন করে।

পারুল দিবসের অধিকাংশ সময় বাগানেই কাটাইত। সে মনে করিত, হয় ত সুরেশবাবু সকালেই আসিতে পারে; না হয় দুপুর বেলা আসা সম্ভব। সুতরাং তাহার সর্ব্বদা বাগানে হাজির থাকা উচিত। পারুল যখন স্নানাহার করিতে যাইত, তখন তাহার ভয় হইত পাছে সুরেশ সেই অবকাশে বাগানের পাশ দিয়া চলিয়া যায়। সেজন্য সে তাড়াতাড়ি আহার করিয়াই আবার বাগানে ছুটিয়া আসিত। তাহার পিসীমা একদিন তাহাকে বলিল, "হ্যাঁলা, তুই চব্বিশ ঘণ্টা বাগানে কি করিস্?" পারুল উত্তর করিল, "ক'র্‌ব আবার কি? কেন, বাগানে থাকলে কী দোষ হয়?" আদরের ভাইঝীকে কৃপাময়ী বেশী তাড়না করিতে পারিতেন না। এইরূপে আরও দু'চার দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। পারুল সমস্তদিন বাগানে থাকিয়াও সুরেশকে দেখিতে পাইল না। শেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন সে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার এই উদ্যান-রোদন অরণ্যে রোদন হইলেও তাহা যে নিরর্থক একথা বলিতে পারি না। প্রেমের প্রাবল্যে

প্রাণ দ্রব হইয়া অশ্রুরূপে বাহির হয়। এ অশ্রু অপরে দেখিতে না পাইলেও, ইহার যে অর্থ নাই একথা কে বলিবে?

পারুলের মনের এই অবস্থাকে আমরা একপ্রকার পূর্ব্বরাগ বলিতে পারি। এই পূর্ব্বরাগের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিরহ আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া তাহার সকল কাজেই কিছু অমনোযোগ দেখা দিল। আহারবিহার, বেশভূষা, আমোদআহ্লাদ, পিসীমার কাছে গল্পগুনা প্রভৃতি সকল কাজেই তাহার শৈথিল্য আসিয়া পড়িল। তাহার ফুলগাছগুলি জলাভাবে ও অযত্নে শ্রীহীন হইয়া আসিতেছিল।

[৯]

মান।

একদিন পারুল তাহার লতাকুঞ্জে বসিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছে সেই সকল বিষয় ভাবিতেছিল। বাগানের নিকট দিয়া সুরেশবাবুর যাতায়াত; তাহার সেই দেবদুর্লভ ভুবন-মোহন রূপ; তাহার সঙ্গে চোখেচোখে মিলন; ঝুমনের মারফতে তাহার সেই 'পত্র', এবং তার পর হইতেই তাহার সম্পূর্ণ তিরোভাব—এই সকল পরে পরে তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল। হঠাৎ পারুলের মন প্রশ্ন করিল, শেষের দুইটি ব্যাপারের মধ্যে কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই কি? সুরেশবাবু এই পত্র লিখিয়াই আসা-যাওয়া একেবারে বন্ধ

করিয়াছে। সে আর আসিবে না কেন তাহা বোধ হয় তাহার ঐ পত্রে লেখা ছিল। পারুল এইরূপ সন্দেহ করিল। সে ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া তাহার বাক্স হইতে সুরেশের সেই কাগজখানি লইয়া আসিল।

পারুল এই 'চিঠি'খানি অনেকবার দেখিয়াছে, হৃদয়ে রাখিয়াছে এবং চুম্বন করিয়াছে। সে এই চিঠি এখন আবার খুলিয়া ভাল করিয়া দেখিল। দেখিল, তাহাতে সাদার উপর অনেক কালির আঁচড় আছে, কিন্তু তাহার এক বর্ণও তাহার বুঝিবার সাধ্য নাই। তাহার বাবা কেন তাহাকে লেখা-পড়া শিখান নাই, সেজন্য পারুল তাঁহাকে দোষ দিল। অবশেষে সে স্থির করিল গ্রামের একটি ছোট ছেলেকে ডাকাইয়া তাহার দ্বারা চিঠিখানি পড়াইয়া লইবে। সে একজন মালীকে ডাকিয়া বলিল—"মালী, তুই শিগ্‌গির গিয়ে এই গাঁ থেকে একটি ছোট ছেলেকে ডেকে নিয়ে আয় ত। দেখিস্ যেন দেরি করিস্ নি, ধাঁইকিরি আস্‌বি।" পারুল একআধটা উড়িয়া কথা বলিতে পারিত।

ছোট ছেলেতে দিদিমণির কি দরকার তাহা মালী ভাল বুঝিতে পারিল না। মনে করিল, বুঝি পিসীমার জন্য বিল্বপত্র পাড়াইয়া লইবে। যাহা হউক, সে বাগান হইতে বাহির হইয়া কিছু দূর যাইতে না যাইতেই ঝুমন্‌কে দেখিতে পাইল, এবং তাহাকে ধরিয়া আনিয়া দিদিমণির কাছে হাজীর করিয়া দিল। পারুল-দের বাগানে আসিতে ঝুমনের খুব ইচ্ছা হইত। কিন্তু সুরেশ তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল বলিয়া সে আসিতে পারিত

না। সে মালীর কাছে ইচ্ছা করিয়া ধরা দিয়াছিল। কারণ সে সুরেশবাবুর কাছে বলিতে চাহে যে, দিদিমণিদের মালী তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল।

কার্ত্তিকের সঙ্গে ময়ূরের যে সম্বন্ধ, সুরেশবাবুর সঙ্গে ঝুমনের সেই সম্বন্ধ। পারুল কতকটা এইরূপ মনে করিত। বাহন আসিয়াছে, তাহার কার্ত্তিকও আসিতে পারে—এই ভাবিয়া পারুল খুসী হইল। মালী চলিয়া গেলে সে ঝুমনকে জিজ্ঞাসা করিল—"ঝুমন, তুই আর আমাদের বাগানে আসিস্ নি কেন?"

ঝুমন্ চুপ করিয়া রহিল। পারুল বলিল—"আমি তোর দিদিমণি হই; তোকে কত ভালবাসি, কত-কি দিই। তবে তুই আসিস্ নি কেন ঝুমন? তুই কি আমার উপর রাগ করেছিলি?"

ঝুমন্ আর চাপিতে পারিল না। সে সকল কথা কবুল করিয়া বসিল। বলিল—"না দিদিমণি! তোমাদের বাগানে আস্তে আমার ভারি ইচ্ছা করে। সুরেশবাবু বারণ করেছিল বলে আমি আসতুম্ না।"

এই কথা শুনিয়া দিদিমণির মান-সমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিল। সে ঝুমন্‌কে বলিল,—

"তোর সুরেশ বাবু যদি না আসবে, আর তোকেও যদি এদিকে আস্‌তে না দেবে, তবে তুই তার চিঠি এনে আমাকে দিয়েছিলি কেন? তুই এই নিয়ে যা তোর সেই চিঠি। নিয়ে গিয়ে যার চিঠি তাকে ফিরিয়ে দিস্। আর চিঠি আন্‌লে আমি স্পর্শ করব না।"

পারুল তাহার কাটা কাণ চুল দিয়া ঢাকিয়া লইল। যে পড়িতে জানে না, চিঠিপত্র স্পর্শ করাই তাহার ঝকমারি। পারুল চিঠিখানি ঝুমনের হাতে দিয়া চলিয়া গেল। ঝুমনের বোধ হইল যেন তাহার দিদিমণির চোখে জল আসিয়াছিল।

[১০]

হৃদয় বনাম মস্তিষ্ক।

ঝুমন যে দিন কাগজখানি ফিরাইয়া আনিল, সে দিন সুরেশ কামারহাটিতে ছিল। কাগজখানি পাইয়াই সুরেশ বুঝিল যে, তাহার কবিতা লেখার ব্যাপার কাহারও কাছে প্রকাশ হয় নাই। তাহার ধড়ে প্রাণ আসিল। ঝুমন্ বলিল—"আমি দিদিমণিদের বাগানে যেতুম্ না। তাদের মালী এসে আমাকে রাস্তা থেকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল।"

সুরেশ। তোর দিদিমণি কি বল্লে?

ঝুমন। বল্লে, 'ঝুমন তুই আসিস্ নি কেন?' আমি বল্লুম, 'সুরেশ বাবু বারণ করে দিয়েছে'। এই কথা শুনে দিদিমণির ভারি দুঃখ হ'ল। বল্লে, 'যদি এদিকে না আস্‌বি, তবে চিঠি এনে দিয়েছিলি কেন? এই নে তোর চিঠি। যার চিঠি তাকে ফিরিয়ে দিগে যা।' এই কথা ব'লে দিদি-মণি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চলে গেল।

সুরেশ। তোর দিদিমণি কি আমার উপর রাগ করেছে দেখ্‌লি?

ঝুমন। হ্যাঁ, ভারি রাগ করেছে। দিদিমণি বল্লে, 'তোর সুরেশবাবু যখন এদিকে আসে না, তখন ফের তার চিঠি আন্‌লে আমি তা স্পর্শ কর্‌ব না।'

সুরেশ। আচ্ছা, তবে আর চিঠি দেব না। তুই এসব কথা কাউকে বলিস্‌নি।

মানুষের প্রাণে আতঙ্ক ও উল্লাস একত্রে অবস্থান করে। প্রথমটির অপনোদনমাত্রই দ্বিতীয়টি ফুটিয়া উঠে। সুরেশের হৃদয়ে আনন্দের বান ডাকিল, আশার জোয়ার আসিল। সে তাহার উপাস্য দেবীকে হৃদয়ের ভালবাসা জানাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় কি? দেবী যে তাহার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। পত্র লিখিলে সে যে তাহা স্পর্শ করিবে না বলিয়াছে।

এইখানে সুরেশের হৃদয়ের সঙ্গে তাহার মস্তিষ্কের তর্ক আরম্ভ হইল। হৃদয় দ্বিতীয়বার পত্র লিখিতে ইচ্ছা করিল।

মস্তিষ্ক বলিল—"ঝুমন এ পত্র লইয়া যাইতে রাজী হইবে না।"

হৃদয় বলিল—"ঝুমনকে বুঝাইয়া সুজাইয়া সাধ্যসাধনা করিয়া পত্র লইয়া যাইতে বাধ্য করিব।"

মস্তিষ্ক বলিল—"তাহাকে এ বিষয়ে বেশী সাধ্যসাধনা করা সঙ্গত হইবে না। সে কি মনে করিবে?"

হৃদয় বলিল—"তবে আমি নিজে গিয়া তাহার সহিত দেখা করিব।"

মস্তিষ্ক বলিল—"তাহাতে অনেক বিপদ আছে।"

হৃদয় বলিল—"বিপদের ভয় করিলে ভালবাসা যায় না। যে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে, তাহাকে বিপদের ভয় করিলে চলিবে না।"

মস্তিষ্ক নিরুত্তর হইল।

[১১]

প্রথম মিলন।

ষ্টীমার-ঘাটে যাইবেবলিয়া সুরেশ বৈকালে নন্দলালদের বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিল। কাশীনাথ বাবুর বাগানের নিকট আসিয়া সে তন্মধ্যে তাহার উপাস্য দেবীকে দেখিতে পাইল না। তাহার সঙ্কল্প, সে যখন দীর্ঘকাল পরে সে-পথে আসিয়াছে, তখন তাহার প্রণয়িণীকে না দেখিয়া এঁড়েদহ হইতে যাইবে না।

সুরেশ ফিরিল, এবং যে দিকে দুই চক্ষু যায় সেই দিকে চলিল। কিন্তু অবাধ্য চরণ-যুগল বিভ্রান্ত সুরেশচন্দ্রকে বহুতর অপরিচিত পথের গোলকধাঁধা ঘুরাইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারের অন্তরালে তাহাকে পুনরায় কাশীবাবুর উদ্যানোপকণ্ঠে উপস্থিত করিল এবং সাফ বলিয়া বসিল—"আমরা আর যাইতে পারিব না।" ডাকাতদের কাছে ঘুস খাইয়া বিশ্বাসঘাতক পাল্কী-বেহারাগণ আরোহীকে বিপদসঙ্কুল স্থানে ফেলিয়া এইরূপ

পলায়ন করে। সুরেশের চরণ-বেহারাদ্বয়ও সম্ভবতঃ কাহারও নিকট ঘুস খাইয়া থাকিবে।

সুরেশ বেড়া ফাঁক করিয়া হামাগুড়ি দিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল; সে ত আর পথে পড়িয়া থাকিতে পারে না। তাহার মনে অনধিকারপ্রবেশের ভয় হইল না। প্রেমের প্রাবল্যে মন হইতে সকল ভয়-ডর মুছিয়া যায়। মুগ্ধ সুরেশচন্দ্র সেই বিজন উদ্যানের এক নিভৃত প্রান্তে উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত গগনচন্দ্রাতপতলে প্রকৃতির স্বহস্তনির্ম্মিত সবুজ গালিচায় গা ঢালিয়া দিল।

এই শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা না হইলেও সে নানাবিধ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। প্রেমের প্রভাবে লোকে জাগিয়া স্বপ্ন দেখে। প্রেমই প্রকৃত যাদুকর। সে কল্পনার আবরণ দিয়া বাস্তবের অস্তিত্ব লোপ করে। সুরেশ চক্ষু নিমীলিত করিয়া তাহার প্রণয়িণীর দর্শন লাভ করিতেছিল। প্রেমিকগণ চোখ বুজাইয়াই ভাল দেখিতে পায়। চক্ষু খুলিলেই অন্ধকার!

সুরেশের মনে হইল, কিছু দূরে একটি স্ত্রীলোক স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সে ভূমি-শয্যা হইতে উঠিয়া আস্তে আস্তে গাছের আড়ালে আড়ালে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। নিকটে গিয়া দেখিল, তাহা একটি ছোট কলাগাছ। তাহার ভুল হইয়াছিল। কিন্তু এইখান হইতে সুরেশ দেখিল, অদূরে একটি ঝোপের মধ্যে কে যেন নড়িতেছে। সে পা টিপিয়া টিপিয়া আবার সেই দিকে চলিল।

এই ঝোপটি হচ্চে পারুলের সেই লতাকুঞ্জ। কাগজখানি

ঝুমনুকে ফিরাইয়া দিয়া অবধি দুঃখে, অভিমানে ও রাগে পারুলের হৃদয় অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই উত্তাপ জুড়াইবার জন্য পারুল সন্ধ্যার পর বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে তাহার লতাকুঞ্জে আসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিতেছিল। সে কোন কোন দিন এরূপ সন্ধ্যার পরেও বাগানে আসিত। রাত্রাধিক্য হওয়ায় সে বাড়ী যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুরেশ এই সময়ে তাহার কুঞ্জের নিকটে আসিয়া উপস্থিত।

অকস্মাৎ বৃক্ষান্তরালে পারুল তাহার অস্পষ্ট আবছায়া দেখিতে পাইল। সে তাহার পিসীমার নিকট অনেক ভূতের গল্প শুনিয়াছিল। যে আবছায়া প্রথমবার দেখিলে কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়, তাহা দ্বিতীয়বার দেখিবার সময় রক্তমাংসময় বাস্তবের আকার ধারণ করে। আবছায়ারূপী সুরেশ আরও নিকটে আসিয়া 'আমি এসেছি' এই কথা না বলিতে বলিতেই পারুল 'আঁ—আঁ—' করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। সুরেশ তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলায় সে ধরাশায়ী হইল না। মুহূর্ত্তমধ্যে পারুল সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিল, তাহার দেহ আগন্তুকের আলিঙ্গনের মধ্যে, এবং তাহার মস্তক তাহার হৃদয়ের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

আগন্তুক বলিল—"তুমি ভয় পেয়েছ? আমি যে সুরেশ?" পারুল সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। রজনীর ঘোরান্ধকারের মধ্যেও প্রেমিক দম্পতি তাহাদের প্রাণের আলোকে পরস্পরকে স্পষ্টরূপে চিনিতে পারিল। ভিতরের আলোক বাহিরের অন্ধকারকে ধ্বংস করিতে পারে।

যুবক যুবতীর প্রথম মিলনের সময় উভয়ে বালক বালিকার মত বাক্যালাপ করে—বলিবার কিছুই থাকে না, অথচ পরস্পর কথা কহিতে হইবে। সে-সকল কথার মাথা নাই, মুণ্ড নাই; সকল কথাই শেষে ভালবাসায় আসিয়া গড়াইয়া পড়ে।

সুরেশ বলিল,

"আমি তোমার দেখা পা'ব বলে এসেছিলুম। আমার আসা সার্থক হয়েছে।"

"তুমি তা'হলে আমাকে ভালবাস?"

"নিশ্চয়ই! আমি তোমার জন্য পাগল হয়েছি!"

এই কথা বলিয়া সুরেশ পারুলের মুখচুম্বন করিল। পারুল তাহার গলা জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"তাই জন্য তুমি আমাকে চিঠি দিয়েছিলে, নয়?"

"আমি তোমার জন্য একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলুম। তুমি তা ফিরিয়ে দিলে কেন?"

"আমি যে পড়তে জানিনি।"

এইরূপে সেই লতাকুঞ্জে উভয়ের প্রেমালাপের হাতে খড়ি হইল। নিভৃত লতাকুঞ্জই প্রণয়ী দম্পতির এই বিদ্যা শিখিবার উপযুক্ত স্কুল। দ্বাপরে বৃন্দাবনের কিশোর কিশোরী এই স্কুলে এই বিদ্যা শিক্ষা করিত। যতদিন জগতে এই স্কুল থাকিবে, ততদিন উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর অভাব হইবে না। প্রেমিক প্রেমিকা যখন গোপনে লতাকুঞ্জে মিলিত হয়, তখন তাহাদের প্রাণে যে প্রকাশ-আশঙ্কার বিজলি খেলিতে থাকে তাহা অতীব

অনির্ব্বচনীয়। লোকের পদশব্দ কল্পনা করিয়া একে অপরের গা টিপিয়া সতর্ক করে। কখনও বা তাহারা কুঞ্জের পত্রাবরণ ভেদ করিয়া ভয়চকিত নেত্রে দেখিতে থাকে, কেহ তাহাদের দিকে আসিতেছে কি না।

সুরেশ ও পারুল দুই দিন নিশাযোগে এই লতাকুঞ্জে মিলিত হইয়াছিল। মিলনানন্দের দীর্ঘকালও তাহাদের নিকট ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত্তমাত্র বলিয়া মনে হইত। সুরেশ পারুলের নাম জানিয়া লইয়াছিল। তাহার আর কিছু পরিচয় জানা আবশ্যক হয় নাই।

সুরেশ ও পারুল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহারা নিদ্রা গিয়া পরস্পরকে স্বপ্ন দেখিবে। তাহারা সে প্রতিজ্ঞা পালন করিত। সুরেশ ভাবিত, পারুলের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর তাহার সম্পূর্ণ দখল আছে—এ-সকল তাহারই সম্পত্তি, তাহারই ঐশ্বর্য্য। পারুলও মনে করিত, সুরেশের যাহাকিছু সমস্তই তাহার। উভয়ের উপর উভয়ের ষোল আনা অধিকার। এই অধিকার লইয়া একদিন তাহাদের তর্ক হইয়াছিল। সুরেশ পারুলকে বলিল—"তুমি আমার"। পারুল বলিল—"আমি তোমার, না তুমি আমার?" এ তর্কের শেষ মীমাংসা হইল না। প্রেমে উভয়ের আমিত্বকে লোপ করিয়া দিয়াছে; স্বত্ব-সাব্যস্ত হইবে কি করিয়া?

সুরেশ ও পারুল তাহাদের এই অনির্ব্বচনীয় প্রেম আপন আপন প্রাণের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে লুকাইয়া রাখিত। যাহারা প্রকৃত প্রেমিক, তাহারা তাহাদের পবিত্র প্রেমের কথা কিছুতেই

অপরের কাছে ব্যক্ত করে না। তাহাদের মুখশ্রীতে প্রফুল্লতা ও মৌনিভাব ক্রীড়া করিতে থাকে। এই অতিন্দ্রিয় অনাবিল প্রেমের স্রোত কানায় কানায় ভরিয়া উঠিলেও সংযমের বেলা-ভূমি অতিক্রম করে না। ইন্দ্রিয় চিরদিনই অতিন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিয়া থাকে।

[১২]

রসিক সরকার।

এই আখ্যায়িকার আবশ্যক বলিয়া আমাদিগকে এখন একবার পাঠককে লইয়া কাশীনাথ বাবুর বাগবাজারের বাটীতে যাইতে হইবে। ইদানীং সুলোচনার চরিত্র সম্বন্ধে কাশীবাবুর মনে কিছু সন্দেহের ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। সন্দেহ হচ্চে মানসিক রোগবিশেষ। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাত্র চর্ম্ম লোল হইয়া কুঞ্চিত আকার ধারণ করে, মনও কুঞ্চিত হইয়া আসে। সন্দেহ হচ্চে মনের কুঞ্চন; তাহা বয়সের স্বধর্ম্মে আসিয়া উপস্থিত হয়।

সুলোচনার উপরে কাশীবাবুর একটা অবিশ্বাস পূর্ব্ব হইতেই ছিল। চরিত্রহীন অবিশ্বাসী পুরুষ কস্মিনকালে স্ত্রীকে বিশ্বাস করে না,—স্ত্রী সাধ্বী হইলেও নহে। বিশেষতঃ সুলোচনাকে তিনি ত অবিশ্বাস করিতেই পারেন। সে ত কোনও দিনই তাঁহার প্রতি অনুরক্তা ছিল না।

সুলোচনার যে রূপ ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, এই রূপের সহিত তাহার ভরা যৌবন ও চাঞ্চল্য যোগ করিয়া লইতে হইবে। শিশুর হাতের ছুরির মত কোন কোন রূপসী নিজের রূপ লইয়া খেলা করে। এই অস্ত্রে সে অনেক সময় আপনাকেই আহত করিয়া বসে। সুলোচনা নিজের রূপ লইয়া খেলা করিতে ভালবাসিত। সোণা ঝী তাহার এই খেলার সাথী ছিল। এই জন্য সে সোণাকে বড় পিয়ার করিত।

সংসারের সমস্ত খরচপত্র সুলোচনার হাতে; কিন্তু সে পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোক। কাশীবাবু নিজে কিছুই দেখিতেন না; সুতরাং রসিক সরকারের মারফতে সুলোচনাকে সংসারের যাবতীয় কেনাবেচা করাইতে হইত। এই কারণে অন্দরে সর্ব্বদাই সরকার মহাশয়ের ডাক পড়িত।

বাড়ীর দাসদাসীগণ প্রায়ই সরকার মহাশয়ের অনুগত হইয়া থাকে। তাহাদের বেতন ও দৈনিক জলপানি যে তাহার হাতে। সোণা-ঝী কিন্তু সরকার মহাশয়ের টিকি ধরিয়া কথা কহিত; রসিক তাহার সকল আবদার সহ্য করিত। সকলে বলিত, ছুঁড়ীর কাঁচা বয়স, তাই তার উপর সরকার মহাশয়ের একটু নেক-নজর আছে। কোন কোন চাকরাণী ইহা অপেক্ষাও গুরুতর অভিযোগ আনিত। কাশীবাবুর 'ভাগলপুরে গাই' সোণাকে দুইদিন সরকার মহাশয়ের ঘর হইতে অধিক রাত্রে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়াছিল।

রসিক সরকারের বয়স তত অধিক ছিল না, চল্লিশের

এদিকে। রঙ্ খুব ফর্সা না হইলেও তাহার কন্দর্পের মত চোখ ও গোঁফের বাহার ছিল। শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখিলেই চেনা যায়। রসিকের বাপ মা তাহার যে নাম রাখিয়াছিল তাহা ঠিকই হইয়াছিল; তাহার ভিতরে যথেষ্ট রস ও প্রেম ছিল। একপ্রকার প্রেমিক আছে, যাহারা প্রেমের পাথারে ঝাঁপাইয়া পড়িলে একেবারে তলাইয়া যায়, আর উঠিতে পারে না। রসিক এ প্রকৃতির প্রেমিক ছিল না। তাহাকে প্রেমের পাথারে অনেকবার পাড়ি দিতে হইয়াছিল; সে প্রত্যেক বারই সাঁতরাইয়া কূলে উঠিতে সক্ষম হইয়াছিল।

পাঁচ বৎসর হইল রসিক কাশীবাবুর বাড়ীতে গোমস্তার কাজ করিতেছে। সে বর্দ্ধমান জেলার লোক বলিয়া বাবু তাহাকে 'বর্দ্ধমেনে' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এই কারণেই সে তাঁহার উপর হাড়ে চটা ছিল। আর, এই কারণেই বোধ করি তাহার উপর সুলোচনার কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছিল। যেখানে কর্ত্তা গিন্নীর মধ্যে চিরবিরোধ, সেখানে যে-কর্ম্মচারী কর্ত্তাকে বিষনয়নে দেখে, সে গিন্নীর সুনয়নে পড়ে। তৎ-সওয়ায় ইদানীং রসিকের রসব্যঞ্জক মুখশ্রীও সুলোচনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেজন্য কাশীবাবু যখন দমদমার বাগান-বাড়ীতে থাকিতেন, তখন অন্দরমহলে রসিকের ঘনঘন ডাক পড়িত এবং তথায় তাঁহাকে কর্ত্রীঠাকুরাণীর সঙ্গে দরকারী অদরকারী কথা লইয়া দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিতে হইত। মুখরা সুলোচনা সরকার মহাশয়ের কাছে মুখ খুলিলে আর তাহা সহজে বন্ধ

করিতে পারিত না। গিন্নীর সঙ্গে সরকার মহাশয়ের এতটা দহরম-মহরম সোণা একটু ঈর্ষার চক্ষে দেখিত।

একদিন রসিক একতাড়া নোট লইয়া সুলোচনার ঘরে আসিয়া তাহা হইতে কতকগুলি নোট তাহাকে দিতেছিল। সুলোচনা সমস্ত নোটগুলি চাহিল। রসিক বলিল,—"না ঠাকরুণ, সবগুলি দিতে পারব না, বাবু এই থেকে দু'শ টাকা তাঁর কাছে দমদমার বাগানে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন।" সুলোচনা তাহা শুনিল না; সে নোটগুলির জন্ম রসিকের সঙ্গে সহাস্যে হাত-কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিয়া দিল। এই সময়ে সোণা-ঝী সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া রসিক একটু অপ্রতিভ হইয়া নোটের তাড়াটি ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল।

এই ঘটনার পর হইতে রসিকের সঙ্গে সোণার একটা মানসিক সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সরকার মহাশয়ের ঘরের সমস্ত কাজ সোণা বরাবর নিজের হাতে করিয়া দিত, এবং সেই সময় উভয়ের মধ্যে রকমারি রসালাপ চলিত। আজকাল এই সকল কাজ করিবার সময় সোণা ঈর্ষাপূর্ণ বাক্যবাণে রসিককে বিদ্ধ করিত। সেজন্য সোণা ঘরে ঢুকিলেই রসিক কাজের অছিলা করিয়া বাহির হইয়া পড়িত। তাহাতে সোণা আরও রাগিয়া গিয়া ঘরের অনেক কাজ বাড়াইয়া যাইত। সরকার মহাশয় ফিরিয়া আসিয়া দেখিত, তাহার তামাকের ডাল গামলার ছাইয়ের মধ্যে পড়িয়া আছে, হুঁকার মুণ্ডপাত হইয়াছে, কলিকা ভাঙ্গিয়া গড়াগড়ি যাইতেছে, এবং ঘরের জঞ্জাল একহাঁটু হইয়া আছে।

[১৩]

অন্তর্জগতে ভূমিকম্প।

বাড়ীর দাসদাসীরা অনেকেই সুলোচনার বিবাহ, এবং তাহার বধূবেশে গৃহেপ্রবেশ দেখিয়াছিল। সেজন্য তাহারা তাহাকে 'বউ-ঠাকরুণ' বলিয়া সম্বোধন করিত। তাহাদের দেখাদেখি সোণাও তাহাকে বউ-ঠাকরুণ বলিত। অন্দরে সরকার মহাশয়ের অধিকার ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া সোণা বুঝিয়াছিল, বউ ঠাকুরুণ তাহার বাড়া ভাতে ছাইদিবার চেষ্টায় আছেন। সে এক চাল চালিবে স্থির করিল।

একদিন সোণা কাশীনাথ বাবুকে আড়ালে পাইয়া বলিল,

"বাবু! আপনি সরকার মহাশয়ের বাড়ীর ভিতর আনাগোনা বন্ধ করে দিন্। ও লোক ভাল নয়।"

"কেন রে সোণা, কি হয়েছে?"

"না বাবু, আমাকে মাপ করবেন; আমি কিছু বলতে পারব না।"

"কি হয়েছে বল্ না, তোর ভয় নেই।"

বলিবার জন্য সোণার মুখ চুলকাইতেছিল। সে এই জন্যই কথা পাড়িয়াছিল; কিন্তু তথাপি অনেক ইতঃস্ততঃ করিতে লাগিল। এটা তাহার চাল। কথা সরলভাবে বলিয়া ফেলিলে তাহার ক্ষুরধার নষ্ট হইয়া যায়, এবং যাহার বিরুদ্ধে তাহা প্রয়োগ করা হয় তাহার কোনও অনিষ্ট করে না।

অবশেষে কাশীবাবুর অনেক পিড়াপিড়ির পর সোণা বলিল,

"একদিন বউ-ঠাকুরুণের ঘরে আমি তাঁর সঙ্গে সরকার মশাইকে এক তাড়া নোট নিয়ে হাত-কাড়ামাড়ি কর্তে দেখেছিলাম। কিন্তু বউ-ঠাকুরুণের কোনও দোষ ছিল না। তিনি হলেন মেয়েমানুষ। টাকা দেখলেই মেয়েমানুষের লোভ হয়। সরকার মশাই পুরুষমানুষ। তার টাকাকড়ি নিয়ে বউ-ঠাকুরুণের ঘরে হট্ হট্ আনাগোনা করা ভাল দেখায় না। কিন্তু দোহাই বাবু, আমার নাম-টাম করবেন না; তা'হলে আমার অন্ন উঠ্‌বে।"

কাশীনাথ বাবু সেইদিন হইতে রসিক সরকারের অন্দর মহলে যাতায়াত নিষেধ করিয়া দিলেন। তিনি সুলোচনাকে বলিলেন—

"আমি বর্দ্ধমেনেকে অন্দরে আস্‌তে বারণ করে দিয়েছি। সে খরচের টাকা সোণার মারফতে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। তুমিও বাজার-খরচ তার কাছে বাহিরে পাঠিয়ে দিও।"

সুলোচনা গর্জ্জন করিয়া বলিল—"কী, তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর?"

কাশীবাবু বলিলেন,—"না, অবিশ্বাস করার কথা হচ্চে না। আমি শুনেছি, বর্দ্ধমেনে লোক ভাল নয়। একটা হোঁত্‌কা লাজ্‌খড় ব্যাটাছেলে অন্দরে আনাগোনা করলে একটা মিথ্যা দুর্নাম রট্‌তে পারে।"

"বাঃ! আমি হলুম্ মেয়েমানুষ। সরকারের হাত দিয়ে

আমাকে এই প্রকাণ্ড সংসারের সমস্ত কাজ কর্‌তে হয়। বাড়ীর ভিতর না আস্‌তে পারলে তার দ্বারা কাজ চল্‌বে কি করে?”

“তা যদি মনে কর, তা’হলে না হয় বর্দ্ধমেনেকে জবাব দিয়ে তার জায়গায় একজন তোফা বুড়োগোছের সরকার বাহাল করি।”

এই কথায় সুলোচনা ভয় পাইল। একজন কর্ম্মচারীর স্থান আর একজন কর্ম্মচারী আসিয়া পূরণ করিতে পারে। বদলীর দ্বারা অফিসের শূন্য চেয়ার পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু বদলীর দ্বারা হৃদয়ের শূন্য স্থান পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। সুলোচনা জানিত, রসিক তাহার হৃদয়ের একটু স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাহার ভয়, পাছে এই স্থানটুকু আবার শূন্য হয়। সে বলিল—“নূতন সরকারের দ্বারা কাজ চল্‌তে পারবে। কিন্তু কি অপরাধে একজন পুরাতন লোকের অন্ন মারা যাবে?”

“আমি ওর অন্ন মারতে চাই না; কেবল ও সব লজ্‌ঝড় লোকের অন্দরে আসা বন্দ কর্‌তে হবে।”

“আচ্ছা, তবে তাই হোক।”

সে দিন সুলোচনার অন্তর্জগতে ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছিল। কাশীবাবুও তাহার ‘শক্’ কিছুকিছু অনুভব করিয়াছিলেন। সুলোচনা তাহার মনোভাব সম্পূর্ণ গোপন করিতে পারে নাই। কোন কোন স্ত্রীলোক এ কাজে বড়ই অপটু। সোণা মনে করিল, সে এক ঢিলে দুই কাক মারিয়াছে, বউ-ঠাকুরুণ ও সরকার মশাই উভয়কেই জব্দ করা হইয়াছে।

বুনিয়াদী ঘরের বড়লোক স্বয়ং যাহাই হউন না কেন, পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষার দিকে একএক সময়ে তাঁহার বিশেষ জেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীনাথ বাবু তিনদিন দমদমা-মুখো হইলেন না। তিনি বাড়ীতে থাকিয়া তাঁহার নূতন বন্দোবস্ত কিরূপ প্রতিপালিত হয় তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সোণা অন্দরের হুকুম লইয়া সর্ব্বদা সরকার মহাশয়ের কাছে যাতায়াত করিতে লাগিল; এবং বিদ্রূপের বেত্র উল্টা করিয়া ধরিয়া তাহার পৃষ্ঠে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। সে তাহাকে বলিত—"বউ-ঠাকরুণের কাছে যাবে না গা সরকার মশাই?" সুলোচনার খন্‌-খন্ ঝন্‌-ঝনের বিরাম ছিল না। কাশীবাবু বুঝিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে বত্রিশ বন্ধন আল্‌গা হইয়া যাইবে, ঝী-চাকরদের পাহারায় কুলাইবে না। সুতরাং তিনি স্বয়ং গিয়া এঁড়েদহের বাগান-বাড়ী হইতে সেইদিনেই তাহার ভগ্নী ও কন্যাকে লইয়া আসিলেন।

[১৪]

অদর্শনে।

পারুলকে তাহার পিতার সঙ্গে বাগবাজারের বাটীতে চলিয়া যাইতে হইল। সে সুরেশকে কোনও খবর দিয়া যাইতে পারিল না। খবর দিবার উপায়ও ছিল না। তাহাদের পরিচয় এ

পর্য্যন্ত পরস্পরের নিকট বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। পারুল বলিয়াছিল, তাহার বাবা আছে, পিসীমা আছে। বাবার নাম যে কাশীবাবু তাহাও সে সুরেশকে বলে নাই—বলিবার আবশ্যকও হয় নাই। সুরেশের বাড়ী কোথায়, বা তাহার কে কে আছে তাহাও পারুল জানিত না। দুইদিনমাত্র রজনীতে তাহাদের উদ্যান-সম্মিলন হইয়াছিল। এই দুইদিন ইহারা কেবল প্রেমালাপই করিয়াছিল; কাজের আলাপ কিছুই করিতে পারে নাই। ছেলেমানুষ কি আর গাছে ফলে?

অবিমৃষ্যকারিতার পরিণাম অশান্তি ও দুঃখ। সুরেশের এখন তাহাই সার হইল। সে সন্ধ্যার পর যথাসময়ে সেই উদ্যানমধ্যস্থ লতাকুঞ্জে উপস্থিত হইল। দেখিল পারুল তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই। সে মনে করিল, আজ সকাল সকাল আসিয়াছে। সুরেশ বেঞ্চে বসিয়া পারুলের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এক কোয়াটার, আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল, পারুল আসিতেছে না। সুরেশ উৎকণ্ঠিত হইল। একএকটি মিনিট একএকটি ঘণ্টা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইভাবে আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। ক্রমে রাত্র্যাধিক্য হইতে লাগিল। চাঁদ ডুবিল। সুরেশের সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে পারুলের পদশব্দের প্রত্যাশায় কাণ পাতিয়াছিল। তাহার কাণে একমাত্র অবিশ্রান্ত ঝিল্লিরব প্রবেশ করিতে লাগিল।

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল; এদিকে ওদিকে দূরে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিল। বৃক্ষশাখাগণের নানারূপ অঙ্গভঙ্গী ব্যতিরেকে

আর কিছুই তাহার লক্ষ্য হইল না। সুরেশ লতাকুঞ্জ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিতে পাইল, দূরে মালিদের ঘরে দীপ জ্বলিতেছে। সে সেইদিকে কিছুদূর পদশব্দ না করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার পায়ের নিকট দিয়া সাপের মত কি একটা সড়্‌সড়্‌ করিয়া চলিয়া গেল। অন্য সময় হইলে সুরেশ লাফাইয়া উঠিত। সে থমকিয়া দাঁড়াইল মাত্র, বিশেষ বিচলিত হইল না। ভয় ও চাঞ্চল্য অবস্থার অপেক্ষা করে।

সুরেশ ভাবিল, পারুলের হয়ত অসুখ করিয়া থাকিবে, সেই কারণে সম্ভবতঃ সে আজ আসিতে পারে নাই। সুরেশ তাহাদের বাটীর দিকে চাহিয়া দেখিল; কোনও জানালায় আলো দেখিতে পাইল না। সে একটু আশ্চর্য্য হইল। এরূপ ত কখনও হয় নাই। সুরেশ আস্তে আস্তে বাড়ীর নিকটে গেল; সেখানে কোনও মানুষ আছে, এরূপ তাহার বোধ হইল না। সদর দরজার নিকটে গিয়া দেখিল, তাহাতে বাহিরের দিক হইতে তালা বন্ধ। তবে কি পারুলরা এ বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছে? কই, সে ত অন্যত্র যাইবার কথা তাহাকে বলে নাই। পারুল না বলিয়া চলিয়া যাইবে কেন? সে ত নিষ্ঠুর নয়; তাহার ভালবাসায় ত প্রতারণা নাই। সুরেশের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে কি করিবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। সেই শূন্য প্রাসাদের সম্মুখে সেই নিশীথ সময়ে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকাও নিরাপদ নহে। সেখানে আত্মগোপন করিবার উপযোগী বৃক্ষান্তরাল

নাই। আছে এক শিবমন্দির। সুরেশ দেখিল তাহারও দরজায় তালা বন্ধ; ভিতরে মিট্ মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। সম্ভবতঃ বামুণ ঠাকুর সন্ধ্যা দিয়া ঠাকুরের আরতি করিয়া মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

সেই রাত্রে মালীদের কুটীরের দিকে যাইতে সুরেশের সাহস হইল না। সে উদ্যান হইতে সন্তর্পণে বাহির হইয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে ষ্টেশনের দিকে চলিল। প্রায় এক ঘণ্টা পথ হাঁটিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। সেখানে আসিয়া ঘড়ীতে দেখিল ১টা বাজিয়া গিয়াছে। কলিকাতায় আসিবার আর ট্রেণ নাই। আর ট্রেণ থাকিলেও, পারুলরা কোথায় গিয়াছে তাহা না জানিয়া তাহার পক্ষে কলিকাতায় ফেরা অসম্ভব। সে ষ্টেশনে আসিয়াছিল রাতটুকু কাটাইয়া দিবার জন্য। সুরেশ লম্বা প্ল্যাট্‌ফরমে পাইচারি করিয়া এবং বেঞ্চে বসিয়া নিশা অতিবাহিত করিতে লাগিল। তাহাতে শয়ন করিয়াও দুশ্চিন্তায় তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। শেষরাত্রে একবার তাহার একটু তন্দ্রার মত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে সে পারুলকে স্বপ্ন দেখিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। তখন প্রভাত হইয়া আসিয়াছিল। অনশন ও অনিদ্রাক্লিষ্ট সুরেশ শিশিরসিক্তা প্রকৃতির সেই অপূর্ব্ব জাগরণ-সৌন্দর্য্য বিন্দুমাত্র অনুভব করিতে পারিল না; ট্রেনের ঘস্-ঘস্ ও লোকের বক্‌বকের মধ্যে তাহা নষ্ট হইয়া গেল।

[১৫]

বিফল চেষ্টা।

সুরেশ ষ্টেশন হইতে নন্দলালদের বাড়ীতে না গিয়া একেবারে পারুলদের বাগানের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বেলা অনুমান ৭টা। বাগানের একজন মালী বাহিরে আসিতেছিল। সুরেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে মালী, এ বাগান কা'দের ?"

"কাশীবাবুর।"

"কাশীবাবুর বাড়ী কোথায় ?"

"কলিকাতায়।"

"কল্‌কাতায় কোন্ জায়গায় ?"

"বাগবাজারে। আপনি বাগবাজারের কাশীবাবুর নাম শুনি না ? বাবু যে খুব বড় লোক, বড় জমীদার। বাবু যে কাল এইখানে আসিথিল। আসিকি দিদিমণি আর পিসীমাকে নেই গেইথিল।"

"তোর বাবুর কত নম্বরের বাড়ী, কোন গলিতে ?"

"সে মু কহি পারিবু নি। আপনকি কি দরকার ?"

কি দরকার তাহা সুরেশ বলিতে পারিল না। তাহার গুপ্তপ্রেমের হাতে খড়ি হইয়াছে বটে; কিন্তু সে এখনও সেজন্য মিথ্যা কথা বলিতে শেখে নাই। মালী তাহার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিল। সুরেশ তাহাও বলিল না। মালী একটু

বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। সুরেশ ঠিক করিয়া লইল কাশী বাবুই পারুলের পিতা, পারুল তাঁহার সঙ্গে কলিকাতার বাটীতে গিয়াছে। সে ষ্টিমারে কলিকাতা রওয়ানা হইল।

তদবধি সুরেশের প্রত্যহ ছু'একবার বাগবাজার প্রদক্ষিণ করা আরম্ভ হইল। অল্প দিনের মধ্যে এখানকার সমস্ত গলিঘুঁজি ও বড় বড় বাড়ীগুলি তাহার নিকট পরিচিত হইয়া দাঁড়াইল। এই সকল বাড়ীর উপরের জানালার দিকেই তাহার দৃষ্টি থাকিত, যদি কোথাও পারুলের ফুটন্ত মুখপদ্ম পরিলক্ষিত হয়। প্রাণে সঙ্কোচ থাকায় এবং কাশীবাবুর সম্পূর্ণ নাম জানা না থাকায় সুরেশ কাহাকেও তাঁহার বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হয় নাই। এইরূপে সে প্রত্যহ ক্লান্ত দেহে প্রাণভরা নৈরাশ্য লইয়া বাসায় ফিরিত।

[১৬]

বিরহের প্রশস্ত পিঞ্জর।

পূর্ব্বে সুরেশের প্রাণে আনন্দ ছিল, আশা ছিল, উৎসাহ ছিল। তখন কল্পনা তাহার হৃদয়-গগণে রামধনুর উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিত। পারুলের মিলন হইতে তাহার দৃষ্টির সম্মুখে বিশ্ব-সংসার একখানি প্রকাণ্ড হীরকখণ্ডের ন্যায় সর্ব্বদাই ঝক্‌মক্ করিত। পারুলকে হারাইয়া এখন আর সুরেশের সে দিন নাই। এখন নৈরাশ্যের সঙ্গে অবসাদ আসিয়া তাহার

অন্তর তমোময় করিয়া তুলিয়াছে। তাহার আর কিছুই ভাল লাগে না; কাজকর্ম্ম ভাল লাগে না, লোকারণ্য ভাল লাগে না, নির্জ্জনতাও ভাল লাগে না। স্বভাবের শোভা এখন আর তাহার প্রাণে আনন্দ দান করে না। আগে তাহার সকল চিন্তার মধ্যে সুখ ছিল। এখন চিন্তা আছে, কিন্তু তাহাতে সুখ নাই। সুরেশ বিরহের প্রশস্ত পিঞ্জরের মধ্যে মনঃকষ্টে কালক্ষেপ করিতে লাগিল।

পারুলের অদর্শনে সুরেশের অন্তরাকাশ দিন দিন অন্ধকারময় হইয়া উঠিতেছিল। এই আকাশে তাহার প্রণয়িণীর স্মৃতিই এখন একমাত্র উজ্জ্বল নক্ষত্র। আকাশের আঁধার যতই বাড়ীতে লাগিল, এই নক্ষত্রও তত উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল।

কোন কোন কবি প্রেমকে এক প্রকার রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহাকে এই রোগে ধরে, তাহার মন হইতে কর্ত্তব্যজ্ঞান ও আবশ্যকীয় কাজের চিন্তা অল্পবিস্তর অপসারিত হয়। এই রোগগ্রস্ত সুরেশ বহুদিন হইতে কামারহাটির শ্রমজীবীসমিতি ও নৈশবিদ্যালয়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে কামারহাটিতে এখনও মধ্যেমধ্যে যাইত; যেহেতু ইহার পথেই পারুলদের এঁড়েদহের বাগান। আশা এই, যদি পারুলরা আবার বাগান-বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। পুনঃ পুনঃ আশাভঙ্গে সুরেশের এঁড়েদহে যাওয়াও ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিল।

কোনও রোগই সমভাবে দীর্ঘকাল থাকেনা—হয় আরোগ্য, না হয় বৃদ্ধি হইবেই হইবে। প্রেম একটি রোগ হইলে,

বিরহ হচ্ছে তাহার সান্নিপাতিক ক্ষেত্র। আজ তিন মাস পারুলের বিরহে সুরেশের মধ্যে এই সান্নিপাতিকের বিকার একটু আধটু দেখা দিয়াছিল। আজ প্রায় এক মাস হইল কলিকাতার স্কুলকলেজগুলি গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ হইয়াছে। তথাপি সুরেশ এই মাসাবধিকালের মধ্যে আর এঁড়েদহে যায় নাই। সে নন্দলালদেরও একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছিল। সখ্য অপেক্ষা মধুর ভাবের প্রভাব অধিক। নন্দলাল সুরেশকে তিন চারিখানি পত্র লিখিলে তাহার একখানির জবাব আসে। শেষবারের পত্রে সুরেশ সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের একটু ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল।

[১৭]

গরজ বড় বালাই।

হেমাঙ্গিনী বহুদিন হইতে সুরেশের মধ্যে এই মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিল। সে ঝুমনের মুখে তাহার দিদি-মণিদের বাগানের কথা অনেকবার শুনিয়াছিল। দিদিমণি তাহাকে খুব ভালবাসে, গাছের ফলপাকড় দেয়, তাহার পিসীমার জন্য বিল্বপত্র পাড়িয়া দিলে পয়সা পায়, এবং তাহার দিদিমণি দেখিতে খুব সুন্দর—এই সকল কথা ঝুমন গল্প করিয়াছিল। সে একদিন হেমাঙ্গিনীকে কথায় কথায় বলিয়া ফেলিয়াছিল যে, সুরেশবাবু তাহাকে দিদিমণিদের বাগানে যাইতে

নিষেধ করিয়াছিল, শেষে একদিন দিদিমণিদের মালী আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। ঝুমন অবশ্য সুরেশবাবুর সেই চিঠির কথা হেমাঙ্গিনীকে বলে নাই।

একদিন হেমাঙ্গিনী ঝুমনের নিকট শুনিল তাহার দিদিমণিরা এঁড়েদহের বাগান হইতে অনেক দিন হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছে। খবরটি হেমাঙ্গিনীর কাণে বাজিল। ঝুমনের দিদিমণির এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সুরেশের এঁড়েদহে আসা যাওয়া বন্ধ হইবার কোনও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা হেমাঙ্গিনী চিন্তা করিতে লাগিল। চিন্তা করিয়া স্থির করিল যে না থাকাই সম্ভব।

এই সময় একদিন পারুলদের বাগানের মালী আসিয়া বাহির হইতে ঝুমনকে চীৎকার করিয়া ডাকিল। ঝুমন্ বাহির হইয়া গেল, এবং পরক্ষণেই একখানি চিঠি হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিল। হেমাঙ্গিনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ও চিঠি কার?" ঝুমন্ বলিল, "এ চিঠি সুরেশবাবুকে দিতে হবে। দিদিমণিদের বাগানের ছোটমালী এসে দিয়ে গেল।" হেমাঙ্গিনী বলিল, "তোর কাছে থাকলে হারিয়ে যাবে; চিঠি আমার কাছে থাক, সুরেশ এলে তাকে দিব।" এই বলিয়া হেমাঙ্গিনী ঝুমনের হাত হইতে চিঠিখানি লইল।

ঝুমন চলিয়া গেলে হেমাঙ্গিনী তাহা খুলিয়া দেখিল। চিঠিখানি একখানি ভাঁজ করা কাগজ মাত্র, লেফাফার মধ্যে ছিল না। তাহাতে হাস্যোদ্দীপক বড় বড় দেবাক্ষরে এই কয়েকটি কথা লেখা ছিল—

আমাদের বাগবাজারের খিড়কির বাগানে রাত দশটার পরে অতি অবিশ্যি অবিশ্যি আসিবে।

তোমারই
পারুল

চিঠিখানির মাথায় বামপার্শ্বে বাবু কাশীনাথ বসুর নাম এবং দক্ষিণপার্শ্বে তাঁহার বাড়ীর ঠিকানা নীল কালিতে ছাপা ছিল; তাহার মাঝখানে উজ্জ্বল লাল কালিতে ইংরাজী মনোগ্রাম। চিঠিখানি পড়িয়া হেমাঙ্গিনী মনে মনে হাসিতে লাগিল।

এইখানে একটু পূর্ব্বকথা বলা আবশ্যক। পিতার সহিত কলিকাতার বাড়ীতে আসিয়া পারুল সুরেশকে সংবাদ দিবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছিল। এঁড়েদহের বাগান হইতে মালীরা তরিতরকারীর বাজরা লইয়া প্রতিসপ্তাহেই আসিত। পারুল তাহাদিগকে ঝুমনের কথা জিজ্ঞাসা করিত। তাহারা তাহাকে দেখে নাই, এই কথাই বলিত। সুতরাং পারুল বুঝিল যে, মালীদের দ্বারা সুরেশকে সরাসরি বাচনিক সংবাদ দেওয়া অসম্ভব।

অনন্যোপায় হইয়া পারুল অবশেষে সোণা-ঝীকে দিয়া বইয়ের দোকান হইতে বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ ও শিশুবোধ খরিদ করিয়া আনাইয়া সুলোচনার নিকট হইতে একটু আধটু সাহায্য লইয়া নিজের বিশেষ চেষ্টায় দুইমাসের মধ্যে ঐ তিনখানি বই পড়িয়া ফেলিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ক ক্ক লিখিতে শিখিয়াছিল। গরজ বড় বালাই। বহু আয়াসে এইবিদ্যা আদায় হইলে পারুল ফাঁস কাগজে অনেকবার মক্স করিয়া

শেষে তাহার বাপের মনোগ্রাম ও নামধামযুক্ত চিঠির কাগজে উল্লিখিত বিচিত্রপত্র লিখিয়া ফেলিল এবং তাহা ভাঁজ করিয়া মুড়িয়া রাখিল। পরে এঁড়েদহ হইতে ছোটমালী আসিলে পারুল তাহার হাতে পত্রখানি দিয়া বলিল—"তুই এই চিঠিখানি নিয়ে গিয়ে চুপে চুপে ঝুমনকে দিবি; আর তাকে বল্‌বি যেন সুরেশবাবুকে এখানি দেয়।"

এই মালী ঝুমনদের বাড়ী চিনিত। সে তাড়াতাড়ি কাজ চুকাইয়া ফেলিতে ভালবাসিত। সেকারণে সে এঁড়েদহে আসিয়াই একেবারে ঝুমনদের বাড়ী গিয়া তাহার হাতে চিঠি দিল এবং সুরেশবাবুকে যে তাহা দিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিল। তবে মালী চুপে চুপে এ কাজ না করিয়া কিছু হাঁক-ডাকের সহিত চিঠিখানি ডেলিভারি করিয়াছিল। তাহার ফলে ইহা হেমাঙ্গিনীর হস্তগত হইল। কিন্তু হেমাঙ্গিনী বড় চাপা মেয়ে; সে আপাততঃ এই চিঠির কথা কাহাকেও কিছু বলিল না।

[১৮]

ঝুমনের বেয়াদবী।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে হেমাঙ্গিনীদের পাড়ার কয়েকজন স্ত্রীলোক বাগবাজারের মদনমোহন দর্শন করিতে আসিয়াছিল। হেমাঙ্গিনীও তাহাদের মধ্যে ছিল। মদনমোহন দর্শন উপলক্ষে

সুরেশচন্দ্রের মনোমোহিনীকে দর্শন করাই তাহার উদ্দেশ্য। এই কারণে সে ঝুমন্‌কে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল; ঝুমন্ পারুলের নিকট বিশেষ পরিচিত।

মদনমোহন দর্শনাদির পর হেমাঙ্গিনী তাহার সঙ্গিনীদিগের নিকট অল্পকালের বিদায় লইয়া ঝুমন্ সমভিব্যবহারে বাগবাজারের মধ্যে বাবু কাশীনাথ বসুর বাটী অনায়াসে খুঁজিয়া বাহির করিল। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সে ঝুমন্‌কে বলিল, "তোর দিদিমণি যদি সেই চিঠির কথা জিজ্ঞাসা করে, তা'হলে বলিস্ যে সুরেশবাবু আস্‌লেই তাকে দেওয়া হ'বে। চিঠি যে আমার কাছে আছে, তা যেন বলে ফেলিস্ নি।"

হেমাঙ্গিনী ও ঝুমন বহির্বাটী পার হইয়া অন্দরমহলে প্রবেশ করিল। সোণা-ঝী হেমাঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কারা গা? কোথা থেকে আস্‌ছ?" হেমাঙ্গিনী বলিল, "আমাদের বাড়ী এঁড়েদহে গো; আমরা পারুলের সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছি।"

পারুল উপরের বারাণ্ডা হইতে ঝুমন্‌কে দেখিতে পাইয়া দ্রুত নামিয়া আসিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। ঝুমন্ বলিল—"দিদিমণি! এ হচ্চে নন্দবাবুর বোন্, আমার দিদি। সুরেশবাবু এদেরই বাড়ীতে আসেন।" হেমাঙ্গিনীর সম্মুখে বেয়াদব ঝুমন এইভাবে সুরেশবাবুর নাম করায় পারুলের গণ্ডদেশ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনী এইরূপ ভাব প্রকাশ করিল যেন সুরেশের নাম তাহার কাণে যায় নাই। সে ঝুমনের কথা চাপা দিয়া পারুলকে বলিল—"তুমি ঝুমনের

দিদিমণি হও, আমি হ'চ্চি তার দিদি। সুতরাং আমি তোমারও দিদি হই।"

এই সম্বন্ধে পারুল ভারি খুসী হইল। সে নূতন দিদিকে তাঁহার পিসীমার ঘরে লইয়া গেল। কৃপাময়ী হেমাঙ্গিনীদের জলযোগ করাইলেন এবং বলিলেন—"আমরা যখন এঁড়েদহে থাকব, তখন বাছা তুমি মধ্যেমধ্যে আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে এস। ঝুমন্ আমাদের বাগানবাড়ী চেনে; তুমি তার সঙ্গে এস।"

তারপর পারুল হেমাঙ্গিনীকে তাহার বিমাতা সুলোচনার মহলে লইয়া গেল। হেমাঙ্গিনী খুব মিলুকমিসুক বলিয়া সুলোচনার সঙ্গেও তাহার অনেকক্ষণ ধরিয়া বাক্যালাপ চলিতে লাগিল। হেমাঙ্গিনীরা পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরে থাকিত শুনিয়া সুলোচনা বলিল—"কৃষ্ণনগরে আমার বোন্ আছে। সেখানকার সরকারী উকিল রাধাবল্লভ বাবু আমার ভগ্নীপতি হন।" রাধাবল্লভের নাম শুনিয়া হেমাঙ্গিনী একটু চমকাইয়া উঠিল; সুলোচনা তাহা বুঝিতে পারিল না।

ঝুমন্ ইত্যবসরে সমস্ত বাড়ী পরিদর্শন করিয়া অবশেষে খিড়কির বাগানে গিয়া একটা পিয়ারা গাছে উঠিয়া তাহার শাখামৃগ-স্বভারের পরিচয় দিতেছিল। পারুল সেখানে গিয়া তাহাকে নিভৃতে সেই চিঠির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। সেও হেমাঙ্গিনীর আদেশানুযায়ী উত্তর দিয়াছিল।

পারুলদের বাড়ী হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে হেমাঙ্গিনী এই কয়টি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিল;—পারুলের পিতা বড়লোক, পারুল তাঁহার একমাত্র কন্যা, পরমা সুন্দরী; অল্প বয়সে তাহার

বিবাহ হইয়াছিল এবং বিবাহের এক বৎসরের মধ্যেই সে বিধবা হয়; পারুলের মাতা জীবিতা নাই; তাহার বিমাতা বড় মুখরা স্ত্রীলোক, এবং পারুলকে সে সুনয়নে দেখে না।

[১৯]

সুরেশের অঙ্গীকার।

অতঃপর পঞ্চানন বাবু কামারহাটিতে আসিলে হেমাঙ্গিনী তাঁহাকে পারুলের সেই অদ্ভুত পত্রখানি দেখাইল; এবং সুরেশ যে আসা বন্ধ করিয়াছে তাহাও বলিল। পারুলকে দেখিতে গিয়া হেমাঙ্গিনী তাহার সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিয়া আসিয়াছে তাহাও সে তাহার মামার কাছে বলিল। পঞ্চানন সমস্ত শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন মাত্র; তিনি হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে এসম্বন্ধে অধিক কথা কহিলেন না।

পঞ্চানন বাবু সুরেশকে অকৃত্রিম স্নেহ করিতেন। এই কোমলহৃদয় চিন্তাশীল সুন্দর অবিবাহিত যুবকের প্রাণে যে রমণীর প্রেম সহজেই প্রবেশ করিতে পারিবে, তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। পাঁচুবাবু বিবাহের পূর্ব্বে বরকনের মধ্যে পূর্ব্বরাগসঞ্চারের বিরোধী ছিলেন না। তিনি বলিতেন— "হিন্দুসমাজে প্রেমসঞ্চারের পূর্ব্বে উদ্বাহের ব্যবস্থা থাকায় দাম্পত্যজীবনের Romance নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাই প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে, আমাদের উপন্যাস-লেখকদিগকে

হয় বিধবা কুন্দনন্দিনী, না হয় বিজাতীয়া আয়েষাকে টানিয়া আনিয়া বিষ খাওয়াইতে হয়। অতএব অন্যান্য কারণ ছাড়িয়া দিয়াও, কেবল বঙ্গসাহিত্যের এই খর্ব্বতা দূর করিবার জন্য আমাদের সমাজে love marriage ও late marriage প্রচলিত হওয়া আবশ্যক।"

পঞ্চানন কলিকাতায় আসিয়াই একদিন সুরেশের মেসে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেদিন তিনি প্রথমে সাংসারিক কথার অবতারনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সুরেশ! তুমি গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী যাও নাই কেন? তোমার মা কেমন আছেন?"

"মা ভাল আছেন, সংবাদ পাইয়াছি। বাড়ী যাইবার বিশেষ ইচ্ছা হয় নাই বলিয়া এবার ছুটিতে বাড়ী যাই নাই।"

"তোমার বিবাহ করা আবশ্যক হইয়াছে। আজ তোমার স্ত্রী থাকিলে তোমাকে বাড়ীতে ছুটিতে হইত।"

সুরেশ হাসিয়া বলিল—"আমি বিবাহ করিব না। আমার একটি সম্বন্ধ স্থির করা হইতেছে বলিয়া বাড়ী থেকে পত্র আসিয়াছিল। উত্তরে লিখিয়া পাঠাইয়াছি আমি বিবাহ করিতে রাজী নই।"

"কেন? তুমি কি জীবনে কখনও বিবাহ করিবে না স্থির করিয়াছ?"

"বিবাহ না করিলে ক্ষতি কি? পাঁচুমামা, আপনি ত বিবাহ করেন নাই।"

"ছাখ সুরেশ, আমার হৃদয়ে কখনও নারীর প্রেম প্রবেশ

করে নাই। আমি যদি কখন কোনও রমণীর প্রেমে আবদ্ধ হইতাম, তা'হলে তাহাকে অবশ্য বিবাহ করিতাম। তুমি যদি আমার মত নারীপ্রেমবর্জ্জিত হইয়া থাকিতে পার, তা'হলে আমি তোমাকে বিবাহ করিতে বলিব না।"

সুরেশ চুপ করিয়া রহিল। পঞ্চানন পুনরায় বলিলেন, "যে ব্যক্তি শ্রমবিমুখ হইয়া নিভৃতে আত্মচিন্তা লইয়া থাকিতে ভালবাসে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া যে আত্মহারা হয়, যাহার হৃদয় স্বভাবতঃ বিশ্বের সকল প্রাণীকে আলিঙ্গন করিতে চাহে, রমণীর প্রেম তাহারই প্রাণে সহজে প্রবেশ করে। সুরেশ! আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি, তোমার ভিতর এই লক্ষণগুলি পূর্ণমাত্রায় আছে। তোমাকে রমণীপ্রেমের বন্ধনে পড়িতে হইবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু যদি কোনও দিন তোমাকে এই প্রেমে বাঁধা পড়িতে হয়, তা'হলে তোমায় সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও সে রমণীকে বিবাহ করিতে হইবে।"

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল—"বিশুদ্ধ প্রেমের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ কি?" পাঁচুমামা বলিলেন—"বিবাহ হ'চ্চে দাম্পত্য-সম্বন্ধের সামাজিক অনুমোদন। এই সামাজিক অনুমোদন ব্যতিরেকে পবিত্র প্রেমের সম্বন্ধও পাপসম্বন্ধে পরিণত হয়।"

তিনি আরও দেখাইলেন যে, অবিবাহিত প্রেমিক দম্পতিকে তাহাদের প্রেমসম্বন্ধ গোপন করিয়া রাখিতে হয়। ইহাকে গুপ্ত পরকীয়া প্রেম বলে। ইহার উন্মাদনা অত্যন্ত অধিক। ইহার চিন্তা ক্রমে তন্ময়ত্বে পরিণত হইয়া মানুষকে একপ্রকার

ক্ষিপ্ত ও সকল কর্ম্মের অনুপযোগী করিয়া তোলে। কর্ম্মচিন্তার সময়ে মস্তিষ্কের পরিচালনা হয়। চিন্তামাত্রেই বুদ্ধির সঙ্গে ক্রীড়া করে, একে অপরের ক্ষতি করে না। কিন্তু এই চিন্তা যখন গভীর হইতে গভীরতম হইয়া তন্ময়ত্বে দাঁড়ায়, তখন মস্তিষ্কের অবসাদ আসে, বুদ্ধিবৃত্তি লোপ পায় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল বন্দী হয়। ভাব ও ভাবনার মধ্যে পার্থক্য এই। ভাবনা হচ্চে জ্ঞানের অনুশীলন; ভাবের মাদকতায় এই জ্ঞান সংজ্ঞাহীন হয়। সুরেশ এই সকল কথা স্থিরভাবে শুনিতেছিল। পাঁচুবাবু বলিলেন—

"গুপ্ত পরকীয়া প্রেমের মাদকতায় সংজ্ঞাহীন হইয়া কোন কোন লোক আত্মহত্যা করে। ভিক্টর্ হিউগো বলেছেন, 'By continually going out for reverie, there comes a day when you go out to throw yourself into the water !'* চৈতন্যদেব তাহার কাল্পনিক পরকীয়া প্রেমের ভাবে আত্মহারা হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে তনুত্যাগ করেছিলেন। আমি ইহাকে আত্মহত্যা ভিন্ন আর কিছুই বলি না। এই সকল কারণে আমি মনে করি, বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রেমিক দম্পতির কর্ম্মে অধিকার হয় না। উদ্বাহরূপ সামাজিক অনুমোদনের দ্বারা তাহারা তাহাদের পরকীয়া প্রেমকে স্বকীয়া ও সংযত করিয়া কর্ম্মের পথে পদার্পণ করে।"

সুরেশের ভিতর বৃথাতর্কলিপ্সা ছিল না। সে পাঁচুমামার

* নিয়ত ভাবে বিভোর হইয়া বেড়াইলে একদিন তোমাকে জলে ঝাঁপ দিতে হইবে।

নিকট পরাজয় স্বীকার করিল, এবং আবশ্যক হইলে বিবাহ করিবে এইরূপ অঙ্গীকার করিল। সুরেশ কিন্তু মনে মনে বলিল—"আমি পারুল ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিব না।" কিন্তু পারুল কোথায়? কি উপায়ে তাহাকে পত্নীরূপে পাইবে তাহা সুরেশ ভাবিল না। পঞ্চানন বাবু তাহাকে একবার এঁড়েদহে নন্দলালদের বাড়ীতে যাইতে অনুরোধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

[২০]

সন্ন্যাস অনাবশ্যক।

বিবাহ করিতে অঙ্গীকার করিয়া সুরেশ মনে করিয়াছিল, তাহার জীবনের সমস্যা কতকটা মীমাংসা হইয়াছে। সে একদিন স্বপ্ন দেখিল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পারুলের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতেছে, এবং আচার্য্যের আজ্ঞানুসারে সুরেশ 'সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে' মন্ত্রপাঠ করিতেছে। যাহা হউক, এই স্বপ্নদর্শনের পর হইতে তাহার কিয়ৎ পরিমাণে চিত্তস্থির হইয়াছিল। তাই আজ রবিবার সুরেশ কামার-হাটিতে নন্দলালদের বাটীতে আসিতে পারিয়াছে।

এঁড়েদহের ভিতর দিয়া আসিবার সময় সুরেশ পারুলদের বাগানের মালীদের সঙ্গে দু'একটা কথা কহিয়া আসিবে মনে করিয়াছিল। কিন্তু বাগানের কাছে আসিয়া দেখিল, মালীদের

ঘরেও তালা বন্ধ। সুরেশ বুঝিল, পারুলের সকল সংবাদ—এমন কি তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু আছে, তাহার সকলগুলিতেই ক্রমে ক্রমে তালা পড়িতেছে। সুরেশ হতাশহৃদয়ে নন্দলালদের বাটী আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেদিন জুট-মিল্ বন্ধ থাকিলেও নন্দলাল বা ঝুমন্ কেহই বাড়ী ছিল না। নন্দলালের মাতাও নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশীদের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। একমাত্র হেমাঙ্গিনী সুরেশকে কুশলপ্রশ্ন করিয়া বসিবার জন্য দাওয়ায় মাদুর বিছাইয়া দিল। সুরেশ এতদিন আসে নাই কেন, হেমাঙ্গিনী তাহাকে সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল না; সুরেশও বাঁচিয়া গেল। তাহার সহিত নানাবিধ কথোপকথন করিতে করিতে হেমাঙ্গিনী বলিল—

"সুরেশ! তোমার গতবারের পত্রে লিখিয়াছিলে, তুমি সন্ন্যাসী হইবার মনস্থ করিয়াছ। তোমার নামে একখানি চিঠি আমাদের বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়া আছে। তুমি না আসায় এতদিন তোমাকে তাহা দিতে পারি নাই। এই চিঠি পড়িলে বোধ করি তোমার আর গেরুয়া পরিয়া সন্ন্যাসী হইবার আবশ্যক হইবে না।"

এই বলিয়া হেমাঙ্গিনী ঘরের ভিতর হইতে পারুলের সেই চিঠিখানি আনিতে গেল। সুরেশ উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"চিঠি কে লিখেছে?" হেমাঙ্গিনী পারুলের সেই খোলা চিঠিখানি আনিয়া সুরেশকে দিল। সুরেশ তাহা পাঠ করিয়া লজ্জিত হইল। হেমাঙ্গিনী বলিল,

"এ চিঠি যে লিখেছে আমি তাহাকে বাগবাজারে গিয়া

দেখিয়া আসিয়াছি। সে বড় লক্ষ্মী মেয়ে, রূপে গুণে তোমার স্ত্রী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তুমি চেষ্টা করিলে তাহাকে বিবাহও করিতে পারিবে, সে বিধবা। বিধবাবিবাহের কথা ত আজকাল অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। আমি তাদের বাড়ী গিয়ে তার দিদি হয়ে এসেছি। সুতরাং বিবাহের সময় তাহাকে বরণ করিয়া লইবার ভার আমার উপর রহিল।”

সুরেশ লজ্জিত হইয়া বলিল—“ছি দিদি! তুমি পাগলের মত কি বলছ?” এই বলিয়া সুরেশ চিঠিখানি পকেটের মধ্যে রাখিয়া জোর করিয়া অন্য কথা পাড়িল। পাছে সুরেশ অধিক লজ্জিত হয়, এই ভয়ে হেমাঙ্গিনীও পারুলের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিল।

[২১]

ভোগে লালসার বৃদ্ধি।

বর্ত্তমানই ভবিষ্যৎকে ভ্রূণরূপে গর্ভে ধারণ করে। কাল যাহা ঘটিবে, অদৃষ্টে আজ তাহার সূচনা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কুম্ভকাররূপী ভগবান কালচক্র ঘুরাইয়া ঘটনাবৈচিত্র্যের মৃত্তিকা দিয়া নিয়তির ঘট গড়িতেছেন।

সেই সময়ে যদি কাশীনাথ বাবু ‘বর্দ্ধমেনেকে’ জবাব দিয়া বিদায় করিতেন, তাহা হইলে সুলোচনার পক্ষে ভালই হইত। কিন্তু তাহা হইল না। পিপাসার জল সদরে রহিল, অন্দরে সুলোচনার তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে সে-জল পান করিতে পারিবে না। এ নৃশংস ব্যবহার কে সহ্য করিতে পারে?

সুলোচনা অন্দর হইতে রসিকের উপর অতিমাত্রায় যত্ন-আর্ত্তি ঢালিয়া দিতে আরম্ভ করিল। সরকার মহাশয়ের পাতে প্রত্যহ বড় মাছের মুড়া পড়িত। তাহার জন্য বাড়ীর ভিতর হইতে নিত্য বৈকালে উৎকৃষ্ট জলখাবার আসিত। রাত্রে তাহার ভাতের থালার পাশে কোথা হইতে একবাটি খাঁটি দুধ বা রাবড়ি আসিয়া পড়িত। সোণা-ঝী এ সকল ব্যাপারের উপর তীব্র দৃষ্টিপাত করিত। সে বুঝিত, এসকল বউ-ঠাকুরাণীর ইঙ্গিতে হইতেছে। যদি তাহাই হয়, তাহাতে বউ-ঠাকুরাণীকে দোষী করা তাহার উচিত ছিল না। কাশীবাবু এখন দমদমার বাগানেই পড়িয়া থাকিতেন, বড়একটা বাড়ী আসিতেন না। সুলোচনা স্বামীকে যত্ন-আর্ত্তি করিবার সুবিধা পাইত না। পারুলকে সে দেখিতে পারিত না। সুতরাং তাহার এমন একজন লোকের আবশ্যক হইয়াছিল, যাহাকে ভাল খাওয়াইয়া পরাইয়া সে তৃপ্ত হইতে পারে। লোকাভাবে রসিককেই সে পদ পূরণ করিতে হইত। রসিক ভাবিত, সেটা তাহার সৌভাগ্য, এবং সেই সৌভাগ্যবলেই তাহার অদৃষ্টে এই রাজভোগ।

ভোগে লালসা বাড়িয়া যায়। রসিকেরও সকল রকম লালসা বাড়িতে লাগিল। সে সাধ্যমত মুনিবের অর্থ আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার দ্বিতীয় লালসা সুলোচনার উপর। এ লালসা সুলোচনা নিজেই বাড়াইয়া দিয়াছিল—কি কি উপায়ে তাহা এখানে বিস্তারে বলিবার আবশ্যক নাই।

কৃপাময়ী পূজা আহ্নিক ও বার মাসে তের পার্ব্বণ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। কাশীবাবুর খাস পরিবারের সংখ্যা অধিক

না হইলেও, চাকর দাসী ও লোকজন লইয়া সংসারটি নিতান্ত ছোট ছিল না। মামুলী বন্দোবস্তের উপর এই বড় সংসার কলের মত চলিয়া যাইত। স্নুতরাং স্নুলোচনা বা পারুলের চাল-চলনের উপর কৃপাময়ী বিশেষ নজর দিতেন না। এ সকল সামান্য ব্যাপারে বড়ঘরের প্রাচীনাদিগের দৃষ্টি দিলে চলে না।

সোণা-ঝীর সঙ্গে সরকার মহাশয়ের মনের অকৌশল ষোল আনারও উপরে উঠিয়াছিল। সরকার মহাশয়ের এখন 'মারি ত গণ্ডার, লুটি ত ভাণ্ডার'। স্নুতরাং সোণায় এখন তাহার মন উঠিবে কেন? স্নুলোচনার কাছে সোণা যেন চাঁদের কাছে জোনাকি। প্রত্যাখ্যাত সোণা কিন্তু এখন আর সরকার মহাশয়ের উপর শোধ লইবার কোনও পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। সোণার জ্বালায় রসিক এখন পাড়ার মধ্যে স্বতন্ত্র বাসা ভাড়া করিয়াছিল। এই বাসায় সে রাত্রিযাপন করিত; এবং দিবসে মুনিব-বাড়ী হাজির থাকিয়া চাকরি তামিল করিত।

[২২]

অভিসার।

কাশীবাবুর বাড়ীর খিড়কির বাগানে গোপনে প্রবেশ করিবার পথ-ঘাট স্নুরেশ কয়েক দিনের চেষ্টায় ঠিক করিয়া লইয়াছিল। তাই আজ রাত্রি ১০ টার পর সে এখানে অন্যের অলক্ষিতে আসিতে পারিয়াছিল। স্নুরেশ প্রাচীর উলঙ্ঘন করিয়া বাগানে

প্রবেশ করিবে এইরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, যেহেতু বাগানের গেট সর্ব্বদাই বন্ধ থাকিত। সে এখন দেখিল, তাহার ট্রাপ্-দরজা ঈষৎ খোলা রহিয়াছে। সুরেশের মনে সন্দেহ হইল। পরক্ষণেই সে ভাবিল, পারুল বোধ হয় তাহার আসার সুবিধার জন্য এই দরজা খুলিয়া রাখিয়াছে। সে তাহার ভিতর দিয়া উঁকি মারিয়া একবার বাগানের মধ্যে চারিদিক দেখিয়া লইল যে কোথাও কেহ নাই; তারপরে নিঃশব্দপদে বাগানে ঢুকিয়া পড়িল। বাগানখানি ছোট হইলেও নিতান্ত নির্জ্জন। তাহার পার্শ্বের সরু গলি দিয়া দিবসেও বড়-একটা কেহ যাতায়াত করিত না। রাত্রে এ অঞ্চল একেবারে 'নিশুতি' ও অন্ধকার। সুলোচনা খিড়কির দিকে রাত্রে মিছা-মিছি আলো দেওয়া রহিত করিয়াছিল। বোধ হয় তৈলের অপব্যয় নিবারণ করাই উদ্দেশ্য।

সুরেশ বাগানে প্রবেশ করিয়া আস্তে আস্তে বাড়ীর খিড়কির দরজার নিকট গেল। দেখিল তাহা ভিতর হইতে অর্গল-বদ্ধ। সে মনে করিল, পারুল এই দরজা খুলিয়া বাগানে আসিবে, অতএব তাহার অপেক্ষা করা আবশ্যক। সুরেশ দেখিল প্রাসাদের নিকট একস্থানে দু'তিনটি কামিনী ও হেস্না হেনার ঝাড় একত্র হইয়া একটি ঝোপের মত হইয়াছে। সে নিঃশব্দে এই ঝোপের ভিতর ঢুকিয়া পারুলের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তথাপি পারুল আসিল না। সুরেশের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল না।

হঠাৎ স্ত্রী-পুরুষের কণ্ঠস্বর তাহার কাণে আসিল। সুরেশ

যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক তাহার পার্শ্বেই একটি গবাক্ষ। এই গবাক্ষ দিয়া ঐ কথোপকথনের শব্দ আসিতেছিল। ভিতরে সামান্য আলোক থাকিলেও সুরেশ মুখ বাড়াইয়া যাহারা কথা কহিতেছিল তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। গবাক্ষে মিহি মস্‌লিনের অনেকগুলি পর্দ্দা ঝুলিতেছিল; মাকড়সারূপী তন্তুবায় এই সকল পর্দ্দা বুনিয়াছিল। সেকারণে সুরেশ চক্ষুর সহিত কর্ণের যোজনা করিয়া দর্শনশক্তি দ্বিগুণ করিয়া লইল।

স্ত্রীলোকটি বলিল—"এ রকম উইল হোলে ত আমাদের সর্ব্বনাশ!"

পুরুষ বলিল—"ট্রাষ্টীদের হাতে বিষয় গেলে তুমি কিছুই স্পর্শ করতে পারবে না, একথা ঠিক। কিন্তু এখন উপায় কি?"

"উপায় হচ্চে কোনরকমে উইল হোতে না দেওয়া। আমার ভগ্নীপতি বলেছিল, বাবু যদি উইল না করে, তা'হলে আমিই বিষয়ের একমাত্র মালিক হয়ে নিজের ইচ্ছামত দানবিক্রি করতে পারব। পারুল যখন বিধবা, আর তার যখন ছেলেপিলে হয়নি, তখন সে নাকি বিষয়ের কিছুই পাবে না।"

"বাবুর এটর্ণি আমাকে বলেছেন, দু'এক দিনের মধ্যেই উইলের মুসবিদা তৈরী হবে।"

"আমি তোমার পায়ে পড়ি, কালই তুমি কৃষ্ণনগরে চলে গিয়ে আমার ভগ্নীপতিকে আমাদের এই বিপদের কথা জানিয়ে, তাকে একেবারে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এস। ঘোষ মশাই এলে নিশ্চয়ই উইল করা রহিত করতে পারবে।"

"কর্ত্তা আজ কেমন আছে?"

"আজও ১০৫ ডিগ্রি জ্বর হয়েছে, যন্ত্রণাও খুব বেড়েছে ডাক্তারেরা বলেছে, কাল আবার পিঠে নূতন অস্ত্র করতে হবে। পোড়ার মুখো উইল করবার আগে যদি মরে ত সকল বালাই ঘুচে যায়!"

"মারা গেলে যে তোমাকে হাত শুধু করতে হবে, থান কাপড় পরতে হবে!"

"ঈশ্! বয়ে গেছে আমার; তুমি থাকতে ত নয়!"

"তবে তুমি রোগীর ঔষধ খাওয়াবার গোলমাল ক'রে কাজ এগিয়ে দাও না কেন?"

"পারুল যে বাবুর কাছে দিনরাত্র থেকে তার সেবা করছে। ঔষধপত্র খাওয়াবার ভার যে তার উপরে।"

"তবেই ত!"

"এখন ওসব বাজে কথা রাখ। তুমি আর রাত কোর' না; বাসায় গিয়ে শোও গে। কাল ভোরে উঠেই কৃষ্ণনগরে রওয়ানা হবে।"

"আচ্ছা।"

কথোপকথন বন্ধ হইল। যাহারা কথা কহিতেছিল, তাহারা গবাক্ষের নিকট হইতে সরিয়া গেল। রঙ্গমঞ্চের একটি দৃশ্যের ন্যায় এই ব্যাপারটি সুরেশের নয়নপথে আসিয়া আবার অদৃশ্য হইল। পাঠক বুঝিয়াছেন, ঐ পুরুষ হচ্ছে রসিক, এবং ঐ স্ত্রীলোকটী হচ্ছে সুলোচনা। পরক্ষণেই খিড়কির দরজা খোলা হইল, রসিক অন্দর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাগানের গেটের ট্রাপ্-দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। এই জন্যই ঐ দরজা খোলা

ছিল। একটু পরে সুলোচনা আসিয়া তাহা বন্ধ করিয়া গেল। পারুল পীড়িত পিতার সেবা করিতেছে শুনিয়া সুরেশ তাহার জন্য অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন বুঝিয়া প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া সরিয়া পড়িল। তাহার আবির্ভাব ও তিরোভাব কেহ জানিল না।

[২৩]

স্বর্গলাভ।

রাধাবল্লভ বাবুর আগমন নিরর্থক হয় নাই। তিনি আসিয়া কাশীবাবুকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, উইল করিয়া ট্রাষ্টীদের হাতে বিষয় ন্যস্ত করিলে তাহারা নানাপ্রকার ছল ও কৌশল করিয়া তাহার অধিকাংশই নিজেদের উদরসাৎ করিবে। মাঝে থেকে তাঁহার স্ত্রী, কন্যা ও ভগ্নী বঞ্চিতা হইবেন। অতএব এরূপ উইল না করিয়া বরং তিনি সত্বর আরোগ্য হইয়া একটি সদ্বংশজাত শিশুকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিলে সকল দিক্ বজায় থাকিবে। এই কথায় কাশীনাথ বাবুর মন টলিল। তিনি পূর্ব্বপ্রস্তাবিত উইল করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এটর্ণিবাবু দুইদিন আসিয়া ফিরিয়া গেলেন। সুলোচনার জয় হইল।

এদিকে কাশীবাবুর পৃষ্ঠব্রণ পুনঃপুনঃ অস্ত্রকরা সত্বেও নিত্য বাড়িয়া যাইতেছিল। প্রস্রাব অত্যন্ত দূষিত হওয়ায় সম্যক

বিকার দেখা দিল। অবশেষে ডাক্তারদিগের অশেষ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া কাশীবাবু ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। সংবাদপত্রে সুরেশ তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাঠ করিল। জগতের আবশ্যক না থাকিলেও বড়লোকের গতিবিধি ও পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদে সংবাদপত্রের কলেবর পুষ্ট হইয়া থাকে।

পারুল চতুর্থ দিবসে যথানিয়মে পিতার চতুর্থী করিল। একমাস পরে ৺ কাশীনাথ বসুর আদ্যকৃত্য মহা সমারোহের সহিত সমাপিত হইল। প্রায় পাঁচ হাজার লোক ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত হইল। নবদ্বীপ ভট্টপল্লী হইতে আগত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ যথাযোগ্য বিদায় পাইয়া বিদায় হইলেন। রাধাবল্লভ বাবু নিজে দাঁড়াইয়া কাঙ্গালী বিদায় করিলেন। তাঁহার স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরী এই ক্রিয়া উপলক্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠা সুলোচনাকে তাহার বয়সের অল্পতা প্রযুক্ত কিছুতেই হাতের গহনা খুলিতে দিলেন না।

কাশীবাবুর স্বর্গলাভের দিন হইতেই রসিক সরকার পুনরায় প্রকাশ্যভাবে অন্দরে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল। তাহার পক্ষেও ইহা একপ্রকার সশরীরে স্বর্গলাভ। সুলোচনা অন্দর-মহলে কর্ত্রী হইলেও, রসিক এখন সদরে সকল বিষয়ে কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইল। ঘটনাচক্রে একএকটা লোকের ভাগ্য খুলিয়া যায়।

সোণা-ঝীর কাজ অনেক হাল্‌কা হইয়াছে। তাহাকে আর এখন সুলোচনা ও সরকার মহাশয়ের মধ্যে ব্যবধান পূরণ করিতে হয় না। এ ব্যবধান আপনা হইতেই ঘুচিয়া

গিয়াছে। সুতরাং সোণা ক্রমে সুলোচনা হইতে তফাৎ হইয়া পারুলের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুলোচনার মহলে তাহাকে আর এখন বড় দেখিতে পাওয়া যাইত না। সে রসিককে এই মহলে দখল দিয়া স্বয়ং পিসীমা ও দিদিমণির মহলে সরিয়া পড়িয়াছিল। তাহার ভয়, পাছে সরকার মহাশয়ের বিরুদ্ধে চালাকি করিতে গিয়া নিজের চাকরিতে জবাব হয়। সোণা এই বাটী হইতে চলিয়া যাইতে রাজী ছিল না। সে বাড়ীর ভিতর মাথা গুঁজিয়া থাকিয়া দূর হইতে সরকার ও সুলোচনার কতদূর দৌড় তাহা দেখিতে থাকিবে, ইহাই তাহার সঙ্কল্প।

[২৪]

হেমাঙ্গিনী ও পারুল।

একদিন ঝুমন্ আসিয়া হেমাঙ্গিনীকে খবর দিল যে, তাহার দিদিমণিরা এঁড়েদহের বাগান-বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার দিদিমণির পিসীমাও আসিয়াছে; এবং সে আজ তাহাদের বাগানে গিয়া গাছ থেকে বিস্তর ফল ও বিল্বপত্র পাড়িয়া দিয়া আসিয়াছে। তাহার দিদিমণি তাহাকে সুরেশ বাবুর সম্বন্ধে যে যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তাহা ঝুমন্ হেমাঙ্গিনীর নিকট চাপিয়া গেল।

ভাইয়ের শ্রাদ্ধের একসপ্তাহ পরেই শোকসন্তপ্তা কৃপাময়ী পারুলকে সঙ্গে লইয়া এঁড়েদহের বাগান-বাড়ীতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। ভ্রাতৃবিয়োগের পর হইতে বাগবাজারের বাড়ী তাঁহার নিকট কারাগার বলিয়া বোধ হইত। কৃপাময়ীর বাসনা এই, তিনি এঁড়েদহের বাগান-বাড়ীতে কিছুদিন থাকিয়া, সেখান হইতে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া লইয়া ৺কাশীধামে যাইবেন; এবং সেখানে নিত্য গঙ্গাস্নান এবং বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া শেষ-জীবন অতিবাহিত করিবেন। তবে পারুলকে তাঁহার সঙ্গে কাশীবাসী হইতে হইবে ইহাই তাঁহার একমাত্র দুঃখ। কৃপাময়ী মধ্যে মধ্যে আপনার মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন যে, পারুলের যখন অল্প বয়সে কপাল পুড়িয়াছে, তখন তাহার আর অন্য উপায় কি? বামুন-কায়েতের ঘরের বিধবার ধর্ম্মকর্ম্ম করা ছাড়া আর পথ নাই।

পারুল সোণা-ঝীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। কৃপাময়ী তাহাকে বলিয়াছিলেন, "আমরা কাশী চলিয়া গেলে তুই বাগবাজারের বাড়ীতে ফিরিয়া যাস্।" সোণা তাহাদের সঙ্গে কাশী যাইতে রাজী ছিল না। তাহার প্রাণে কিছু কৃষ্ণপ্রেম ছিল। তাহার কৃষ্ণ সম্প্রতি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে বিহারপরায়ণ হইলেও সোণা-ঝী কি তাহার উপর অভিমান করিয়া এখন কাশীবাসী হইতে পারে?

ঝুমনের নিকট পারুলদের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া হেমাঙ্গিনী তাহার পূর্ব্বঅঙ্গীকারমত কৃপাময়ীর সঙ্গে এঁড়েদহের

বাগান-বাটীতে দেখা করিতে আসিল। ঝুমন্ তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল। হেমাঙ্গিনীকে দেখিয়া পারুলের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। সে তাহাকে তাহার পিসীমার কাছে লইয়া গেল। কৃপাময়ী হেমাঙ্গিনীকে বিশেষ আদর-যত্ন করিলেন। তাহাদের মধ্যে বিস্তর গল্পগাছা হইল। কৃপাময়ী তাঁহার ভাইয়ের পীড়া, চিকিৎসা, মৃত্যু ও তাহার শ্রাদ্ধের কথা কাঁদিতে কাঁদিতে সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পিতৃবিয়োগের প্রসঙ্গে পারুলের গণ্ডস্থল অশ্রুপ্লাবিত হওয়ায় তাহার সুন্দর মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যে কোনও দিন কোন সুন্দরী যুবতীকে মর্ম্মন্তুদ দুঃখে হাপুস্ নয়নে কাঁদিতে দেখিয়াছে, সে-ই পারুলের তাৎকালিক সজলমুখকমলের কল্পনা করিতে পারিবে।

হেমাঙ্গিনীরও চোখে জল পড়িতেছিল। এ কারণে সে এই শোকপ্রসঙ্গের স্রোত অন্য দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া দুইতিনবার ব্যর্থমনোরথ হইল। যে নিজে কাঁদে, সে পরের কান্না থামাইতে পারে না।

পারুল হেমাঙ্গিনীকে অত্যন্ত আপনার জন বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল। হেমাঙ্গিনী যাইবার সময় সে বলিল—"দিদি! তোমাকে রোজ আমাদের বাড়ী আসতে হবে; না এলে আমি ছাড়ব না; তুমি বল' আসবে?" হেমাঙ্গিনী স্বীকৃত হইল। পারুল তাহার সঙ্গে বাগানে আসিয়া তাহাকে শিবের মন্দির, গঙ্গার ঘাট, প্রশস্ত উদ্যান এবং তন্মধ্যস্থ তাহার সেই ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান ও লতাকুঞ্জটিও পরিদর্শন করাইল। তারপর

বিদায় দিবার সময় সোণা-ঝীকে ডাকিয়া বলিল—"সোণা, তুই সঙ্গে গিয়ে দিদিদের বাড়ী চিনে আয়। দিদি যেদিন না আসবে, তুই গিয়ে ধ'রে আন্‌বি।" ঝুমন্‌ বহুপূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল। সে এক জায়গায় চার পাঁচ ঘণ্টা স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে কেন? তাহার দিদিকে পাইয়া পারুল সম্ভবতঃ আজ সুরেশের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। তাই ঝুমনের খোঁজ লওয়া তাহার আবশ্যক হয় নাই।

[২৫]

সমাজ-তত্ত্ব।

কাশীনাথ বাবুর শ্রাদ্ধাদির পর সুরেশ উপর্য্যুপরি তিনরাত্র বাগবাজারের বাড়ীর খিড়কির বাগানে চোরের মত প্রবেশ করিয়াছিল, এবং সেখান হইতে চোরের মত সরিয়া পড়িয়াছিল। প্রতিদিনই তাহাকে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া যাতায়াত করিতে হইয়াছিল; বাগানের ট্রাপ্‌-দরজা আর খোলা থাকিত না। সুরেশ এখানে সেই স্ত্রীপুরুষের প্রেমপূর্ণ কথা আর একদিনও শুনিতে পায় নাই, বা কোনও পুরুষকে এই পথ দিয়া বাহির হইয়া যাইতে দেখে নাই। রসিকের এখন আর খিড়কির পথের আবশ্যক ছিল না। পারুলও তাহার পত্রানুযায়ী সুরেশের সঙ্গে খিড়কির বাগানে আসিয়া দেখা করে নাই। সে যে এঁড়েদহে আছে, সুরেশ তাহা জানিত না।

সুরেশ বড় ফাঁপরে পড়িল। পারুলের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সে যে কি উপায় অবলম্বন করিবে তাহা স্থির করিতে পারিল না। একবার ভাবিল, পারুলের নামে একখানি পত্র লিখিয়া ডাকে পাঠাইবে। কিন্তু ভয় হইল পাছে এই চিঠি অপরের হাতে পড়ে। এ সকল ব্যাপারে লোকের হাতে পত্র পাঠানও নিরাপদ নহে। পারুল তাহাদের মালীর হাতে যে পত্র পাঠাইয়াছিল, তাহা হেমাঙ্গিনীর হস্তগত হওয়ায় তাহাকে বিশেষ লজ্জা পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু সুরেশ দেখিল, তাহা আর এক হিসাবে শুভফল প্রসব করিয়াছে। তাহার দিদি এই চিঠি পাইয়া বাগবাজারে মদনমোহন দর্শন উপলক্ষে পারুলদের বাড়ীতে গিয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়া আসিয়াছে। সুরেশ ভাবিল, তাহার দিদি এখন আর একবার মদনমোহন দর্শন করিতে গেলে ভাল হয়। কিন্তু তাহার ভয় হইল পাছে দিদির কাছে এই প্রস্তাব করিলে সে আবার পারুলের কথা উত্থাপন করিয়া তাহাকে লজ্জা দেয়। কি মুস্কিল!

সুরেশ তাহার মেসে শয্যায় শয়ন করিয়া চোখের সামনে একখানি উপন্যাস খুলিয়া ধরিয়া এইসকল চিন্তা করিতেছিল। এমন সময় পাঁচুমামা আসিয়া উপস্থিত। সুরেশ পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া উঠিয়া বসিল; পঞ্চানন বাবুও শয্যার উপর উপবেশন করিলেন। উভয়ের কুশল প্রশ্নের পর নানাবিধ কথোপকথন আরম্ভ হইল। সে কথোপকথনের মধ্যে দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি ও সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি সকলই আসিয়া

পড়িল ; শেষে বিধবাবিবাহের কথা উঠিল। সম্প্রতি কলিকাতায় এক বিলাতফেরত বাঙ্গালী প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দুমতে এক বিধবা রমণীর পাণীগ্রহণ করিয়াছিলেন। সংবাদপত্রে তখন এই ঘটনা লইয়া বেশ লেখালিখি চলিতেছিল।

পঞ্চানন বলিলেন—"হিন্দুমতে এই বিবাহ হইয়াছে শুনিয়া আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে হিন্দুসমাজের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান হইয়াছে। ইয়োরোপ-প্রত্যাগত শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ যদি হিন্দুসমাজের মধ্যে থাকিতে চাহেন, তাহার অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি আছে?"

সুরেশ বলিল—"হিন্দুসমাজ যে তাঁহাদিগকে বর্জ্জন করে; তাঁহারা ত ইচ্ছা করিয়া সমাজ ত্যাগ করেন না।"

প। নিগৃহীত হইয়াও যে ব্যক্তি মাতৃতুল্য সমাজের গলা আঁকুড়িয়া থাকে, তাহারই বাহাদুরি, সে-ই প্রকৃত সমাজভক্ত। সমাজ আমাকে ছাড়িতে চাহিলেও, আমি সমাজকে ছাড়িব না—এইরূপ সঙ্কল্প করা চাই।

সু। বিধবা বিবাহ করিলে সমাজে তাহাকে একঘরে হইতে হইবে। এ বড় কঠোর নির্য্যাতন।

প। যে ব্যক্তি বিধবাবিবাহ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, তাহাকে মন থেকে সামাজিক নির্যাতনের ভয় একেবারে দূর করিতে হইবে। আজকাল আর সামাজিক নির্যাতন অধিকদিন স্থায়ী হয় না। শিক্ষাবিস্তারের জন্য, এবং অন্যান্য জাতির সংঘর্ষে আসিয়া আমাদের সমাজ এখন অনেকটা সংস্কারমুখিন্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমুদ্রপথে বিদেশযাত্রার

বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিবাদ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। এখন বিলাত গেলে এখানকার বৈদ্য কায়স্থ সমাজে আর জাতিপাত হয় না। হিন্দু সমাজের মধ্যে বিধবাবিবাহের সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। সমাজের শীর্ষস্থানীয় কোন কোন বড়লোকের ঘরেও আজকাল বিধবাকন্যার পুনরায় বিবাহ হইতেছে। আমার মত এই, যে নারী অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছে, সে যদি স্বভাবতঃ ত্যাগমার্গবিমুখ হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য জোর করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করা সঙ্গত নয়। তাহাতে বিপরীত ফল দাঁড়ায়।

সু। আমারও এই মত। আমাদের সমাজে এরূপ বিধবাদিগের পুনরায় বিবাহ হওয়া উচিত।

প। নিশ্চয়ই। এই সকল বিধবাদের জন্য চিরবৈধব্যের বিধান করিয়া হিন্দুসমাজ আত্মঘাতী হইতেছে। এই কারণে এদেশে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা যে হারে বাড়িয়া যাইতেছে, হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা সে হারে বাড়িতে পারিতেছে না। ইহার ফলে, আর দুই তিনশ বৎসর পরে ভারতবর্ষে মুসলমান জনসংখ্যা হিন্দু জনসংখ্যার সমান হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ চলিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

সু। তবে বিধবাবিবাহ সমাজে না চলিবার কারণ কি?

প। বিবাহ করিতে ইচ্ছুক এরূপ অনেক বালবিধবা আছে। কিন্তু তাহাদিগকে সাহস করিয়া বিবাহ করিতে পারে এরূপ পাত্রের সংখ্যা আমাদের সমাজে নিতান্ত অল্প।

সুরেশ! তুমি ত একজন শিক্ষিত যুবক। কোনও সদ্বংশজাত বালবিধবাকে বিবাহ করিতে তোমার সাহস হয়?

সু। আমার সাহসের কথা কি বলছেন? আমি অনেক দিন হইতে সংকল্প করিয়াছি, যদি বিবাহ করি তাহা হইলে কোনও বিধবাকেই বিবাহ করিব।

প। বেশ কথা সুরেশ। তবে আমি তোমাকে একটি কথা এখন স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। বাগ-বাজারের স্বর্গীয় কাশীনাথ বসুর এক পরমা সুন্দরী বিধবা কন্যা আছে। হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে তাহার পরিচয় হইয়াছে। তোমার বিবাহের জন্য সে এই মেয়েটীকে পাত্রী স্থির করিয়াছে। এ সম্বন্ধে তোমার কি মত?

সুরেশ চুপ করিয়া রহিল। তাহার হাসি হাসি সলজ্জ মুখ দেখিয়া পঞ্চানন বাবু তাহার মতামত বুঝিতে পারিলেন। মুখশ্রীর একপ্রকার ভাষা আছে; রসনা ব্যক্ত না করিলেও মুখশ্রীতেও অনেকের মনের ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

[২৬]

হেমাঙ্গিনীর ঘটকালী।

হেমাঙ্গিনী প্রায় প্রত্যহই পারুলদের বাগানবাড়ীতে যাইত। ইতিমধ্যে সে একদিন কথাচ্ছলে বৃদ্ধা কৃপাময়ীর কাছে পারুলের দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিয়াছিল। কৃপাময়ী

বলিতেছিলেন যে, পারুল কচি মেয়ে, তার এখন দেখিবার শুনিবার, আমোদ আহ্লাদ করিবার বয়স। তাকে এই বয়সে কাশীবাসী করিতে তাঁর মন সরে না। কিন্তু উপায় কি? পারুলের এমন কোনও আপনার জন নাই, যার কাছে তাকে রেখে যেতে পারেন।

হেমাঙ্গিনী বলিল—"পিসীমা! আপনি কেন পারুলের আবার বিয়ে দিয়ে যান না?"

কৃপাময়ী বলিলেন—"ওমা, সে কি গো? কায়েতের ঘরের মেয়ে, একবার তার বিয়ে হয়ে গিয়ে বিধবা হয়েছে, তার আবার বিয়ে হবে কেমন করে?"

হে। কেন, খুব বড় বড় ঘরেও ত আজকাল বিধবা মেয়ের আবার বিয়ে হচ্চে। এই ত সেদিন কলকাতার এক মস্ত কায়েতের, আর একজন বড় ব্রাহ্মণের বিধবা মেয়ের বিবাহ হয়ে গেল। যত বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর সমাজের লোক এই দুই বিয়েতে পাত পেড়ে খেয়েছিল।

কৃ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা তখন বাগবাজারের বাড়ীতে ছিলুম, মনে পড়েছে বটে; এই বিয়ের বটতলার বই বেরিয়েছিল। তা মা পোড়া সমাজে যদি কোন গোল না হয়, তা'হলে ত আমার পারুলের একটা কিনারা হতে পারে। আহা এমন দিন কি হবে? আমার পারুলের পোড়া কপালে কি আবার ঘর বর জুটবে?

হে। আমি যে তার বর ঠিক করে ফেলেছি পিসীমা? ছেলে দেখতে যেন কার্ত্তিক, তিনটে পাশ করে আবার কলেজে পড়ছে, কলকাতায় থাকে। তার নাম সুরেশ; শান্তিপুরের ৺রামলাল মিত্রের ছেলে। সেখানে তাদের ঘরবাড়ী ও কিছু

বিষয়-আসয় আছে। সুরেশের বাপ কৃষ্ণনগরে রাজ সরকারে নায়েবী করতেন। বাবা মারা যাবার পর আমরা যখন নিরাশ্রয় হয়েছিলুম, তখন সুরেশের বাপই তাঁর নিজের বাড়ীতে আমাদের আশ্রয় দিয়ে প্রতিপালন করেছিলেন। তখন থেকে সুরেশ আমাকে 'দিদি' বলে ডাকে। আমি তাকে আপনার ভায়ের মত জ্ঞান করি।

এ সম্বন্ধে যাহাকিছু বলিবার ছিল তাহা নিঃশেষ করিয়া হেমাঙ্গিনী কৃপাময়ীকে হাসিতে হাসিতে বলিল—"পারুলের সঙ্গে সুরেশের দ্যাখা শোনা হয়েছে। তারা পরস্পরকে বিবাহ করতে বড়ই ইচ্ছুক হয়েছে। তারা দু'জনেই তাদের মনের ভাব আমার কাছে খুলে বলেছে। পিসীমা! আপনি এ বিবাহে অমত করবেন না; কল্লে পারুল বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে।"

এই কয়েকটি কথার মধ্যে হেমাঙ্গিনী উপর্য্যুপরি দুই তিনটি মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। এই মিথ্যার দ্বারা সত্যের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। অনেক সময় মানুষ সত্য কথা বলিয়া পাপ সঞ্চয় করে, এবং মিথ্যা কথা বলিয়া পুণ্যার্জ্জন করে। এমন সত্য আছে যাহা মিথ্যা হইতেও অধম; আবার এমন মিথ্যা আছে যাহা সত্য হইতেও মহান্।

হেমাঙ্গিনীর কথা শুনিয়া কৃপাময়ী অবাক্ হইয়া গেলেন। বলিলেন, "ওমা, বল কি গো, সত্যি নাকি?" তাঁহার মনে ভয়, বিস্ময়, স্নেহ, হর্ষ ও চিন্তা ক্রমান্বয়ে ক্রীড়া করিতেছিল। এ অবস্থায় এ বিষয়ে কোনও পাকা রকমের মতামত প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

কথোপকথনের শেষভাগে সোণা-ঝী আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল—"আহা, দিদিমণির বিয়ে হোক বাপু পিসীমা তুমি অমত কোর' না। আমার কিন্তু সোণার তাগা চাই।" সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই সোণা পারুলকে জ্ঞাপন করিল যে শীঘ্রই তাহার আবার বিবাহ হইবে; হিমুদিদি তাহার বর ঠিক করিয়াছে। পারুল তাহাকে একটি চিম্‌টি কাটিয়া বলিল 'দূর'।

[২৭]

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

শান্তিপুর নিবাসী স্বর্গীয় রামলাল মিত্রের পুত্র শ্রীমান সুরেশচন্দ্র মিত্রের সহিত বাগবাজার নিবাসী ৺কাশীনাথ বসুর বিধবা কন্যা শ্রীমতী পারুলকুমারী দাসীর শুভ বিবাহে আমার পাঠকদিগকে যে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, তাহার কারণ এই যে, এই কার্য্য এঁড়েদহের বাগানবাটীতে একপ্রকার গোপনেই সমাধা হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া ত্রুটি মার্জ্জনা করিতে বলিলে, অথবা উক্ত পত্রে বর বা কন্যাপক্ষ হইতে লৌকিকতা গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলে সম্ভবতঃ অনেকেরই চক্ষু কপালে উঠিত। কেহ কেহ বা গঙ্গাস্নান করিয়া এই পত্রস্পর্শজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেন।

কৃপাময়ী বিবাহের সময় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি বিবাহের ব্যয়ের জন্য কিছু নগদ টাকা, এবং পারুলের জন্য

পাঁচ হাজার টাকার গহনা রাখিয়া কাশীতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। পারুলকে সম্প্রদান করিয়াছিল তাহার এক দূর-সম্পর্কের অনাথা মাসীমা; তাঁহাকে সংবাদ দিয়া আনা হইয়াছিল। কৃপাময়ী তাঁহার পাথেয় স্বরূপ একশত টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন।

বিবাহ-সভায় নন্দলালের রচিত কবিতা মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটী হইতে শালগ্রামশীলা সহিত একজন পুরোহিত আসিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে সুরেশের কয়েকজন ছাত্র-বন্ধু এবং পাঁচ সাতজন ব্রাহ্ম বরযাত্রীরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্ম বলিলেন—"সাধারণতঃ হিন্দুবিবাহে শালগ্রাম থাকে বলিয়া আমরা তাহাতে যোগদান করিতে পারি না; কিন্তু হিন্দু বিধবাবিবাহে শালগ্রাম সত্বেও যোগদান করিতে পারি।"

এই কথা শুনিয়া পঞ্চানন বাবু রহস্য করিয়া বলিলেন—"যথা, আপনাদের উপাসনায় যোগদান করিতে না পারিলেও, আমরা আপনাদের সহিত ভোজনে যোগদান করিতে পারি।" পঞ্চানন বাবু ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক বহিরঙ্গের উপর বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না। তিনি বলিতেন—

"গোঁড়া ব্রাহ্মরাও পৌত্তলিক; যেহেতু তাঁহারা ভগবানের শাব্দিক মূর্ত্তি রচনা করিয়া তাঁহাকে কর্ণেন্দ্রিয়ের গোচর করেন। আর সাধারণ হিন্দুসাধক মৃৎপ্রস্তরমূর্ত্তি গঠন করিয়া ভগবানকে দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর করেন। এই দুই উপাসনার মধ্যে প্রভেদ

কি ? উপাসনামাত্রেই পৌত্তলিকতাকে অবলম্বন করে। সুতরাং উপাসনার ভেদাভেদ লইয়া মারামারি করিবার আবশ্যক নাই। উপাসনাই মানবের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে। দিবারাত্র উপাসনায় মজিয়া থাকিলে Intellectuosity* কমিয়া আসে। জগতের ইতিহাসে নেপোলিয়ন্, বিস্‌মার্ক, ক্রমওয়েল্ প্রভৃতির মত যেসকল কর্ম্মবীর অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনে উপাসনার আধিক্য দৃষ্ট হয় না। ধর্ম্মবীরদিগের কথা স্বতন্ত্র।”

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, পাঁচুমামা, হেমাঙ্গিনী, নন্দলাল ও সোণা-ঝীর চেষ্টাতেই এই বিবাহ সংসাধিত হইয়াছিল। ঝুমন্ নিতবর হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় নন্দলাল তাহার মাথায় একটি ক্ষুদ্র চপেটাঘাত করিয়াছিল। সুরেশের মাকে এবং পারুলের বিমাতা সুলোচনাকে এই বিবাহের বিন্দুবিসর্গ জানিতে দেওয়া হয় নাই। পাঁচুমামা সুরেশকে বলিয়াছিলেন—“আমি তোমার মাকে ভালরকম জানি, তিনি বড় পুত্রবৎসল। এই বিবাহে তিনি কিছুতেই সম্মত হবেন না; কিন্তু বিবাহ হয়ে গেলে তিনি তাঁহার ব্যাটা-বউকে ত্যাগও করতে পারবেন না। অতএব তুমি চিন্তা কোর’ না।”

শ্রমজীবী সমিতির কয়েকজন যুবক এবং স্থানীয় কয়েকটি শিক্ষিত লোক এই বিবাহে যোগদান করিয়াছিল। তাহাদিগকে লইয়া গ্রামের সমাজে একটু গোল বাধিল। পল্লিসমাজের প্রধান পাণ্ডাগণ এ সুযোগ ছাড়িয়া দিবেন কেন? দলাদলির

* বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা।

কাওয়া ঘোঁট এবং পাত্তাড়ি বগলে কাছারি আনাগোনা করা হচ্চে তাঁহাদিগের নিত্যকর্ম্ম। সুতরাং তাঁহারা যখন উক্ত যুবকদিগকে চাপিয়া ধরিলেন, তখন একঘরে হইবার ভয়ে বেচারীরা একে একে এক একটি সুন্দর কৈফিয়ৎ দিয়া আপনাদিগকে সাফাই করিতে লাগিল। কেহ বলিল, "আমি বিধবাবিবাহের তামাসা দেখিতে গিয়াছিলাম"; কেহ বলিল, "আমাদের সমাজের কে কে ঐ বিবাহে উপস্থিত হয় তাহা নোট করিয়া আনিবার জন্য আমি গিয়াছিলাম।" একজন বলিল যে, এই বিবাহের ভোজে মুরগীর কারি প্রভৃতি কোনও অখাদ্য পাতে দেওয়া হয় কিনা তাহা সে দেখিতে গিয়াছিল, নিজে সেখানে আহার করে নাই। বিবাহে যোগদানকারী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দেখিলেন যে, গ্রামে এই উপলক্ষে দলাদলির আগুন জ্বলিয়া উঠিলে স্থানীয় স্কুল ও হিতকরী সভা প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিসগুলি দুইদলের টানাটানির মধ্যে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। বহুদিন পূর্ব্বে আর একবার দলাদলির সময় এইরূপ হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা সকল দিক লক্ষ্য করিয়া সংস্কারবিরোধীদলের নিকট একটু নরম হইয়া বলিলেন যে, এ বিবাহে যোগদান করা যে এতটা সমাজবিরুদ্ধ হইবে, তাহা তাঁহারা পূর্ব্বে কল্পনা করেন নাই। অতএব তাঁহাদের ত্রুটি মার্জ্জনীয়। এই কথায় দলাদলির সকল ঘোঁট থামিয়া গেল। পঞ্চানন বাবু গ্রামের এই সামাজিক গণ্ডগোলের সমস্ত কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন —"সমাজের মধ্যে শিক্ষার আরও বহুল বিস্তার না হইলে

সমাজসংস্কারের ব্যাপারে জোর দেওয়া চলিবে না। আপাততঃ সংস্কারবাদীদিগকে আবশ্যকমত অনেক Compromise † এর ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। হিন্দুসমাজের সম্মুখ দিয়া সংস্কারের সূঁচ গলে না; কিন্তু কৌশলে তাহার পিছন দিয়া হাতী চালাইয়া দেওয়া যায়। একার্য্য করিবার জন্য সংস্কারবাদীদিগকে যেকোন গতিকে হোক সমাজের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে হইবে। সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইলে তাঁহাদের দ্বারা আর হিন্দু সমাজের সংস্কার হইবে না।

[২৮]

সুলোচনার কথা।

সুরেশ ও পারুলের বিবাহ এঁড়েদহের এক নিভৃত উদ্যান-বাটীতে সংক্ষেপে সংসাধিত হইলেও, তাহার সংবাদ অতি-রঞ্জিত আকারে সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। কৃষ্ণ-নগরে বসিয়া রাধাবল্লভ বাবু তাহা পাঠ করিয়া একটু বিশেষ-ভাবে বিচলিত হইলেন। নায়েব মহাশয়ের পুত্র সুরেশ তাঁহার পরিচিত; এবং পারুল তাঁহার ভায়রাভাই ৺কাশীনাথ বসুর একমাত্র বিধবা কন্যা। বিবাহ হিন্দুমতে হইয়াছে পাঠ করিয়া রাধাবল্লভ ভাবিলেন, পারুলের গর্ভে সন্তান হইলে সে কাশীবাবুর সকল বিষয়ের উত্তরাধিকারী

† আপোষ-মীমাংসা।

হইবে; সুতরাং সুলোচনা তাহার এক কপর্দ্দকও আর হস্তান্তর করিতে পারিবে না। তিনি মনে করিলেন, কাশীবাবুর উইল করা রহিত করিয়া ভাল করেন নাই। উইল হইলে সুলোচনা বিষয়ের যোলআনা না পাইলেও, তাহার অধিকাংশই নিব্যূঢ় সত্ত্বে প্রাপ্ত হইত।

রাধাবল্লভ নিজের কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া সুলোচনার সঙ্গে দেখা করিয়া, এই বিবাহ হইতে তাহার কি অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে, তাহা বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

এই বিবাহ লইয়া কলিকাতার কায়স্থ সমাজে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কাশীনাথ বাবুর পরিবার-বর্গকে একঘরে করিবার কথা উঠিয়াছিল। সুলোচনার পক্ষ হইতে রসিক সরকার দলপতিদিগের দ্বারস্থ হইয়া জ্ঞাপন করিল যে, স্বর্গীয় কাশীনাথ বাবুর স্ত্রীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ও অমতে এই বিবাহ হইয়াছে; এজন্য তাঁহার অপরাধ কি? সতীনঝী-জামাইয়ের সঙ্গে তাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন।

এই চাল চালিয়া সুলোচনা সামাজিক নির্যাতনের দায় হইতে অব্যাহতি পাইল বটে; কিন্তু তাহার ভবিষ্যতের বৈষয়িক দুশ্চিন্তা প্রশমিত হইল না। কাশীবাবু মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার ভগ্নীর জীবদ্দশা পর্য্যন্ত এঁড়েদহের বাগানবাড়ী তাঁহার দখলে থাকিবে। কৃপাময়ীর অনুমতি-ক্রমেই যে পারুল ও সুরেশ এই বাগানবাড়ীতে বাস করিতেছিল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সুলোচনা এক

দিন গোপনে সেখানে পারুল ও তাহার বরকে দেখিতে গেল। রাধাবল্লভ বাবু তাহাকে ইহাদের সঙ্গে মুখে বিশেষ সম্প্রীতি রাখিতে পরামর্শ দিয়া গিয়াছিলেন। এইখানে হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে তাহার দ্বিতীয়বার দেখা হইল, এবং বিশেষ-ভাবে পরিচয় হইল। হেমাঙ্গিনীরা যে সুরেশদের কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে বহুদিন বাস করিয়াছে, এবং তাহার ভগ্নীপতিকে যে তাহারা ভাল রকম জানে, তাহা এই আলাপের সময় সুলোচনা জানিতে পারিল। আর কামারহাটির চটকলে তাহার ভাইয়ের চাকরী হওয়ার জন্য তাহারা যে এখন এঁড়েদহে বাস করিতেছে, তাহাও শুনিল।

সুলোচনা চলিয়া গেলে সোণা-ঝী হেমাঙ্গিনীর কাছে তাহার গুণাগুণের সবিস্তার ব্যাখ্যান আরম্ভ করিল। বলিল, "বউ-ঠাকরুণের মত বেহায়া বদমায়েস মেয়েমানুষ ছুনিয়ায় নেই। বাবু মারা যাবার আগে থেকেই এক সরকারকে নিয়ে উনি এমন ঢলাঢলি আরম্ভ করে দিয়েছিলেন যে সকলে দেখে অবাক্ হোত। দেখ্লে না দিদি, বউ-ঠাকরুণের বয়স গড়িয়ে গিয়ে বিধবা হয়েছে, তবু এখনও হাত শুধু করেন নি। আমার ভয় হয়, পাছে দিদিমণির এই বিয়ে দেখে উনি সেই সরকার-টাকে না বিয়ে করে বসেন। ওঁর অসাধ্য কাজ নেই।" হেমাঙ্গিনী বুঝিল, সোণার ভিতর কিছু দ্রোহীভাব আছে। সে সোণাকে বলিল, "তোমার বউ-ঠাকরুণ ভিতরে ভিতরে কি করে না করে, সেদিকে তুমি নজর দাও কেন?" সোণাকে যে কেন নজর দিতে হয় তাহা সরলা হেমাঙ্গিনী কি বুঝিবে?

তৃতীয় খণ্ড

[১]

সুরেশের কারবার।

ভগবান সুরেশের ভিতর দুইটি ভাল জিনিস দিয়াছিলেন। একটি হচ্চে প্রাণকে মহান ও গরীয়ান করিবার মনোবৃত্তি; অপরটি হচ্চে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের শক্তি। পারুলকে বিবাহ করিয়া সুরেশকে সংসারী হইতে হইয়াছে। তাহার উপর তাহাদের সত্বর সন্তানসন্ততি হওয়া সম্ভব; পারুল ত বালিকা নহে। সংসারী লোককে বাধ্য হইয়া অর্থচিন্তা করিতে হয়।

সুরেশ স্থির করিল, কোনও স্বাধীন ব্যবসা করিবে। চাকরীর উপর সে বড়ই নারাজ—বিশেষতঃ স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের পর হইতে। গতবারের ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল্ কন্‌ফারেন্সে বিলাত হইতে আগত এক সাহেব ভারতের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সুরেশ তাঁহার মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা শুনিয়াছিল। সাহেব উপসংহারে বলিয়াছিলেন, জার্ম্মানী, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপান শিল্পবাণিজ্যের

উন্নতি করিয়াই জাতীয় উন্নতির উচ্চ শিখরে অধিরোহণ করিয়াছে। স্বদেশের উন্নতির জন্য ভারতবাসীকেও এই পথ অবলম্বন করিতে হইবে; সুতরাং তাহার কেবল রাজনীতি লইয়া থাকিলে চলিবে না। এই বক্তৃতা শুনিয়া অবধি সুরেশ স্বাধীন ব্যবসা করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। এখন সেই প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।

বিজ্ঞান ও রসায়ন বিদ্যার উপর সুরেশের বড়ই ঝোঁক। সেজন্য সে ফার্ম্মাকোপিয়ার ঔষধ ও কেমিক্যাল্‌স প্রস্তুত করিবার একটি কারখানা খুলিতে মনস্থ করিল। এই কারবারে প্রতি পদে রসায়ন বিদ্যার সাহায্য লাগে। সুরেশ দেখিল, ঐ সকল মাল তৈরী করিয়া কলিকাতার বড় বড় দোকানে পাইকারী দরে যোগান দিতে পারিলে বেশ লাভ হইবার সম্ভাবনা।

সুরেশ পারুলের গহনা বন্ধক দিয়া আড়াই হাজার টাকা যোগাড় করিল; এবং আপাততঃ এই টাকা দিয়াই কারবার আরম্ভ করিয়া দিল। এঁড়েদহের বাগানের এক পার্শ্বে এক-খানি বড় টিনের চালা নির্ম্মিত হইল, এবং তন্মধ্যে ল্যাবরেটরি স্থাপিত হইল। কারখানার নাম হইল ন্যাশনাল্ ফার্ম্মাসিউটিকেল্ ওয়ার্ক্‌স। বাজারে এই কারখানার মালের বিশেষ প্রশংসা হইল। কলিকাতার সকল দোকানদার বলিতে লাগিল যে, বিলাতী মাল অপেক্ষা এগুলি কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে।

পঞ্চানন বাবু একদিন সুরেশের ল্যাবরেটরি দেখিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন—"উচ্চ রাজপুরুষদিগের উৎসাহ ব্যতিরেকে এসকল কারবারের উন্নতি হয় না। তোমার

মাল যাহাতে সরকারী হাঁসপাতালে ও চ্যারিটেবল ডিস্পেন্‌সারিগুলিতে লওয়া হয়, তাহার চেষ্টা কর। এজন্য বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের চীফ্‌ সেক্রেটারী সাহেব এবং ইন্সপেক্টার জেনারেল অফ্‌ সিভিল হস্‌পিট্যাল্‌সের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ করা উচিত।"

পাঁচুমামার পরামর্শমত সুরেশ আবশ্যকীয় সুপারিস সংগ্রহ করিয়া সত্বর মাননীয় চীফ্‌ সেক্রেটারী সাহেবের সঙ্গে দেখা করিল। এই সাহেব ভারতবাসীকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। সেজন্য কোন কোন এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রে তাঁহাকে 'বাবু সেক্রেটারী' বলিয়া রহস্য করিত। তিনি সুরেশকে সুনয়নে দেখিলেন; এবং তাহার কারবারের সকল কথা শ্রবণ করিয়া সিভিল হস্‌পিটাল্‌সের ইন্সপেক্টার জেনারেল সাহেবের নামে একখানি ভালরকম চিঠি লিখিয়া সুরেশের হাতে দিয়া তাহাকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিলেন।

সুরেশ সেই চিঠি লইয়া ইন্সপেক্টার জেনারেল সাহেবের সহিত পর দিবসেই সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে তাহার তৈরী মালগুলির নমুনা দেখাইল এবং ন্যাশনাল্‌ ফার্ম্মাসিউটিকেল ওয়ার্কসের একখানি ক্যাটালগ্‌ দিল। সাহেব স্বীকার করিলেন যে তাহার ঔষধগুলি চমৎকার হইয়াছে। এরূপ সুন্দর জিনিস যে এদেশে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা তাঁহার ধারণাই ছিল না। সাহেব বলিলেন যে, আগামী শনিবার বৈকালে ৪॥ টার সময় তিনি তাহাদের কারখানা দেখিতে যাইবেন। সুরেশ কৃতজ্ঞহৃদয়ে সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া পরমানন্দে গৃহে ফিরিল।

[২]

চক্রান্ত।

এঁড়েদহের বাগানের মালীরা তরিতরকারীর বজরা লইয়া যথারীতি প্রতি রবিবারে বাগবাজারের বাটীতে আসিত। ইহাদের মুখে সুলোচনা নূতন জামাইবাবুর সেখানে ঔষধের কারখানার কথা শুনিয়াছিল। রসিক সরকার একদিন এঁড়েদহের বাগান দেখিতে গিয়া সুরেশের সঙ্গে আলাপ করিল। বলিল, "আমি আপনার স্বর্গীয় শ্বশুর মহাশয়ের পুরাতন সরকার।" সুরেশ তাহাকে কারখানা ও সাজ-সরঞ্জাম ভাল করিয়া দেখাইল, এবং ঔষধ প্রস্তুতের কার্য্যপ্রণালী বুঝাইয়া দিল।

রসিক চলিয়া আসিবার সময় সোণা তাহাকে দূর হইতে ঝাঁটা দেখাইয়াছিল; রসিক তাহা দেখিতে পায় নাই। সে বাগবাজারের বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া একেবারে অন্দরে চলিয়া গেল। গিয়া দেখিল রাধাবল্লভ বাবু আসিয়াছেন, এবং সুলোচনা তাঁহার কাছে পারুল ও সুরেশের কথা কহিতেছে।

সুলোচনা রাধাবল্লভকে বলিল—"ভাল কথা মনে পড়েছে; সুরেশদের কৃষ্ণনগরের বাসায় হেমাঙ্গিনী ব'লে একটি মেয়ে থাকৃত। তার ভাইয়ের নাম নন্দ। ঘোষ মশাই, তুমি তাদের জান? তারা এখন এঁড়েদহে থাকে। হেমাঙ্গিনী বল্লে, তারা তোমাকে খুব জানে।"

রাধাবল্লভ বলিল—"নন্দ যে আমার মুহুরী ছিল। হেমা-

ঙ্গিনীদের আমি খুব জানি। ছুঁড়ী ভারি তোখড়। তারা এতদিন কোথায় আছে আমি তার সন্ধান পাইনি।"

সু। সেই হেমাঙ্গিনীই ত পারুলের বিয়ের প্রধান উদ্যোগী গো। সে এঁড়েদহের বাগানবাড়ীতে পারুলের কাছে রোজ বেড়াতে আসে। তার ভাই কামারহাটির চট্‌কলে চাকরি করে ব'লে তারা এঁড়েদহে থাকে।

রা। তা'হলে সেই ছুঁড়ীই সুরেশকে তোমার সতীন-ঝীর সঙ্গে জুটিয়ে দিয়েছে; সে-ই এ বিয়ের ঘটক। সে-ই দেখছি তোমার সর্ব্বনাশ করেছে। তোমার সতীন-ঝীর এখন ছেলে-পিলে হলেই তোমার কপালে অষ্টরম্ভা!

রসিক বলিল—"আপনাকে এর একটা বিহিত কর‍্তেই হবে, না হলে আমরা ছাড়ছি নি। আপনি এত বড় উকিল; আপনি চেষ্টা করলে ঠাকরুণের এ বিপদ নিশ্চয়ই কাটিয়ে দিতে পারবেন।"

রা। দেখি কতদূর কি কর‍্তে পারি। যখন হিমিছুঁড়ী এসে ওদের সঙ্গে জুটেছে, তখন আমাকেও বেয়ে চেয়ে দেখতে হবে, অল্পে ছাড়া হবে না।

সু। আমি ত এখন সমস্ত সম্পত্তির মালিক? আমি ওদের বাগানবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব?

রসিক বলিল—"তাড়িয়ে দেবে কি ঠাকরুণ? তোমার নূতন জামাই সেখানে শিকড় গেড়ে বসেছে। বাগানের ভিতর এক বড় করোকেটের চালা খাড়া করে তার মধ্যে ওষুধ তৈরী করবার এক বৃহৎ কারখানা খোলা হয়েছে; সেখানে

দশ পনের জন লোক খাটছে। আমি নিজে আজ সেই কারখানা দেখে এসেছি। কত সব যন্ত্রপাতি আনিয়েছে। আমাকে কারখানার এই বই দিয়েছে।"

এই বলিয়া রসিক ন্তাশনাল্ ফার্ম্মাসিউটিকেল ওয়ার্ক্সের একখানি ক্যাটালগ্ রাধাবল্লভ বাবুকে দিল। সুলোচনা বলিল —"বল' কি সরকার মশাই? ওরা আমাকে বেদখল করে দেবে নাকি? কি বল' ঘোষ মশাই, বেটাবেটীদের বাগান-বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব?" রাধাবল্লভ বলিল—"না, ওদের তাড়িয়ে দিতে হবে না। ওরা নিজেরাই মরবার ফাঁদে পা দিয়েছে দেখছি।"

অতঃপর রাধাবল্লভ, সুলোচনা ও রসিক চুপে চুপে অনেক-ক্ষণ ধরিয়া কি পরামর্শ করিল। চলিয়া যাইবার সময় রাধা-বল্লভ রসিককে বলিল, "যেন এ সকল কথার এক বিন্দুও প্রকাশ না হয়; তা'হলে সকলেরই বিপদ!"

[৩]

পরিদর্শন।

আজ শনিবার। পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি মত সিভিল হস্পিটাল্সের ইন্স্পেক্টার জেনারেল সাহেব আজ বৈকালে ৪॥ টার সময় এঁড়ে-দহের ন্তাশনাল্ ফার্ম্মাসিউটিকেল ওয়ার্ক্স্ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। কারখানা পত্রপুষ্পে সুন্দররূপে সাজান হইয়া-

ছিল। কামারহাটির হাঁসপাতালের ডাক্তারবাবু গেটের নিকট স্থরেশের সঙ্গে উপস্থিত থাকিয়া সাহেবকে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং তাঁহাকে সসম্ভ্রমে কারখানার মধ্যে লইয়া গেলেন।

সমস্ত পরিদর্শনান্তে সাহেব স্থরেশকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, মাত্র আড়াই হাজার টাকার মূলধন লইয়া এই কারবার করা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, প্রথমে স্পিরিট ডিষ্টিলারী স্থাপন করিয়া তাহার মধ্যে ঔষধের ফ্যাক্টরী করিতে হয়। ডিষ্টিলারীর ভিতর টিঞ্চার, ক্লোরোফরম্, ঈথার প্রভৃতি তৈরী করিবার সময় যে স্পিরিট শুকৃতি বা অন্য রকমে নষ্ট হয়, তাহার মাশুল দিতে হয় না; স্থতরাং সে লোকসান গায়ে লাগে না। ইয়োরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্রই এইজন্য ডিষ্টিলারী ও কেমিক্যাল ল্যাবরেটারী এক সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। স্থতরাং বৈদেশিক মালের সঙ্গে দরে কম্পীট্ করিতে হইলে এদেশেও ঐরূপ ডিষ্টিলারীর মধ্যেই ঔষধের ল্যাবরেটারী স্থাপন করিতে হইবে। এরূপ করিতে হইলে ন্যূনকল্পে লক্ষ টাকার মূলধন আবশ্যক।

লক্ষ টাকা মূলধন যোগাড় করা তাহার সাধ্যাতীত, এই কথা বলিয়া স্থরেশ সাহেবকে নিবেদন করিল যে, তিনি যদি সরকারী হাঁসপাতালগুলির জন্য তাহাকে কোন কোন মালের ছোট ছোট অর্ডার দিয়া বাধিত করেন, তাহা হইলে সে ঐ সকল অর্ডার সপ্লাই করিতে করিতে ক্রমে কারখানা বাড়াইতে সক্ষম হইবে। সাহেব হাসিয়া বলিলেন, হাঁসপাতালগুলির জন্য এক এক বারে এক এক রকম টিঞ্চারই হাজার দু'হাজার

পাউণ্ড দরকার হয়; এ ছোট ফ্যাক্টরীতে তাহা তৈরী করাই অসম্ভব। বিশেষতঃ আগামী দুই বৎসরের জন্য অন্যান্য কোম্পানীর সঙ্গে সরকারী হাঁসপাতালগুলির আবশ্যকীয় ঔষধের কণ্ট্রাক্ট্ হইয়া গিয়াছে। এ দুই বৎসর পরে তিনি সুরেশকে কিছু কিছু অর্ডার দিতে পারিবেন এরূপ ভরসা দিলেন, এবং ইতিমধ্যে সে যাহাতে ফ্যাক্টরী বড় করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে বলিলেন।

সুরেশ অনুনয় সহকারে সাহেবকে জানাইল যে, কর্ত্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত ইহা সম্ভব নয়। তাঁহারা যদি কোনও বড় লোককে এই কারবারের অংশীদার হইতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে ইহাকে সহজেই বড় করা যাইতে পারে। এই কথায় সাহেব একটু চিন্তা করিয়া সুরেশকে বলিলেন, সে যেন একসপ্তাহ পরে তাঁহার সহিত আফিসে সাক্ষাৎ করে; তিনি ইতিমধ্যে মাননীয় চীফ্ সেক্রেটারির সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া দেখিবেন।

বিদায়কালে সুরেশ সাহেবের গলায় মালা এবং দুই হাতে বড় বড় দুইটি ফুলের তোড়া দিল। সাহেব খুসী হইয়া হাসিতে লাগিলেন।

[৪]

গেজেটের অপেক্ষা।

ইন্স্পেক্টার জেনারেলের চেষ্টায় সুরেশ সত্বর মাননীয় চীফ্ সেক্রেটারি সাহেবের নিকট হইতে উত্তরবঙ্গের এক বড় জমীদার বাবু গঙ্গাগোবিন্দ রায়ের উপর একখানি অনুরোধ-পত্র আদায় করিতে পারিয়াছিল।

সুরেশ এই পত্র লইয়া অবিলম্বে উক্ত জমীদার বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। গঙ্গাগোবিন্দ বাবু প্রায় কলিকাতাতেই থাকিতেন। তিনি সেক্রেটারি সাহেবের পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন, এবং পারিষদ্‌বর্গকে তাহা পড়িয়া শুনাইলেন। এই পত্রে মাননীয় চীফ্ সেক্রেটারি সাহেব তাঁহাকে সুরেশের কারবারের অংশীদার হইবার জন্য প্রকারান্তরে অনুরোধ করিয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ বাবু সুরেশচন্দ্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার কারবার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"এ কারবারের জন্য তোমার আপাততঃ কত টাকার আবশ্যক?"

সুরেশ বলিল—"ইন্স্‌পেক্টার জেনারেল অফ্ সিভিল হস্‌পিটাল্‌স বলেন যে, এ কারবারে প্রথমে লক্ষ টাকার মূলধন দরকার। পরে-পশ্চাতে আরও কিছু আবশ্যক হইতে পারে।"

গঙ্গাগোবিন্দ বাবু জানিতে চাহিলেন, এ কারবারে এক লক্ষ টাকা লাগাইলে কি রকম লাভ হইতে পারে। সুরেশ কাগজ কলম লইয়া সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিল, খরচখরচা বাদে ন্যূনকল্পে বার্ষিক শত করা পনের টাকা লাভ থাকিবে।

গঙ্গাগোবিন্দ বাবু বলিলেন—"আচ্ছা, আমার এ কারবারে টাকা দিতে মত আছে। বিশেষতঃ চীফ্ সেক্রেটারি সাহেব যখন অনুরোধ করেছেন, তখন ত আর কথাই নাই। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া আমার সম্মতি জানাইব। তুমি লাভের কি রকম অংশ নিয়ে সন্তুষ্ট হবে?"

সুরেশ বলিল—"আপনি টাকা দিয়া খালাস; আপনি

হবেন sleeping partner * মাত্র। আমাকেই working partner † হয়ে সমস্ত খাটাখাটুনি করিতে হবে। সুতরাং আপনার আপত্তি না থাকিলে আমি লাভের এক-তৃতীয়াংশ পাইতে ইচ্ছা করি।"

গঙ্গাগোবিন্দ বাবু স্বীকার করিলেন, ইহা অসঙ্গত প্রস্তাব নহে। তৎপরে সুরেশচন্দ্র প্রত্যহ তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিল। একমাস, দুইমাস, তিনমাস কাটিয়া গেল। এটর্ণির আফিস হইতে অংশনামার দলিলও প্রস্তুত হইয়া আসিল। কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দ বাবু তাহা রেজিষ্টারি করতঃ টাকা বাহির করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে কি জানি কেন বিলম্ব করিতে লাগিলেন। তিনি সুরেশকে নিত্য নূতন স্তোক-বাক্যে তুষ্ট করিয়া বিদায় দিতেন। ক্রমে সুরেশ অধৈর্য্য হইয়া পড়িতে লাগিল। একদিন বাবুর এক কর্ম্মচারী তাহাকে গোপনে বলিল, "বোধ করি আগামী ১লা জানুয়ারীর গেজেট না দেখিয়া বাবু কাজে নামিবেন না।" এই কথা শুনিয়া সুরেশ হতাশ হইয়া পড়িল।

এদিকে আর এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল। সুরেশের কারখানায় যে-কয়েক রকম ঔষধ প্রস্তুত হইত, বাজারে তাহাদের দর পাউণ্ড পিছু প্রায় তিন চার আনা করিয়া কমিয়া গেল। জার্ম্মানীর "জিহি এণ্ড সন্স্" কোম্পানীর মালই

* যে অংশীদার মূলধন যোগায় মাত্র; যিনি কারবারের খাটাখাটুনি করিতে বাধ্য নহেন।

† যে অংশীদারের উপর কারবারের খাটাখাটুনির ভার থাকে।

তখন কলিকাতার বাজারে খুব চলিত। এখানকার ন্যাশনাল্ ফার্ম্মাসিউটিকেল ওয়ার্ক্স্‌কে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত জার্ম্মান কোম্পানী এই চাল চালিয়াছিল। এই কোম্পানীর মত কম দরে সুরেশ মাল যোগাইতে পারিত না। ইহাতে তাহার মালের কাটতি কমিয়া গেল। সুরেশ দেখিল, তাহার মাল যাহা কিছু কাটিতেছিল তাহা কেবল স্বদেশী আন্দোলনের জোরে। দোকানদারেরা তাহাকে বলিত, "মশাই, আপনার স্বদেশী মাল ব'লেই আমরা বাজার দর অপেক্ষা বেশী দর দিয়েও আপনার মাল নিচ্চি। খরিদ্দারেরা আজকাল স্বদেশী মাল পেলে আর বিদেশী মাল চায় না।"

সুরেশ বুঝিল, স্বদেশী আন্দোলন যতই প্রবল হইবে ততই তাহার কারবারের মঙ্গল। সুতরাং সে অর্থে-সামর্থ্যে এই আন্দোলনের পোষকতা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। পরে এইরূপ শুনা গিয়াছিল যে, একা সুরেশচন্দ্রের চেষ্টায় ছয় মাসের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পঁচিশটি স্বদেশী সভা হইয়াছিল এবং চারিখানি 'স্বদেশী' পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছিল।

[৫]

স্বদেশী ভজহরি।

ঔষধ প্রস্তুতের কাজ শিখিবার জন্য কয়েকজন যুবক সুরেশের কারখানায় অ্যাপ্রেন্টিস্‌রূপে আশ্রয় পাইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ভজহরি দাস নামক একটি যুবক সকল কাজে বিশেষ দক্ষ ছিল।

পারুলের বিমাতা স্থলোচনার স্থপারিসে স্থরেশ তাহাকে কাজে ভর্ত্তি করিয়াছিল। ভজহরি বলিয়াছিল, সে রসিক সরকারের শালী-পো, নিবাস খুলনা জেলার অন্তর্গত সেনহাটি গ্রামে।

ভজহরি ভারি স্বদেশী ছিল। কারখানার ও গ্রামের যুবকদিগকে লইয়া সে একটি স্বদেশী সংকীর্ত্তনের দল গঠন করিয়াছিল। যেখানে কোনও স্বদেশী সভা হইত, ভজহরি তাহার সংবাদ পাইলে তাহার এই দল লইয়া সেখানে উপস্থিত হইত। কলিকাতার অনেক বিরাট স্বদেশী সভাতেও এঁড়ে-দহের স্বদেশী সংকীর্ত্তনের দল যোগ দিয়াছিল। এই দল যখন বাহির হইত, তখন ভজহরি মাথায় গৈরিকের পাগড়ী বাঁধিয়া, মালকোঁচা করিয়া কাপড় পরিয়া, বুকে পৈতার আকারে উত্তরীয় ঝুলাইয়া, হাতে ন্যাশনাল্ ফ্লাগ্ বা জাতীয় ধ্বজা ধরিয়া 'বন্দে মাতরং' শব্দে স্বর্গমর্ত্ত্য কাঁপাইয়া সকলের আগে আগে চলিত। ভজহরি কিছু হাঙ্গামাপ্রিয় থাকায় পথে দুই তিন দিন পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে তাহার বিবাদ বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল। স্থরেশ তাহার এইসকল হঠকারিতায় বাধা দিত বলিয়া ভজহরি সকলের কাছে বলিত, "স্থরেশবাবু বড় ভীরু ও কাপুরুষ।"

ভজহরির ভিতরে বিলক্ষণ রাজনৈতিক জ্ঞান ছিল, সে আপনাকে এক্স্ট্রিমিষ্ট্ বলিত। ভজহরি কলিকাতাতে তিলক ও গোখলে উভয়েরই বক্তৃতা শুনিয়াছিল। সে গোখলেকে এক্সট্রিমিষ্ট, এবং তিলককে মডারেট বলিত, যেহেতু গোখলের বক্তৃতা যেন তুবড়ীতে আগুন দেওয়া, আর তিলকের বক্তৃতা ন্যায় দর্শনের মধুরাবৃত্তি।

[৬]

ফাঁকা আওয়াজ।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রসাদাৎ সম্প্রতি সকল প্রকার স্বদেশী কারবারই জোরে চলিতেছিল। ন্যাশনাল্ ফার্ম্মাসিউটিকেল ওয়ার্ক্‌সের মালও এখন বিলক্ষণ কাটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু এই কারবারের মূলধন অল্প হওয়ায় দোকানদারেরা যেরূপ বড় বড় অর্ডার দিত, সুরেশ তাহা ওয়াদার মধ্যে প্রস্তুত করিয়া সপ্লাই করিতে পারিত না। ইহা লক্ষ্য করিয়া বড়বাজারের একজন দোকানদার তাহাকে বলিল, "সুরেশ বাবু! আপনি আরও কিছু টাকা কারবারে ফেলে কারখানাকে বড় করে নিন। এখন বাজারে আপনার মালের যেরূপ টান ধরেছে, তাতে ঠিক সময়ে মাল যোগান দিতে না পার্‌লে আপনাদের ক্রেড্‌িট্ নষ্ট হবে। কারবারের ক্রেডিট্ একবার গেলে আর সহজে হয় না।"

সুরেশের মনে রাজা গঙ্গাগোবিন্দ রায়ের কথা উদয় হইল। প্রায় ছয় মাস হইল সুরেশ আর তাঁহার সঙ্গে দেখা করে নাই। এখন তিনি রাজা খেতাব প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং এখন তাঁহার দ্বারা কাজ হইলেও হইতে পারে। এই ভাবিয়া পরদিনই সুরেশ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। রাজা বাহাদুরের এখন দিল্ দরিয়া। সুরেশ তাঁহাকে মাননীয় চীফ্ সেক্রেটারি সাহেবের সেই অনুরোধের কথা একটু স্মরণ

করাইয়া দিল, এবং বলিল যে এখন স্বদেশী আন্দোলনের জন্য বাজারে তাহার মালের বিলক্ষণ 'ডিমাণ্ড' হইয়াছে।

রাজা বাহাদুর সুরেশের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে অনেক রকম আলাপ করিয়া বলিলেন, "এইবার স্বদেশী কারবার-গুলি দাঁড়াইতে পারিবে বলিয়া আমার ভরসা হইয়াছে। আমি আগামী সপ্তাহে এই কারবারের জন্য আপাততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে পারিব। ইতিমধ্যে অংশনামার দলিলখানি রেজেষ্টারি হওয়া আবশ্যক। সেজন্য আগামী সোমবার তুমি আহারাদি করিয়া বেলা ১২টার মধ্যে এখানে আসিবে।" সুরেশচন্দ্র হর্ষোৎফুল্ল মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পারুলকে এই সংবাদ দিল। অর্দ্ধাঙ্গিনী স্বামীর হর্ষ-বিষাদেরও অর্দ্ধেক অংশীদার। ভগবান স্বহস্তে এই অংশনামার দলিল লিখিয়া দিয়াছেন।

সুরেশ কল্পনার তাঁতে তাহার কারবারের ভবিষ্যৎ বয়ন করিতেছিল। অতি উৎকৃষ্ট জিনিসই এই তাঁতে বোনা হইয়া থাকে। আর এক সপ্তাহের মধ্যেই রাজা গঙ্গাগোবিন্দ রায় তাহার কারবারে টাকা দিবেন। তখন তাহার ন্যাশনাল্ ওয়ার্ক্‌স্ দেশের একটি আদর্শ কারখানা হইয়া দাঁড়াইবে। তাহার আগামী বাৎসরিক উৎসবের সময় ছোটলাট বাহাদুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইবে; এবং গভর্ণমেণ্টের আবকারি বিভাগ হইতে যাহাতে সত্বর প্রাইভেট্ ডিষ্টিলারী স্থাপন করিবার লাইসেন্স্ পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। সুরেশ এইরূপ আকাশ-কুসুম রচনা করিতেছিল।

এমন সময় অকস্মাৎ এনার্কিষ্টদিগের বোমা ফাটিয়া সকল দিকে বিভ্রাট বাধাইয়া দিল। একটা ভয়ানক আওয়াজ না করিয়া বোমা ফাটে না। ইহার আওয়াজ টেলিগ্রাফের তার ধরিয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছড়াইয়া পড়ে। বোমার আওয়াজের দৌড় অনেকদূর পর্য্যন্ত হইলেও, তাহা যে ফাঁকা আওয়াজ, তাহা সকল ধীর চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করিয়া থাকেন। এনার্কিষ্টদিগের বোমার আওয়াজে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উড়িল না, কারণ তাহা তত হাল্‌কা সামগ্রী নহে। কিন্তু তাহাতে বয়কট্ নামক বস্তুটি একেবারে ধূলি হইয়া উড়িয়া গেল। চারিদিকে খানাতল্লাস ও ধরপাকড় আরম্ভ হইল; ‘বন্দে মাতরং’ ধ্বনি স্তব্ধ হইয়া গেল; স্বদেশীর স্রোত মন্দীভূত হইয়া আসিল; এবং শান্তিপ্রিয় সমাজের রাজভক্তি মুখর ও মূর্ত্তিমান হইয়া চতুর্দ্দিকে রাজশক্তির পোষকতায় দণ্ডায়মান হইল। এনার্কিষ্টদিগের উপদ্রবে সকল দেশের গভর্ণমেণ্ট এইরূপ লাভবান হ'ন। কিন্তু এই উপদ্রবে অনেক স্থলে অনেক নিরীহ লোকের ক্ষতি হইয়া থাকে। প্রমাণ, আমাদের সুরেশচন্দ্র ও তাঁহার এঁড়েদহের কারবার। বোমার আওয়াজে সুরেশের সর্ব্বশরীরের শোণিত চমকাইয়া উঠিল। তাহার ভয় হইল পাছে রাজা গঙ্গাগোবিন্দ রায় ভীত হইয়া পিছাইয়া যান।

ভজহরির কুচক্র।

ভজহরি প্রকাশ্যভাবে এনার্কিষ্টদিগের সকল দৌরাত্ম্যের সমর্থন করিত এবং বলিত, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"। নন্দলালদের বাড়ীতেও তার গতিবিধি ছিল। হেমাঙ্গিনীর ভিতর খুব স্বদেশীভাব আছে বুঝিতে পারিয়া ভজহরি একদিন তাহার নিকট গোপনে স্বীকার করিয়াছিল যে, ইতিপূর্ব্বে ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার মধ্যে সে এনার্কিষ্টদের সঙ্গে অনেক কাজ করিয়াছিল। সেখানকার দল স্বদেশী ডাকাতির অপরাধে ধরা পড়ায় তাহাকে পালাইয়া আসিতে হইয়াছে। ভজহরি আরও বলিয়াছিল, কৃষ্ণনগরে তারিণী বেওয়ার বাড়ীতে তাহার এক মাতুল থাকে, তাহার নাম প্রেমচাঁদ কড়ারি। তাহার ঐ মামা পুলিশের গোয়েন্দা জানিতে পারিয়া ভজহরি তাহার সহিত দেখাশুনা করা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে সে কৃষ্ণনগরে হামেষাই যাইত।

ইতিমধ্যে সুরেশের সন্দেহ হইয়াছিল যে, ভজহরি তাহার কারখানার কয়েকজন যুবককে লইয়া গোপনে একটি এনার্কিষ্ট দল গঠন করিবার চেষ্টায় আছে। এজন্য সুরেশ তাহার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেছিল।

একদিন ঝুমন্ পারুলের কাছে বলিল, "আজ ভজহরি বাবু কারখানায় ভারি এক বাজী করেছিল। সে কল'কাতা থেকে তিন চার রকম মসলা এনে, তাই দিয়ে একরকম পট্‌কা

বানিয়েছিল। সেই পট্‌কা ছোড়্‌বার সময় ঠিক বন্দুকের মত আওয়াজ হয়েছিল।"

সুরেশ সেদিন কলিকাতায় গিয়াছিল। সে রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া পারুলের কাছে এই কথা শুনিল। শুনিয়া পরদিন প্রাতে ভজহরিকে ডাকাইয়া ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিল। ভজহরি বলিল, "আমার কাছে High Explosivesএর * একখানি বই আছে। আমি তাই থেকে একটি এক্স্‌পেরিমেণ্ট করেছিলাম মাত্র।"

সুরেশ। তুমি এ বই কোথায় পেলে?

ভজ। এক হকারের দোকানে খরিদ করেছিলাম।

সুরেশ। এ বই খরিদ কর্‌বার উদ্দেশ্য কি?

ভজ। তা'তে কি দোষ হয়েছে? আপনি সামান্য বিষয়ে এত ভয় পান কেন?

সুরেশ বুঝিল, এরূপ লোককে আর স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক, সে বিনা বিবাদে ভজহরিকে কারখানা হইতে বিদায় করিয়া দিল। চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে ভজহরি সুরেশের নিকট হইতে তাহার শিক্ষানবীশীর একখানি ভাল সার্টিফিকেট্ আদায় করিয়াছিল।

* উচ্চশক্তির বিস্ফোরক।

[৮]

সার্চ্চের পরিণতি।

আজ সোমবার স্থরেশের রাজা গঙ্গাগোবিন্দ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কথা। কিন্তু অতি প্রত্যূষে প্রায় পঞ্চাশজন পুলিস আসিয়া তাহার কারখানা ও বাড়ী ঘেরাও করিল। সংবাদ পাইয়া স্থরেশ বাহিরে আসিল। ইন্স্‌পেক্টার বাবু তাহাকে বলিলেন, "আমরা আপনার ঔষধের ফ্যাক্টরী ও বাড়ী সার্চ্চ করিতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি সার্চ্চ-ওয়ারেণ্ট দেখাইলেন।

পুলিসের সঙ্গে ভজহরি আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্য হইল। ভজহরি বলিল, "পুলিস আমাকে তল্লাসীর সাক্ষী করিয়া আনিয়াছে, আমি স্বইচ্ছায় আসি নাই।" পাঁচ ছয় ঘণ্টা ধরিয়া সমস্ত কারখানা, বাড়ী ও বাগান তন্ন তন্ন করিয়া সার্চ্চ করা হইল। স্থরেশের মনে পাপ ছিল না। সে তল্লাসীতে সরলভাবে সাধ্যমত সহায়তা করিতে লাগিল। কোথাও একরতি পিক্রিক্ অ্যাসিড্ বা ক্লোরেট্ অফ্ পটাশ্ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইল না।

তল্লাসীর শেষে স্থরেশ কাতর কণ্ঠে ইন্স্‌পেক্টার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কি অপরাধে এই সার্চ্চ হইল?" তিনি বলিলেন, "আপনার কারখানায় বোমা তৈরী হয়, এই মর্ম্মে আমাদের কাছে চিঠি আসিয়াছিল। আপনি কিছু মনে

করিবেন না। আমি রিপোর্ট করিব যে, এখানে কিছুই পাওয়া যায় নাই।" সার্চ্চের সময় ইন্‌স্‌পেক্টার বাবু বরাবর বিশেষ ভদ্র ব্যবহার করিয়াছিলেন।

সার্চ্চ-পার্টির সঙ্গে সংবাদপত্রের একজন রিপোর্টার আসিয়াছিল। সুরেশ তাহাকে চিনিত; অনেক স্বদেশী সভায় সে তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছিল। পুলিস চলিয়া যাইবার সময় সুরেশ তাহাকে ডাকিয়া তাহার হাতে একখানি দশ টাকার নোট দিয়া বলিল, "আপনি এই নোটখানি রাখুন। দেখিবেন যেন খবরের কাগজে এই সার্চ্চের কোনও রিপোর্ট বাহির না হয়; তাহা হইলে আমার কারবারের বিশেষ ক্ষতি হইবে।" রিপোর্টার স্বীকৃত হইল। কিন্তু পরদিন সুরেশ দেখিল, সকল সংবাদপত্রেই এই সার্চ্চ সম্বন্ধে নানাপ্রকার রংদার রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। ইহাতে তাহার বড়ই লজ্জা বোধ হইল। সে সংবাদপত্রে লিখিয়া পাঠাইল যে, কোনও দুষ্ট লোক উড়া চিঠি দেওয়ায় এই সার্চ্চ হইয়াছিল, এজন্য সে বা পুলিস, কোনও পক্ষই দোষী নহে।

লজ্জা ও দুশ্চিন্তায় এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইল। তৎপরে সুরেশ একদিন রাজা গঙ্গাগোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল। রাজা বাহাদুর খবরের কাগজে তাহার কারখানা ও বাড়ী সার্চ্চের কথা পড়িয়া সেইদিনে তখনি বলিয়াছিলেন, "ওঃ! ভগবান আমায় রক্ষা করেছেন!" আজ সুরেশকে দেখিয়া তিনি কম্পান্বিত কলেবর হইলেন, এবং বিনা আলাপে তাহাকে সত্বর বিদায় করিলেন। তৎপরে তিনি দ্বারবানদিগকে

ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যেন ভবিষ্যতে তাহাকে আর বাড়ীতে ঢুকিতে দেওয়া না হয়।

কাউন্সিলের একজন অনারেবল্ মেম্বার ন্যাশনাল্ ফার্ম্মাসিউটিকেল্ ওয়ার্ক্সের এই খানাতল্লাস সম্বন্ধে একদিন বেঙ্গল কাউন্সিলে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উত্তরে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বলা হইল যে, পুলিস কর্ত্তৃক প্রাপ্ত কোনও সংবাদ-বিশেষের জন্য এই সার্চ্চ আবশ্যক হইয়াছিল।

সার্চ্চের পর হইতে ন্যাশনাল্ ফার্ম্মাসিউটিকেল্ ওয়ার্ক্সের অবস্থা একপ্রকার 'যাদশাপন্ন' হইয়া দাঁড়াইল। কলিকাতার বড় বড় খরিদদারেরা এই ফ্যাক্টরীর মাল লওয়া বন্ধ করিল। তাহাদের মধ্যে একজন সুরেশকে বলিল, "না মশাই, কোন্ দিন আপনার মালের সঙ্গে বোমা এসে হাজির হবে! রক্ষা করুন, আপনার মালে আমাদের দরকার নাই।" যে সকল দোকানে তাহার মাল সপ্লাই হইত, সুরেশ এখন সেখানে গেলে আর পূর্ব্বের মত খাতির পাইত না। কোন কোন দোকানদার তাহার সহিত পারতপক্ষে কথাই কহিত না। একজন দোকানদার তাহাকে বলিয়াছিল, "আমরা মালের জন্য আপনাকে পত্র না লিখিলে আপনার আর আসিবার দরকার নাই।" সুরেশ বুঝিল, সে তাহাদের ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কয়েকমাস এইরূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া ও লোকসান দিয়া সুরেশ অবশেষে কারখানা বন্ধ. করিয়া দিল।

অন্তর্ঝঞ্ঝা।

সসীম মনুষ্যের মধ্যে যে প্রাণ-বস্তু আছে, তাহা অসীম অনন্ত। কূলকিনারারহিত সমুদ্রের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। নৈরাশ্যের কাল মেঘ ও বিক্ষোভ বায়ু মিলিয়া কখন কখন এই সমুদ্রে তুমুল ঝটিকার সৃষ্টি করে; তাহাতে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনার তরি নিমজ্জিত হইয়া যায়। উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল এই সমুদ্রে নিত্য কত আশাপোত ভাসিতেছে ডুবিতেছে, কে তাহার গণনা করিবে? আবার এই সমুদ্রে কখন কখন কামক্রোধাধি ষড়রিপুর ভীষণ নৌযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

সম্প্রতি সুরেশের প্রাণ-সমুদ্রে এইরূপ একটা তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল। আজ সাত দিন হইল সে বিধুভূষণের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়াছে। পত্রখানি এই,—

"ভাই সুরেশ!

আজ একমাস হইল আমি কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমি এতদিন কোথায় ছিলাম, তাহা তোমাদের জানিয়া কাজ নাই। তোমার বিবাহের সংবাদ আমি সংবাদপত্র পাঠে অবগত হইয়াছিলাম। ভাই! তুমি নিশ্চয়ই মনে করিয়াছিলে, গৃহী হইয়া জীবনে বিশেষ শান্তিভোগ করিবে। আমার ভয় হইয়াছিল, পাছে তুমি পারিবারিক শান্তির ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িয়া জননী জন্মভূমির দুঃখ ভুলিয়া যাও।

সুরেশ! তোমার বড়ই ভুল হইয়াছিল। পরমুখাপেক্ষী বঙ্গ-

সন্তানের শান্তি কোথায়? আমি উদরস্থ সুখের রোমন্থনকে শান্তি বলি। যাহারা অন্নাভাবে জঠরজ্বালায় অস্থির, শান্তির আশা করা তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা। তাই আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনে অশান্তিকে চিরসখারূপে আলিঙ্গন করিয়াছি। এ জগতে যাহারা অন্নাভাবে অশান্ত, তাহারাই জীবিত; আর যাহারা অনশনের মধ্যে শান্তি উপভোগ করে, তাহারা মৃত।

যেদিন খবরের কাগজে পড়িলাম তোমার কারখানা সার্চ্চ হইয়াছে, সেই দিন বুঝিলাম তোমার চৈতন্য উৎপাদনের জন্য ভগবান্ তোমার পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়াছেন। এদেশে স্বাধীন ব্যবসায়ের পথ যে কতদূর উন্মুক্ত, আশা করি তাহা এখন তুমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছ।

আমি অজ্ঞাতবাসে থাকিয়াও তোমার উচ্চ রাজপুরুষদিগের নিকট যাতায়াত এবং তাঁহাদের অনুগ্রহ প্রার্থনার খবর রাখিয়াছিলাম। সুরেশ! তোমার কি এখনও বুঝিতে বাকী আছে যে এ রাজ্যের একজন রাজা নয়,—বহুবচনে বলিতে গেলে ইহার অসংখ্য রাজা আছে? তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে সংহারকারী শঙ্কর যাহাকে ধ্বংস করিবেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু আসিয়াও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

তোমার কারখানার সার্চ্চ সম্বন্ধে বেঙ্গল কাউন্সিলে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। ইহাকে বলে 'বৈধ আন্দোলন'। এই আন্দোলনের এমন কোনও ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে কি, যদ্দারা তাহা absolute* রাজশক্তিকে প্রকৃত প্রজামুখাপেক্ষী করিতে

* সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরঙ্কুশ।

পারে? Autocratic † সম্রাট্ যাহা এক হাতে দান করেন, তাহা ইচ্ছামাত্র অপর হাতে কাড়িয়া লইতে পারেন; প্রজারা বৈধান্দোলনের দড়ি দিয়া তাঁহার হাত পা বাঁধিতে পারে না। তবে ভরসা এইমাত্র যে, স্বেচ্ছাচারী রাজাদের স্বাস্থ্য ভাল হইবার কথা নয় বলিয়া তাঁহারা দীর্ঘজীবী হন না—তাঁহাদের তিরোধানে প্রজাবৃন্দ নিষ্কৃতি লাভ করে।

দেখ সুরেশ! মুকুট ও রাজদণ্ডকেও মনুষ্যত্বের তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখিতে হইবে। অন্ধভক্তি কোন দিনই মুক্তির কারণ হয় না। মুক্তির জন্য চাই আত্ম-বলিদান! অভাবনীয় আত্ম-বলিদানের দৃশ্যে লোকারণ্য স্তম্ভিত হয়! তাহার দেবত্বের বিদ্যুৎজ্বালায় সাধারণের চক্ষু ঝলসিয়া যায়। ভাই সুরেশ! আমাদের মৃন্ময়ী মা তোমাকে ত্যাগ-মার্গে আহ্বান করিতেছেন। ত্যাগই গৌরবের সুবর্ণমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা।

তোমার চিরসুহৃদ্

শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ।”

এই পত্র পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া সুরেশের প্রাণে যে ঝড় উঠিয়াছিল, তাহাতে তাহার রাজভক্তির অর্ণবপোত নঙ্গর ছিঁড়িবার উপক্রম করিতেছিল। তাহার ধারণা হইল যে, এ দেশে বৈধান্দোলনে সংবাদপত্রের কলেবর পূরণ ভিন্ন আর কিছুই ফল দর্শে না। পরাধীন জাতির শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি-চেষ্টা যে রাজনৈতিক অপঘাতে নষ্ট হইতে পারে, সুরেশ তাহার

† স্বেচ্ছাচারী।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছিল। সে স্থির করিল, সর্ব্বত্র রাজভক্তির সঙ্গে দেশভক্তির সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না।

নৈরাশ্যের ভিতর দিয়া যে সন্ধানের অনুভূতি হয়, তাহার প্রভাব অত্যন্ত অধিক। এই প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া সুরেশ সত্বর কতকগুলি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার মধ্যে ছিল ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, ম্যাটসিনির জীবনচরিত, আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিবৃত্ত, এবং রাশিয়ার নিহিলিষ্ট ও এনার্কিষ্টদিগের কাহিনী। অপক্ক বয়সে এই সকল বই পড়িলে যাহা হয়, সুরেশের তাহাই হইল—তাহার মাথা কিছু গরম হইয়া উঠিল।

এই সময়ে পঞ্চানন বাবু একদিন এঁড়েদহে নন্দলালদের দেখিতে আসিলেন। জুট মিল বন্ধ না হইলে নন্দলাল বাসায় ফিরিবে না ভাবিয়া তিনি সুরেশদের বাড়ীতেই স্নানাহারের বন্দোবস্ত করিলেন। সুরেশও তাঁহাকে এজন্য অনুরোধ করিয়াছিল।

[১০]

রাজনৈতিক বিতণ্ডা।

পাঁচুমামার সহিত 'স্বদেশী' কথোপকথন করিবার সময় সুরেশ বার বার 'রিভলিউশন' শব্দটি ব্যবহার করিতে লাগিল, এবং বলিল যে রিভলিউশন হচ্চে লোহিত সাগর পার হওয়া।

সুরেশের কথা শুনিয়া পঞ্চানন বাবুর চক্ষু স্থির হইল। তিনি বুঝিলেন, তাহার মাথায় সাংঘাতিক বস্তু ঢুকিয়াছে। বলিলেন, "সুরেশ! রিভলিউশনের মানে তুমি কী বুঝিয়াছ?" সুরেশ বলিল, "রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রজাশক্তির অভ্যুত্থান।"

প। তাহা হইলে দেখিতেছি রিভলিউশন অর্থে তুমি play of sword* বুঝিয়াছ। আমি তাহা বুঝি না। আমার মতে, অতীত যেখানে জোর করিয়া বর্ত্তমানের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া থাকে, সেখানে অনিবার্য্য ভবিষ্যৎ সবেগে আসিয়া তাহাকে হটাইয়া দিবার জন্য যে সংঘর্ষ উপস্থিত করে, তাহারই নাম রিভলিউশন। রিভলিউশন বলিতেই যে কাটাকাটি মারামারি বুঝিতে হইবে এমন নহে। Bloodless বা রক্তপাতবর্জ্জিত রিভলিউশনও হইতে পারে।

সু। প্রজাবিদ্রোহ ও রাষ্ট্রবিপ্লবে রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী। ফরাসী বিপ্লবে রক্তের নদী বহেছিল।

প। সেজন্য ফরাসী বিপ্লব জগতের ইতিহাসে চিরদিন নিন্দনীয় হয়ে আছে। আর, যে সময়ে ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন হয়েছিল, সে সময়ে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ মেশিন-গাণ্ প্রভৃতি ছিল না। তখনকার সম্রাটদের জ্ঞানবুদ্ধিও আধুনিক গভর্ণমেণ্টের মত তীক্ষ্ণ ছিল না। প্রাচীনকালের সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে প্রপীড়িত প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হইয়া রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইতে পারিত বটে; কিন্তু পৃথিবীর আধুনিক বড় বড় সামরিক সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে এখন আর প্রজাবিদ্রোহ বড় একটা সফলতা লাভ

* তলোয়ার খেলা।

করিতে পারে না। কেবল বৃটিশ সাম্রাজ্য কেন, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইটালী ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মধ্যে কোনও স্থানে প্রজাবিদ্রোহ ঘটিলে গভর্ণমেণ্ট তাহা এখন সহজেই দমন করিতে পারেন। এই সকল সাম্রাজ্যের গভর্ণমেণ্ট একটা high intellectual plane *-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইলে কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার বিরুদ্ধে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকৃষ্ট উপায়সকল বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত প্রয়োগ করিতে থাকেন; তাহাতে বিপ্লব সত্বর হীনবল হইয়া নষ্ট হয়। আমার বিশ্বাস যে, ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডি পরলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়াও এখন এইসকল সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রজাবিদ্রোহ সফল করিতে পারিবেন না। আর একটি বিশেষ কথা আছে। বর্ত্তমান যুগে এই সকল সাম্রাজ্যের মধ্যে political espionage†-এর ব্যাপারকে একটি perfect science ‡ করিয়া তোলা হইয়াছে। সেকারণে যেসকল নেতা প্রজাবিদ্রোহ ঘটাইবার জন্য তলে তলে চেষ্টা করে, তাহাদের কোন কাজই এখন গভর্ণমেণ্টের কাছে লুকান থাকে না; সুতরাং বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বেই ঐসকল লোক কারাগারে আবদ্ধ হয়। কোনও আধুনিক বৃহৎ সাম্রাজ্যের কোনও স্থানে বিদ্রোহের কারণ ও সুযোগ উপস্থিত হইলেও, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে উপযুক্ত লোক-

* জ্ঞান বুদ্ধির উচ্চ স্তর।

† রাজনৈতিক চরতন্ত্র।

‡ সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণ বিজ্ঞান।

নায়কের অভাব হয়, ইহাই তাহার কারণ। একটা যে কথা আছে—with the hour will come the man §—সে কথা আর এখন সর্ব্বত্র খাটে না।

পঞ্চানন বাবুর কথা শুনিয়া সুরেশ কিছু হতাশ হইয়া পড়িল। বলিল—"তবে কি আমাদের স্বরাজলাভের কোনও আশা নাই?"

পঞ্চানন বাবু বলিলেন—"কেন থাকিবে না? অবশ্য আছে। রিভলিউশনের দ্বারা আমাদের স্বরাজলাভের আশা নাই। তবে শাসনবিষয়ক ধারাবাহিক পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া আমরা অল্পে অল্পে ঐ বস্তু পাইতে পারি। আবার হয়ত অভাবনীয় আন্তর্জাতিক ঘটনা-পরম্পরার ঘাতপ্রতিঘাতে ভারতশাসনের বর্ত্তমান পদ্ধতি ক্রমে বদলাইয়া যাইতে পারে। আজ জাপানের সঙ্গে ইংলণ্ডের মিত্রতা আছে। যদি অদূর ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধের বিপর্য্যয় ঘটে, অথবা যদি বিরাট চীন সাম্রাজ্য কিছুকালের মধ্যে একটী powerful democratic republic * হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহার সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সংঘর্ষের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে চল্লিশ কোটি চীনবাসীকে ঠেকাইবার জন্য ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর হাতে দেশরক্ষার ভার অকাতরে ছাড়িয়া দিতে হইবে। তখন আবশ্যক হইলে ভারতের প্রজাপুঞ্জের মধ্যেও conscription † করিতে হইবে। সেইদিন ভারতবাসী সমান স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া ইংরাজকে যথার্থ ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিবে।

§ সময় আসিলে আবশ্যকমত লোকও আসিয়া জুটিবে।

* প্রজাসাধারণের শক্তিশালী প্রজাতন্ত্র।

† রাজ্যের সকল কর্ম্মঠ পুরুষকে সৈনিক হইতে বাধ্য করিবার আইন।

সেইদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নামও পরিবর্ত্তিত হইয়া হয়ত ইণ্ডো-ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইবে। আমরা এই বিশ্বব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তমাংশের অধিকারী। কতকগুলি অদূরদর্শী লোকের সংকীর্ণ-তার জন্য আমরা সম্প্রতি এই অধিকারে বঞ্চিত হইয়া আছি। তাই বলিয়া এই সুন্দর সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যের ন্যায্য অংশের উপর আমাদের দাবীদাওয়া ছাড়িয়া দিব কেন? এই দাবী ধরিয়া থাকিলে একদিন না একদিন নিশ্চয়ই আমাদের ঈশ্বর-দত্ত অধিকার লাভ করিতে পারিব। দেখ সুরেশ! ইংরেজ বুদ্ধিমান পণ্ডিতের জাতি। 'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।' তেমন দিন আসিলে তাহারা আমাদের হাতে সাম্রাজ্যের অর্দ্ধেক স্বত্বাধিকার ছাড়িয়া দিবে। ইংরেজ জাতি আবশ্যক হইলে না করিতে পারিবে এমন কর্ম্ম নাই।"

সুরেশ পাঁচুমামাকে বিধুভূষণের পত্রখানি দেখাইল। তিনি তাহা পড়িয়া বলিলেন—"কি সর্ব্বনাশ! বিধুভূষণ দেখছি এক-দিন এনার্কিষ্ট হয়ে দাঁড়াবে। তার ভবিষ্যৎ ভাবিতে আমার হৃদ্‌কম্প হয়।"

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, এনার্কিষ্টদের দ্বারা কি কিছু কাজ হচ্চে না?"

প। হাঁ, কাজ হচ্চে বৈ কি? দেশে সি আই ডি পুলিশের কাজ অত্যন্ত বেড়ে গেছে। অবিশ্বাসের একটা প্রকাণ্ড কাল মেঘ এসে সমস্ত সমাজ ছেয়ে ফেলেছে; এখন কেউ কাউকে বিশ্বাস করে মনের কথা খুলে বলতে পারে না। বক্তাদের স্পষ্টভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করবার সাধ্য

নাই। লেখকদের লেখার স্বাধীনতা ঘুচে গেছে। Deportation without trialএর যুগ এসে পড়েছে। কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহদৃষ্টিতে আমাদের জাতীয় উন্নতির চেষ্টাগুলি পূর্ব্বের ন্যায় সাফল্যলাভ করতে পাচ্ছে না। সমাজের মধ্যে শঠতা ও স্বার্থপরতা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। সুরেশ, তুমি জান কি, এই রাজনৈতিক অশান্তির দিনে কত লোকে রাজভক্তির ব্যবসা চালিয়ে কত রকমে আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করছে? এনার্কিষ্ট যুবকদের উপদ্রবের ফল আর কত বল্‌ব?

সু। যাদের এনার্কিষ্ট বলা হয়, তাদের অনেকেই ত শিক্ষিত যুবক। তারা কি বাস্তবিক এনার্কিষ্ট? অরাজকতাই কি তাদের চরম লক্ষ্য?

প। কিন্তু এই সকল পথভ্রষ্ট যুবকদের উপদ্রবে দেশে কে অরাজকতা এসে পড়ছে। সুরেশ! বোমা, গুপ্তহত্যা আর লুটতরাজের সাহায্যে স্বরাজ লাভ করা যায় না। এতে অনর্থক কেবল রাজপুরুষদের ক্রোধ, আর দেশের লোকের নিগ্রহ বেড়ে যায়।

সুরেশ চিন্তা করিতে লাগিল। পাঁচুমামা বলিলেন—"বিলাতের প্রসিদ্ধ ষ্টেড্ সাহেব বলে গেছেন, 'The bomb has failed in Russia; it will fail in India as well.' †

---

* বিনা বিচারে নির্ব্বাসন।

† রাশিয়াতে বোমা ব্যর্থ হইয়াছে; ভারতবর্ষেও তাহাই হইবে।

[১১]

জবাব।

সুরেশের জন্ত পঞ্চানন বাবু চিন্তিত হইলেন না। তাঁহার বিশেষ চিন্তা বিধুভূষণের জন্ত। তিনি জানিতেন, পারুলকে বিবাহ করিয়া সুরেশ বাঁধা পড়িয়াছে। যাহার প্রেমের বস্তু মিলিয়াছে, সে আর সহজে মরণের পথে পদার্পণ করিতে পারিবে না। বিধুভূষণ কিন্তু দারপরিগ্রহ করে নাই। বিশেষতঃ, যে-সকল দোষ বা গুণ থাকিলে শিক্ষিত যুবক এনার্কিষ্ট হয়, বিধুভূষণের ভিতর তাহার সকলগুলিই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

পঞ্চানন বাবু সুরেশকে বলিয়াছিলেন, "তোমাকে বিধুভূষণের চিঠির জবাব দিতে হইবে না; আমি তাহার জবাব দিব।" তাই তিনি নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়া বিধুভূষণের নামে কৃষ্ণনগরের ঠিকানায় পোষ্ট করিয়া দিলেন;—

"প্রিয় বিধুভূষণ!

তুমি সুরেশকে যে পত্র লিখিয়াছিলে তাহা আমি দেখিয়াছি; এবং সে সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে তাহা তোমাকে এই পত্রে লিখিয়া জানাইতেছি।

প্রথম ও প্রধান কথা এই যে, রাশিয়ার গভর্ণমেণ্টের মত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। সুতরাং এই গভর্ণমেণ্টের সহিত শত্রুতা বা চিরবিরোধ করা সঙ্গত হইবে না। শাসন-যন্ত্রের মধ্যে আমাদের অধিকার

ক্রমশঃ বাড়াইতে হইবে; তাহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে আমাদিগকেই পরিণামে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে।

আমি স্বীকার করি, সম্প্রতি রাজপুরুষেরা স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি তাদৃশ সহানুভূতি দেখাইতেছেন না। কিন্তু একদিন এদেশে জার্ম্মাণীর শিল্পবাণিজ্যবিস্তার রোধ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যের পৃষ্টপোষক হইতে হইবে। আমাদিগকে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় থাকিতে হইবে, অধীর হইলে চলিবে না।

বৈধান্দোলনের উপর তোমার এত বিতৃষ্ণার কারণ কি? বৈধান্দোলনমাত্রেই ভিক্ষাবৃত্তি নহে। বৈধান্দোলনের বিপরীত হচ্চে anarchism and terrorism *। রাশিয়ার বিখ্যাত পেট্রিয়ট্ ষ্টেপ্‌নিয়াক্ তাঁহার প্রথম বয়সে terrorismএর খুব সমর্থন করিতেন। তাঁহার Underground Russia † ও অন্যান্য গ্রন্থে তিনি বোমা ও রাজনৈতিক গুপ্তহত্যার পোষকতা করিয়া অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে রাশিয়া হইতে ইংলণ্ডে পালাইয়া আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরিণত বয়সে জ্ঞান-বুদ্ধি পরিপক্ক হইয়া আসিলে ষ্টেপ্‌নিয়াকের এই মত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। তাঁহার শেষজীবনে লিখিত King Log and King Stork নামক গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন,—

Terrorism is the worst of all revolutionary warfare; and there is only one thing that is

* অরাজকতা ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড।

† ভূগর্ভস্থ রাশিয়া।

worse still—slavish submissiveness and the absence of any protest. We could not look upon the revival of it than as a disgrace for Russia. Yet it would be a worse disgrace for Russia if she is not able to produce by way of protest anything stronger than terrorism. Now there is only one means of preventing the possibility of such an outburst, and of turning to good account popular movements when they begin. It is for the whole of the Liberal Opposition to avail itself of the present temporary lull, and by broad and energetic action to compel the unsettled Government to change the drift of its politics.*

* ভাবার্থ,—বিপ্লবের যতকিছু অস্ত্র আছে, তম্মধ্যে গুপ্তহত্যা হচ্চে সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য। কিন্তু এর চেয়েও জঘন্য হচ্চে গোলামের দাস্তভাব ও সকলপ্রকার প্রতিবাদ-বর্জ্জন। গুপ্তহত্যার পুনরভিনয়কে আমরা নিশ্চয়ই রাশিয়ার পক্ষে কলঙ্ক বলিয়া বিবেচনা করিব। গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপে যদি ইহা অপেক্ষা আর কোনও অধিক শক্তিশালী উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে আরও কলঙ্কের কথা। এখন উদারনৈতিকগণ যদি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া শাসনপদ্ধতির ধারা পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলেই গুপ্তহত্যার পুনরভিনয় নিবারিত হইবে এবং প্রজাদিগের আন্দোলনও কিয়ৎপরিমাণে সার্থক হইবে।

ইটালীর উদ্ধারকর্ত্তা ও ইয়ং ইটালী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জোসেফ্ ম্যাটসিনিকে তুমি নিশ্চয়ই গুরুর মত শ্রদ্ধা কর। ম্যাটসিনি তাঁহার আত্মজীবন বিবরণীর মধ্যে লিখিয়া গিয়াছেন,—

I abhor—and all those who know me well know that I abhor—bloodshed and every species of terror erected into a system, as remedies equally ferocious, unjust, and inefficacious against evils that can only be cured by the diffusion of liberal ideas. I believe that all ideas of vengeance or expiation, as the basis of a penal code, are immoral or useless, whether applied by individuals or by society.

YOUNG ITALY while repudiating the vindictive formulæ and customs of Carbonarism, abolished all threats of death against traitors.

To all those, who proposed to us the destruction of spies or traitors, we replied: 'Let the Judas be made known; the infamy will be punishment enough'. *

* ভাবার্থ—"আমি রক্তপাত ও গুপ্তহত্যাতন্ত্রকে ঘৃণা করি। যাহারা আমাকে ভালরকম জানে তাহাদের কাছে আমার এই মত অবিদিত নহে। একমাত্র উচ্চ উদার ভাবের প্রচার দ্বারা যে ব্যাধির আরোগ্য সম্ভব, এই-

আশা করি, এই দুই খ্যাতনামা ব্যক্তির মত পাঠ করিয়া তোমার মতের পরিবর্ত্তন হইবে।

তুমি লিখিয়াছ, মুকুট ও রাজদণ্ডকে মনুষ্যত্বের তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখিতে হইবে। তোমার একথা নিতান্ত সত্য। কিন্তু রাজশক্তি হচ্চে প্রজাশক্তির সমষ্টি; রাজশক্তির ত্রুটি ও অপূর্ণতা থাকিলে প্রজাশক্তিকে তাহা পূরণ করিয়া দিতে হইবে। রাজা প্রজার ইহাই সনাতন সম্বন্ধ। অন্ধ ভক্তি যে সর্ব্বত্রই বন্ধনের হেতু তাহা সত্য। অন্ধ রাজভক্তি ও অন্ধ দেশভক্তি তুল্যাংশে সমাজের ক্ষতিকারক; সুতরাং আশা করি, তুমি এই উভয় হইতে সতত আপনাকে দূরে রক্ষা করিবে। অন্ধ স্বদেশভক্তি সহজেই anti-foreign feeling বা পরজাতিবিদ্বেষের দ্বারা কলুষিত হয়। তোমার প্রাণের মধ্যে যথেষ্ট জ্ঞানালোক প্রবেশ করিলে সেখানে আর কোনরূপ অন্ধভক্তি বা অন্ধ বিদ্বেষ স্থান পাইবে না। ভিক্টর হিউগো বলেন—All hatred

---

সকল জিঘাংসাপ্রণোদিত গর্হিত অপকর্ম্ম তাহার ঔষধ হইতে পারে না। আমার বিশ্বাস এই যে, সামাজিক বা ব্যক্তিগত দণ্ডবিধির মূলে প্রতিহিংসার ভাব থাকিলে তাহা নীতিবিরুদ্ধ ও নিরর্থক হয়।

নব্য ইটালী সম্প্রদায় কার্বনারিদিগের হিংসামূলক অনুষ্ঠানসকল প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, এবং দেশদ্রোহীদিগের প্রাণদণ্ড বর্জ্জন করিয়াছে।

যাহারা স্বদেশদ্রোহী ও গুপ্তচরদিগের হত্যার প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহাদের উত্তরে আমরা বলিয়াছিলাম—'এই সকল লোকের অপরাধ প্রচার করিয়া দাও; সাধারণের ঘৃণাই তাহাদের উপযুক্ত দণ্ড হইবে'।

goes out of the heart in proportion as all light enters the mind.' *

আমি ভাল আছি। এঁড়েদহে নন্দলাল ও সস্ত্রীক সুরেশচন্দ্র ভাল আছে। মধ্যে মধ্যে তোমার কুশলসংবাদ লিখিবে।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীপঞ্চানন রায় চৌধুরী।

ডাক-পিয়ন যখন এই চিঠি বিধুভূষণের বাসায় দিয়া গেল, তখন সে উপস্থিত ছিল না। চিঠিখানি ভজহরির হাতে পড়িল। সে তাহা খুলিয়া পাঠ করিয়া নিজের পকেটস্থ করিল। "নিয়তি কেন বাধ্যতে"।

[১২]

অন্তঃশীলা ফল্গুনদী।

ন্যাশনাল্ ফার্ম্মাসিউটিকেল ওয়ার্কস্ হইতে চলিয়া আসিয়া ভজহরি বাগবাজারে কয়েক দিন রসিক সরকারের কাছে ছিল। ঐ কারখানা সার্চ্চের দিন তাহাকে একবার এঁড়েদহে যাইতে হইয়াছিল; পরে সে কৃষ্ণনগরে চলিয়া গিয়াছিল। সেখানে স্বদেশী হুজুকের নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই তাহার উদ্দেশ্য। মক্ষিকা যেমন ক্ষত স্থান সহজে খুঁজিয়া লয়, ভজহরিও

* হৃদয়ের মধ্যে যতই আলোক প্রবেশ করিবে, সেখান হইতে বিদ্বেষের আঁধার ততই দূর হইবে।

সেইরূপ বিধুভূষণকে সহজেই খুঁজিয়া লইয়াছিল। সে তাহাকে সুরেশের লেবরেটরির সেই শিক্ষানবীশীর সার্টিফিকেট্ ও বিস্ফোরক প্রস্তুতের পুস্তকখানি দেখাইয়া বলিয়াছিল, "আমি চমৎকার বোমা তৈরী করিতে পারি।"

ভজহরি ও বিধুভূষণ এক বাসাতেই থাকিত, উভয়ে হরিহর আত্মা। ইহারা দশবারজন স্বদেশী যুবককে আপনাদের দলভুক্ত করিয়াছিল। কেহই প্রকাশ্যভাবে কোনও স্বদেশী হাঙ্গামা করিত না, এমন কি সকলে একত্র মিলিতও হইত না। বাহিরের কেহই জানিত না যে ইহাদের একটি দল আছে। বিধুভূষণ একবার 'স্বদেশী' করিয়া মেয়াদ খাটিয়াছিল। সে দাগী লোক; সেজন্য সকল বিষয়ে তাহাকে পশ্চাতে থাকিতে হইত। ভজহরি বেদাগ; বিশেষতঃ তাহার সাহসও কিছু অধিক ছিল বলিয়া সে দলের সকলের বাসায় যাতায়াত করিত। দারোগা দীনদয়ালকে দেখিয়া ভজহরি হাস্য করিত। বলিত, সে তাহার কি করিতে পারে?

এইসকল যুবকদের কার্য্য ও তাহার শোচনীয় পরিণাম বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে পাঠকের সঙ্গে তাহাদের কাহারও কাহারও একটু পরিচয় হইলে ভাল হয়।

কৃষ্ণনগরের সব্‌জজ রায় হারাধন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র কুমুদনাথের একটি লাইসেন্স্ করা ব্রিটিশ বুল্ ডগ্ রিভলভার ছিল। কুমুদের পিতার নামে একটি বন্দুক ও দুই খানি তলোয়ারের পাশ ছিল। কুমুদ ইনিশিয়েটেড্ বা দীক্ষিত হয় নাই। সে পুরাদস্তুর বিধুভূষণের দলভুক্ত না হইলেও,

ভজহরি তাহাদের লাইসেন্স্ লইয়া তাহার বলে কলিকাতার এক বন্দুকের দোকান হইতে আড়াইশ টোটা কিনিতে সক্ষম হইয়াছিল। ভজহরি বিশেষ ফন্দিবাজ ছোকরা। সে নিজে তিনটি পিস্তল গোপনে সংগ্রহ করিয়াছিল, এবং উকা দিয়া ঘসিয়া সেগুলির নম্বর তুলিয়া ফেলিয়াছিল। ভজহরি দলের ছেলেদের বলিত—"আমেরিকা হইতে পাঁচশ রিভলভার গোপনে সরবরাহ করা হইয়াছে। সেই ষ্টক্ হইতে এই তিনটি আপাততঃ আনিয়াছি; আবশ্যক হইলে আরও আনিতে পারিব।" একটি পোর্টমেণ্টোর ভিতরে এইসকল অস্ত্র ও অ্যামুনিশন্ রক্ষা করিয়া সে তাহা কুমুদনাথের ঘরে রাখিয়া আসিয়াছিল। পোর্টমেণ্টোর মধ্যে কি কি আছে কুমুদ তাহা জানিত না। ভজহরি বিধুভূষণকে বলিয়াছিল, "সব্জজের বাড়ী হচ্চে আমাদের আর্সিন্যাল্। সন্দেহ করিয়া সেখানে সার্চ্চ করিতে পুলিসের সাহস হইবে না।"

বেণীমাধব ও মতিলাল পূর্ব্বে বিধুভূষণের সঙ্গে মেয়াদ খাটিয়াছিল। সেই সময়ে স্কুলে তাহাদের নাম কাটা যাওয়ায় তাহারা এখন নামকাটা সিপাই হইয়াছিল। বেণীর অন্নের সংস্থান ছিল; মতি সেই অন্নের অংশ গ্রহণ করিত। উভয়ে এক মেসে থাকিত; মতির সকল খরচ বেণী যোগাইত। ভজহরি তাহাদিগকে বলিত, "কেবল মেয়াদ খাটিলেই চূড়ান্ত হইল না; প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে।" মতি একটি গান গাহিত; তাহার মধ্যে এই পদটি ছিল—"এ মাটির দেহ মাটিতে মিশিবে, বিফলে মিশাবে কেন?"

দলের অবশিষ্ট যুবকদের অধিকাংশই 'নিউ রিক্রুট্'। তাহাদের মধ্যে অজাতশ্মশ্রু যোগেন স্থানীয় ছাপাখানায় কম্পোজিটরি করিত। ভজহরি তাহাকে বলিয়াছিল, "ভাই! তোমাকে ছাপাখানার ভিতর দিয়া কিছু দেশের কাজ ক'রে দিতে হবে; তুমি ত একজন ইনিশিয়েটেড্ মেম্বার।" এই ছাপাখানা হইতে ভজহরির রচিত একখানি ক্ষুদ্র "যুগান্তর" গোপনে ছাপা হইয়াছিল। তাহার শিরোদেশে গীতার সেই "যদাযদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতঃ" শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছিল, এবং ভিতরে যাহা কিছু লেখা ছিল, তাহা কেবল মার্ মার্ কাট্ কাট্ ধ্বনি।

এইরূপে এক বৎসর যাবৎ এই রাজনৈতিক চক্রান্তের ক্ষীণ ধারা কৃষ্ণনগরের সমাজের ভিতর দিয়া ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তঃশীলা বহিতেছিল।

[১৩]

হেমাঙ্গিনীর সাহসাভাব।

বিধুভূষণের বহুদিনের ইচ্ছা যে, এঁড়েদহে এনার্কিষ্টদিগের একটি নূতন 'সেণ্টার' বা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সে এই উদ্দেশ্যে সুরেশকে পত্র লিখিয়াছিল। পঞ্চানন বাবু তাহার পত্রের যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা বিধুভূষণের হাতে পড়ে নাই; ভজহরি তাহা গাপ করিয়াছিল।

পত্রের উত্তর না পাইয়া বিধুভূষণ ভাবিয়াছিল সুরেশ নিমরাজী আছে, সম্ভবতঃ তাহার সঙ্গে একবার দেখা করিলে কাজ হইতে পারিবে। ভজহরি কিন্তু বিধুভূষণকে বলিয়াছিল, "সুরেশবাবু ভারি কাপুরুষ; আমি তাঁর কারখানার মধ্যে বোমার এক্স্‌পেরিমেণ্ট্‌ করেছিলাম ব'লে তিনি আমাকে তাড়িয়ে দিয়াছিলেন। তাঁর দ্বারা কোনও কাজ হবে না। তবে এঁড়েদহে একজন স্ত্রীলোক আছে, তার দ্বারা আমাদের অনেক কাজ হ'তে পারবে। সে হচ্চে নন্দবাবুর ভগ্নী হেমাঙ্গিনী দিদি। দিদি এক অদ্ভুত মেয়ে মানুষ!"

যাহা হউক, সুরেশের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বিধুভূষণ একদিন প্রাতে এঁড়েদহে আসিল। ভজহরি তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল। সে তাহাকে নন্দলালদের বাসায় লইয়া আসিল। নন্দলাল বহুদিন পরে বিধুভূষণকে দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইল। ভজহরিকে সে পূর্ব্ব হইতে চিনিত। বিধুভূষণ নন্দলালকে জিজ্ঞাসা করিল—"এখানে স্বদেশী কি রকম চলছে?"

নন্দ। সম্প্রতি এখানে একটি স্বদেশী ষ্টোর খোলা হয়েছে। শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা সাধ্যমত দেশী জিনিসপত্র কিনে থাকে। মিলের কুলীরা কিন্তু বিলাতী কাপড়ই বেশী ব্যবহার করে।

ভজ। মিষ্টকথায় তাদের বিলাতী ত্যাগ করাতে পারবেন না। কুলীরা সকলেই মূর্খ। 'মূর্খস্য লাঠ্যোষধি'। তাদের উপর একটু জোরজবরদস্তি না করলে কাজ হবে না।

নন্দ। জবরদস্তি করে স্বদেশী চালাতে গেলে যে পুলিস কেস হবে—জেলে যেতে হবে।

ভজ। যার এত জেলে যাবার ভয়, তার দ্বারা স্বদেশী হবে না।

বিধুভূষণ নন্দলালকে বিশেষরূপে জানিত। সে তাহাকে বলিল—"যাক, ও কথা ছেড়ে দাও। আমাকে একবার সুরেশের সঙ্গে এখনি দেখা করতে হবে। তাদের বাড়ী কোথায় আমার জানা নাই; তুমি একটু আমার সঙ্গে এসে দেখিয়ে দাও।"

ভজ। আমি সুরেশবাবুর কারখানায় যাব না। এইখানে একটু জিরিয়ে আমি একবার কলকাতায় আমার মেসোর বাসায় যাব।

নন্দ। সে কি হয়? আপনাদের এইখানে খাওয়া দাওয়া করতে হবে।

বিধু। আমি মনে করেছি, সুরেশদের বাড়ীতেই আহার করব। এখনও অধিক বেলা হয়নি। ভজহরির দরকার থাকে ত ও কলকাতায় যাক্।

নন্দলাল বিধুভূষণকে লইয়া সুরেশদের বাগানবাড়ীতে চলিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী ভজহরিকে একটি ডাব কাটিয়া দিয়া কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিল। জলযোগ করিতে করিতে ভজহরি তাহাকে বলিল,

"দিদি, তুমি আনন্দমঠ পড়েছ?"

"হ্যাঁ, পড়েছি।"

"তা'হলে তুমি সন্তান সম্প্রদায় কা'কে বলে তা জান?"

"একটু একটু জানি।"

"একটু একটু জানলে হবে না। আমরা কৃষ্ণনগরে ঐ রকম একটি দল করেছি। এখানেও একটি সন্তান সম্প্রদায় করতে হবে, আর তোমাকে আমাদের শান্তি হোতে হবে।"

হেমাঙ্গিনী হাসিয়া উঠিল; বলিল,

"না বাপু, আমি ঘোড়ায় চড়তেও পারব না, গাছে উঠ্‌তেও পারব না। এ দুটি কাজ ছাড়া আর যা করতে বল্‌বে তা পারব।"

"না দিদি, দরকার হোলে দেশের জন্য তোমাকে সবই পারতে হবে। তোমরা স্ত্রীলোক, শক্তিস্বরূপিনী। তোমরা না জাগলে দেশ জাগবে না। তাই কবি বলেছেন,

না জাগিলে সব ভারত ললনা।
এ ভারত বুঝি জাগে না জাগে না॥"

হেমাঙ্গিনী বলিল—"না বাপু, আমার অত বল বুদ্ধি সাহস নেই।"

ভজহরি বলিল—"তোমার বলবুদ্ধি সাহস নেই ত কার আছে দিদি? কৃষ্ণনগরের উকিল রাধাবল্লভ বাবুর মুখে তোমার যা সাহস ও বুদ্ধির কথা শুনেছি, তা'তে মনে হয় তোমার অসাধ্য কাজ নেই। দিদি, তোমাকে আমরা ছাড়ছিনি। তুমি রণচণ্ডীরূপে আঁচল ঘুরিয়ে আমাদের উত্তেজিত করবে, আর আমরা বন্দে মাতরং ব'লে মৃত্যুমুখে ঝাঁপ দেব।"

আনন্দমঠের শান্তির ভূমিকা গ্রহণ করার উপযোগী সাহস হেমাঙ্গিনীর ছিল না। যেহেতু সে ভজহরির মুখে রাধাবল্লভের নাম শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিল। ভজহরি তাহা বুঝিতে পারিল না। হেমাঙ্গিনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"রাধাবল্লভ উকীলের সঙ্গে তোমার দেখছি বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে। তুমি কি তাদের বাড়ীতে থাক ?"

ভজহরি বুঝিল, রাধাবল্লভের সঙ্গে তাহার পরিচয়ের কথা বলিয়া ফেলা উচিত হয় নাই। সে কথা সাম্‌লাইয়া লইবার জন্য বলিল—"না দিদি, আমি বিধুবাবুর বাসায় থাকি। রাধাবল্লভ হচ্চে নরাধম পাষণ্ড। সে তোমাদের যে লাঞ্ছনা করেছিল তা আমি সবিশেষ জানি। দিদি, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, স্বহস্তে তার মুণ্ডপাত ক'রে তোমাদের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেব। তোমার কাছে আমার এই গূঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ কর্‌লাম; দেখো যেন আর কেউ এর বাষ্প না জান্‌তে পারে।

হে। ভগবানই তাকে সাজা দেবেন, তিনিই পাপীর দণ্ডদাতা।

ভজ। আমার হাত দিয়েই ভগবান রাধাবল্লভের দণ্ডের বিধান করবেন। এ কাজে আমাকে নিমিত্তস্বরূপ হোতে হবে।

যাহাদ্বারাই হোক্ না কেন, হেমাঙ্গিনী রাধাবল্লভের পাপের উপযুক্ত দণ্ড দেখিতে ইচ্ছা করিত। সুতরাং সে ভজহরিকে ঈশ্বরপ্রেরিত প্রিয়জন বলিয়া মনে করিল।

প্রায় একঘণ্টা হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে বহুবিধ আলাপ করিয়া বিদায় লইবার সময় ভজহরি তাহাকে বলিল—"দিদি, আমি আর নন্দবাবুর জন্য অপেক্ষা করতে পারব না। আমাকে এখন কলকাতায় মেসোর বাসায় যেতে হবে। আমার এই ব্যাগটি তোমার কাছে রেখে যাব। তুমি এটি তোমার তোরঙ্গের মধ্যে রেখে দাও। আমি কৃষ্ণনগরে যাবার সময় তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা ক'রে ব্যাগ নিয়ে যাব।"

ভজহরি হেমাঙ্গিনীর হাতে একটি ক্যাম্বিসের ছোট ব্যাগ দিয়া চলিয়া গেল। ব্যাগটি কিছু ভারি, তাহাতে একটি তিন পয়সার তালা লাগানো ছিল। হেমাঙ্গিনীর তোরঙ্গ বোঝাই থাকাতে তাহার মধ্যে ইহার স্থান সংকুলান হইল না। সুতরা ইহাকে দেওয়ালের গায়ে একটি হুকে ঝুলাইয়া রাখা হইল।

[১৪]

বিফল প্রয়াস।

বিধুভূষণ আজ এক সপ্তাহ হইল সুরেশদের বাগানবাড়ীতে আছে। ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি লইয়া সুরেশের সঙ্গে তাহার প্রায়ই বাদানুবাদ হয়। ঝুমন বহুদিন পরে তাহার ওল্ড্ ফ্রেণ্ড্ জেলখানার বিধুবাবুকে পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছে। সে তাহাকে বলিয়াছিল, বাবু! "আমি আর চুরি টুরি করিনি, এখন ভাল হয়েছি।"

এই কয়েক দিনের মধ্যে স্থানীয় কয়েকটি যুবকের সঙ্গে বিধুভূষণের আলাপ হইয়াছে। একদিন সে শ্রমজীবী সমিতি ও নাইট্-স্কুল দেখিয়া আসিয়া সুরেশকে বলিল—"একজন সাহেব যখন ইহাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, তখন এই দুইটি জিনিসের দ্বারা স্বদেশী বা স্বরাজের কোনও আয় দেখিবে না।"

সুরেশ বলিল—"ভারতবর্ষে প্রায় লক্ষাধিক সাহেব বাস করে। তাহাদের বাদ দিয়া সার্ব্বজনীন স্বরাজ গঠন করা সম্ভব হবে না।"

"হিন্দুস্থানে হিন্দুকেই স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাহাতে মুসলমান বা সাহেবদের অধিকার থাকবে কেন?"

"তা'হলে তোমার মতে এই হিন্দু-স্বরাজের মধ্যে ভারতবর্ষের মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, য়িহুদী, পার্শী প্রভৃতি জাতিকে হিন্দুর অধীন হয়ে থাকতে হবে?"

"কতকটা তাই হবে বটে।"

"আমি ভাই তোমার এ সংকীর্ণ স্বরাজের পক্ষপাতী হোতে পারব না। এরকম স্বরাজ বাঞ্ছনীয় নয়। তুমিই পূর্ব্বে বলতে, এক জাতি আর এক জাতিকে পরাধীন করে রাখ্‌লে তাদের্ উভয়েরই অধোগতি হয়।"

বিধুভূষণ একটু চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তবে তুমি কি রকম স্বরাজ চাও?"

সুরেশ বলিল—"যে স্বরাজের মধ্যে ইংরেজ, বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, পার্শী, মুসলমান প্রভৃতি সকলের সমান অধিকার থাকবে, আমি সেই স্বরাজ চাই। যে লোক ধর্ম্ম

বা জাতিবিশেষের ভিত্তির উপর ভারতের ভাবী স্বরাজ গড়্‌তে চেষ্টা করবে, সে নিশ্চয়ই উন্মাদ।"

আর একদিন বিধুভূষণ গীতার 'বাসাংসি জীর্ণানি' বচন আওড়াইয়া স্থরেশকে বুঝাইতেছিল যে, দেহের ধ্বংসে আত্মার ধ্বংস হয় না, যেহেতু আত্মা অবিনাশী। বলিল—"আমরা যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে নূতন বস্ত্র পরিধান করি, আত্মাও তেমনি এক দেহ পরিত্যাগ ক'রে দেহান্তর গ্রহণ করে। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস ক'রেই স্বদেশী যুবকেরা ফাঁসী কাঠে ঝুলে প্রাণ বিসর্জ্জন করতে পাচ্ছে।"

সুরেশ বলিল—"তারা গুপ্ত নরহত্যা ক'রে সেই অপরাধে ফাঁসী যাচ্ছে। এরকম গুপ্ত নরহত্যা ও আত্মহত্যায় দেশের কি কাজ হচ্চে আমি বুঝতে পারি না। এই গুপ্তহত্যার মশক দংশনে গভর্ণমেণ্ট যে টলিবে না, ইহা ঠিক। তবে কি ক'রে বল্‌ব, এর দ্বারা দেশের কাজ হচ্চে? যদি নিরর্থক প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌লেই দেশের কাজ হয়, তবে চল ভাই, আমরা কল্‌কাতায় গিয়ে ফোর্ট উইলিয়মের ধারে একটি গাছে গলায় দড়ি দিয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন করি। তা'হলে দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে।"

সুরেশের এই বিদ্রূপে বিধুভূষণ চটিয়া উঠিল। বলিল, "সুরেশ! তোমার দ্বারা আর কোন কাজ হবে না; তুমি বড়ই পেছিয়ে পড়েছ।" বিধুভূষণ সেইদিনই কৃষ্ণনগরে চলিয়া গেল।

[১৫]

ভজহরির ব্যাগ।

আজ প্রায় পনর দিন হইল ভজহরির ব্যাগটি হেমাঙ্গিনীর ঘরের মধ্যে দেওয়ালের গায়ে ঝুলান রহিয়াছে। ভজহরি তাহা লইয়া যায় নাই; কেহ তাহা স্পর্শ করিত না।

এই ব্যাগের উপর ঝুমনের একটু দৃষ্টি পড়িয়াছিল। হয় ত সে ভাবিয়াছিল, ইহার মধ্যে অনেক বিড়ি আছে। কারণ, ভজহরি বিশেষ স্বদেশী বলিয়া কারখানায় কাজ করিবার সময় সে সিগারেটের পরিবর্ত্তে খুব বিড়ি খাইত। ঝুমন তাহা জানিত; সে তখন তাহার নিকট হইতে নিত্য বিড়ি আদায় করিত।

"ইল্লৎ না যায় ধু'লে, স্বভাব না যায় ম'লে।" না বলিয়া পরের দ্রব্য লওয়া ঝুমনের চিরন্তন অভ্যাস। হেমাঙ্গিনীদের উপর দরদের জন্য সে তাহাদের বাক্স পেটারা ভাঙ্গিত না। কিন্তু ভজহরির উপর ঝুমনের সে দরদ ছিল না। বিশেষতঃ তাহার ঐ ব্যাগটি বহুদিন যাবৎ একরকম unclaimed property* হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং ঝুমনের মনে হইল, তাহাতে তাহার কিঞ্চিৎ 'ক্লেম' দাঁড়াইয়াছে।

একদিন হেমাঙ্গিনীর অনুপস্থিতিতে ঝুমন ব্যাগটি নামাইয়া তাহার তালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং তাহার মধ্যে কি কি

---

* যে মালের জন্য কেহ দাবী করে না।

আছে তাহা হাতড়াইয়া দেখিতে লাগিল। ব্যাগের ভিতর হইতে কতকগুলি কাগজ, দু'টি পিস্তল, কতকগুলি কার্ট্রিজ, এবং একটি সিগারেটের টিন বাহির হইয়া পড়িল। এই টিনটি পাইয়া ঝুমনের ভারি আহ্লাদ হইয়াছিল; সে মনে করিল, ইহার মধ্যে অনেক সিগারেট্ আছে। এজন্য সে টিনটি খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু দেখিল তাহার ঢাকুনি রাং ঝাল দিয়া আঁটা। এমন সময় নন্দলাল হঠাৎ ঘরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঝুমনের কাণ্ড দেখিয়া তাহার ক্রোধ হইয়াছিল; কিন্তু পিস্তল দুইটি দেখিবামাত্র নন্দলালের ক্রোধ বিস্ময়ে পরিণত হইল। সে ঝুমনকে বলিল, "তুই দৌড়ে গিয়ে সুরেশকে ডেকে নিয়ে আয়।"

ঝুমন্ এক-দৌড়ে গিয়া সুরেশকে ডাকিয়া আনিল। তখন নন্দলাল ও সুরেশ ভজহরির ব্যাগের সমস্ত জিনিস ভাল করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিল। দেখিল দুইটি পিস্তলই কম-বেশ অকর্ম্মণ্য, এবং কার্ট্রিজ্‌গুলি তাহার কোনটিতেই ফিট্ করে না। সুরেশ দেখিল, টিনের কৌটাটির গায়ে একটি ছিদ্র আছে, তাহা দিয়া হল্‌দে রঙের এক প্রকার গুঁড়া বাহির হইয়া পড়িল। সুরেশ চিনিত, ইহা পিক্রিক্ এসিড্। সে দেখিল টিনের গায়ে 'ফিউজ' লাগান নাই। ব্যাগের ভিতর হইতে সুরেশ কয়েকখানি 'যুগান্তর' এবং তাহার কারবারের পাঁচখানি ক্যাটালগ্ প্রাপ্ত হইল। তদ্ভিন্ন হেমাঙ্গিনী ও নন্দলাল সুরেশকে বহুপূর্ব্বে যেসকল চিঠি লিখিয়াছিল, এবং পাঁচু মামা বিধুভূষণকে সম্প্রতি যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাও

এই ব্যাগের মধ্যে পাওয়া গেল। কি করিয়া এই সকল পত্র ভজহরির হস্তগত হইয়াছিল, সুরেশ তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।

এইসকল দেখিয়া হেমাঙ্গিনী খানিকক্ষণ অবাক হইয়া রহিল। পরে সে বলিল—"আমার সন্দেহ হয়, এই ব্যাপারের ভিতর রাধাবল্লভের কারচুপি আছে। সেদিন ভজহরি আমার কাছে ব'লে ফেলেছিল যে, রাধাবল্লভের সঙ্গে তার খুব মেশামিশি আছে। বোধ হয়, এরা সকলে মিলে আমাদের আবার একটা ভারি বিপদে ফেলবার যোগাড় কচ্ছে।"

সুরেশ বলিল—"পুলিসকে জানাবার জন্য এই সকল জিনিস থানায় পাঠিয়ে দেওয়া আবশ্যক।"

নন্দলাল বলিল—"তাহ'লে; বিধুভূষণ বিপদে পড়তে পারে; ভজহরি তার সঙ্গে এসে এই ব্যাগ রেখে গিয়েছে। আমার মনে হয়, ব্যাগটি কৃষ্ণনগরে বিধুভূষণের কাছে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়।"

সুরেশ বলিল—"বিধুভূষণকে ভজহরির এই কাণ্ড জানান আবশ্যক। তাকে ডাকে চিঠি দেওয়া হবে না। সেখানে ব্যাগটি পাঠানও নিরাপদ নয়ে। ঝুমন্ বরং কৃষ্ণনগরে গিয়ে বিধুভূষণকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে আসুক।"

সুরেশের চিঠি লইয়া সেইদিনই ঝুমন্ কৃষ্ণনগরে চলিয়া গেল। সুরেশ নন্দলালকে বলিল, "বিধুভূষণ না আসা পর্য্যন্ত তুমি এই ব্যাগটি এবাড়ী থেকে অন্যত্র সরিয়ে রাখ।" নন্দলাল তাহাই করিল।

[১৬]

ভজহরি-তত্ত্বের নির্ঘণ্ট।

প্রায় আট মাস হইল, পারুলের একটি পদ্মফুলের মত ছেলে হইয়াছে। মায়ের আনন্দ অনেক সময় শিশুর আনন্দের অনুকরণ করে। শিশুকে বুকে করিয়া সোহাগ করিবার সময় জননীরও শৈশব ফিরিয়া আসে। অপরাহ্নে পারুল খোকাকে কোলে লইয়া তাহারই ভাষার অনুকরণে আদর করিতেছিল, এমন সময় হেমাঙ্গিনী কয়েকখানি সরভাজা হাতে করিয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিল। সুরেশ বারান্দায় ছিল। হেমাঙ্গিনীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সেও ঘরের ভিতর আসিল। বলিল, "দিদি, তোমার হাতে কি ও ?"

হে। বিধুভূষণ কৃষ্ণনগর থেকে এই সরভাজা এনেছে।

সু। তুমি তাকে ভজহরির ব্যাপার সব বলেছ ?

হে। হাঁ সব বলেছি। ব্যাগের ভিতর যা যা আছে, সব দেখে বিধুভূষণ ভজহরির উপর রেগে আগুণ হয়েছে। বল্লে, 'আমি ব্যাটাকে কাজের লোক ব'লে বরাবর বিশ্বাস করে এসেছি; কি সর্ব্বনাশ! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা ?' নন্দর সঙ্গে বিধুভূষণের আরও কি সব কথা হচ্চে। আমি তোমাকে খবর দিতে এলুম।

পারুল গতরাত্রে সুরেশের মুখে ভজহরির ব্যাগের ব্যাপার শুনিয়াছিল। সে বলিল—"আমার সৎমা যে ওর জন্য

সুপারিশ করেছিল গো। বলেছিল, কৃষ্ণনগরে তার যে ভগ্নীপতি আছে, ভজহরি তার খুব বিশ্বাসী লোক।”

হে। আ পোড়াকপাল! রাধাবল্লভের বিশ্বাসী! তবেই হয়েছে! ভজহরি যখন এখানে কাজ করত, তখন আমাকে বলেছিল, কৃষ্ণনগরে তারিণী বেওয়ার বাড়ীতে তার কে এক মামা আছে, সে নাকি পুলিসের গোয়েন্দা, প্রেমচাঁদ না কি হচ্চে তার নাম।

সু। সেই প্রেমচাঁদের সাক্ষ্যতেই ত নন্দদের মেয়াদ হয়েছিল। ভজা যখন ফের কৃষ্ণনগরে গিয়ে জুটেছে, তখন নিশ্চয়ই মামার খাতায় নাম লিখিয়েছে। সে নাকি আবার আমাদের রসিক সরকারের শালী-পো হয়।

এই কথা শুনিয়া পারুল বলিল—“সে কি? কৈ, আমি ত ভজহরিকে কখনও বাগবাজারের বাড়ীতে সরকার মশাইয়ের কাছে আস্‌তে দেখিনি।” তখন সোণা-ঝীকে ডাকিয়া পারুল জিজ্ঞাসা করিল—“সোণা! তুই কখনও ভজহরিকে আমাদের সরকার মশাইয়ের কাছে আস্‌তে দেখেছিলি? সরকার মশাই নাকি তার মেসো হয়।”

সোণা বলিল—“কৈ না; আমি ত বাগবাজারের বাড়ীতে সরকার মশাইয়ের ঘরের সব কাজ কর্ম্ম করে দিতুম; ভজহরি ব’লে কাউকে ত তার কাছে কখনও আসতে দেখিনি। সরকারের কোনও চুলোয় কেউ আপনার লোক নেই গো দিদিমনি!”

তখন ভজহরির কথা লইয়া তাহাদের মধ্যে একটা ভারি

আন্দোলন উঠিল। তাহার সম্বন্ধে যাহার যাহা জানা ছিল, সে তাহা বলিয়া ফেলিতে লাগিল। সুরেশ বলিল—"ব্যাটা আমার কারখানার ভিতর বোমা তৈরি করবার চেষ্টায় ছিল। ভাগ্যিস্ তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম তাই রক্ষা; না হলে এতদিনে সকলের হাতে দড়ি দিত।"

হেমাঙ্গিনী বলিল—"ভজহরি নাকি আগে ঢাকায় না কোথায় স্বদেশী ডাকাতের দলে ছিল। ঐ দল ধরা পড়লে সে এখানে পালিয়ে এসেছিল। ভজই আমার কাছে চুপে চুপে একথা কবুল করেছিল। সে আমাকে বলেছিল, 'দিদি, আমরা আনন্দ মঠের সন্তান সম্প্রদায় হব, আর তোমাকে আমাদের শান্তি হোতে হবে'।"

ইহা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। সুরেশ বলিল, "ভজা দেখছি ভয়ঙ্কর লোক, সে অনেকের সর্ব্বনাশ করবে।"

বিধুভূষণের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সুরেশ নন্দলালদের বাটীতে রওয়ানা হইল। রাত্রে সোণা-ঝীর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। সে যখন বাগবাজারের বাড়ীতে থাকিত, তখন একদিন সুলোচনার গৃহে রাধাবল্লভ বাবু, রসিক সরকার ও সুলোচনাতে ফিস্‌ফাস্ করিয়া কি পরামর্শ হইতেছিল। রাধাবল্লভ বাবুর পিপাসা বোধ হওয়ায় এক গ্লাস জল চাহিলে, সোণা তাঁহাকে পান ও জল দিতে আসিয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে রাধাবল্লভ ভজহরির নাম করিয়া কি বলিতেছিলেন; সোণাকে দেখিয়া তিনি চুপ করিয়া গেলেন। ভজহরি নামটি তদবধি কিছুদিন সোণার কাণে লাগিয়াছিল। আজ

তাহার সেই পুরাতন কথা স্মরণ হইল। তাহার সন্দেহ হইল, কোনও চক্রান্তের ব্যাপারে এই ভজহরি তাহাদের হাতে যন্ত্রস্বরূপ।

সোণা পরদিন প্রত্যূষে পারুলকে বলিল—"দিদিমনি! আমি অনেকদিন বউঠাকরুণকে দেখিনি। তাঁর জন্য কয় দিন ধরে আমার ভারি মন কেমন কচ্ছে। আমি এখন দিনকয়েকের জন্য বাগবাজারের বাড়ীতে চল্লুম।" এই বলিয়া সে বিদায় হইল।

[১৭]

ক্ষেত্র কর্ষণ।

সুরেশ যখন নন্দলালদের বাটীতে উপস্থিত হইল, তখন বিধুভূষণ নিবিষ্টচিত্তে একখানি চিঠি পড়িতেছিল। পঞ্চানন বাবু তাহাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন—ভজহরি যে চিঠি গাপ করিয়াছিল—ইহা সেই চিঠি। সুরেশ আসিবার পূর্ব্বে বিধুভূষণ এই চিঠি তিনবার পড়িয়াছিল। এখন সে ইহা চতুর্থবার পাঠ করিতেছিল।

চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে বিধুভূষণ যে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, সুরেশ যখন তাহাকে স্বাগত প্রশ্ন করিল তখন সে কোনও উত্তর করিল না। সুরেশ যখন উপর্য্যুপরি আরও দু'তিনটি প্রশ্ন করিল, তখন

বিধুভূষণ নির্ব্বাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল মাত্র। সুরেশ তাহাকে বলিল—"তুমি যে দেখছি চিঠি পড়ে বোবা হয়ে গেলে! ও কোন্ চিঠি?"

বিধুভূষণ বলিল—"পাঁচুমামার চিঠি, এই ব্যাগের ভিতর ছিল। সুরেশ, তুমি এ চিঠি পড়েছ?"

"হাঁ পড়েছি।"

"তোমার কি মনে হয়, campaign of terrorism* ব্যর্থ হবে?"

"নিশ্চয়ই। আয়র্ল্যাণ্ডে আর রাশিয়ায় ত এ সকল উপদ্রবের চূড়ান্ত অভিনয় হয়ে গেছে। তাতে কি ফল হয়েছে? এনার্কিজ্‌ম্ কোনও দেশেই স্থায়ী হয় না।"

বিধুভূষণ এ কথার প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সুরেশ বলিল—"আজকাল কোনও রকম রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র আমাদের রাজপুরুষদের নিকট অজ্ঞাত থাকে না। এই দেখ না ভাই, তোমরা এ পর্য্যন্ত যা কিছু করেছ, ভজহরি তা সমস্তই জানে। সুতরাং আমার বিশ্বাস যে, পুলিসও তা জানে। এনার্কিষ্টরা মনে করে, তারা ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে. কেউ জানতে পাচ্ছে না। বস্তুতঃ তাদের সকল কাজ পুলিস নখদর্পণে দেখতে পাচ্ছে; এবং যেদিন তাদের ধরা দরকার হবে, সেদিন সকলকে বেড়াজালে একসঙ্গে ধরে ফেলবে।"

এই প্রসঙ্গে বিধুভূষণের সঙ্গে সুরেশের আরও অনেক কথা হইল। ইহার ফলে বিধুভূষণের পূর্ব্বসংস্কারের ভিত্তি কতকটা

* রাজনৈতিক গুপ্তহত্যার ব্যাপার।

আল্‌গা হইয়া গেল। পাঁচুমামার পত্র পাঠে এবং সুরেশের সহিত বাদানুবাদে তাহার মানসক্ষেত্র আজ একপ্রকার কর্ষিত হইল বলিতে হইবে। সে আজ এই কর্ষণের বেদনা অনুভব করিল। চিন্তাভারপীড়িত বিধুভূষণ নিশীথ সময়ে ভজহরির ব্যাগটি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া পরদিন প্রাতেই কৃষ্ণনগরে চলিয়া গেল। বৈকালে স্থানীয় পুলিসের দারোগা আসিয়া নন্দলালকে জিজ্ঞাসা করিল যে, বিধুভূষণ নামে যে লোক তাহাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল, সে এখনও আছে, না চলিয়া গিয়াছে? নন্দলাল বলিল—"সে আজ প্রাতে চলিয়া গিয়াছে।"

[১৮]

মুস্কিলে আসান্।

দাসদাসীর মনে মুনিবের কোনও গোপনীয় তথ্য জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইলে তাহাদের মধ্যে দ্রোহীভাব উপস্থিত হয়। সুলোচনার প্রতি সোণার যে দ্রোহীভাব, তাহার অন্য পুরাতন কারণ থাকিলেও, ভজহরি সংশ্লিষ্ট এই নূতন কারণে তাহা সম্প্রতি কিছু তীক্ষ্নতা লাভ করিয়াছিল।

বাগবাজারের বাটীতে আসিয়া সোণা সুলোচনাকে বলিল—"ছ্যাখ বউ ঠাকরুণ! দিদিমণির ছেলেটি হয়েছে ঠিক যেন একটি পদ্মফুল! সে ভারি হাসতে শিখেছে—বগলের কাছে একটু কাতুকুতু দিলেই একেবারে ডুকুরে হেসে ওঠে। আর কি শান্ত ছেলে বাপু! মোটে কাঁদ্‌তে জানে না।"

সুলোচনা বলিল—"বটে, তা বেশ বেশ, তুই থাম্ বাপু; তোর আর অত আদিখ্যেতায় কাজ নেই।"

সুলোচনা মনের ভাব বিশেষ গোপন করিতে পারিত না। সোণা কিন্তু তাহা বিলক্ষণ পারিত। পারুল ও তাহার ছেলের উপর যে সুলোচনার বিষদৃষ্টি, তাহা সে খুব বুঝিত; কিন্তু বুঝিয়াও ন্যাকা সাজিত। একদিন সোণা সুলোচনাকে বলিল—"তা হোক্ বউ ঠাকরুণ! তোমায় একদিন দিদিমণির ছেলেটিকে দেখতে যেতে হবে; দিদিমণি অনেক ক'রে ব'লে দিয়েছে।"

সুলোচনা ঈষৎ রাগিয়া বলিল—"সোণা, তুই জান্‌বি কি, ঐ ছেলে হওয়ায় আমাদের কি অনিষ্ট হয়েছে? ঘোষ মশাই বলেছে, ঐ ছেলে বাঁচলে আমাদের সমস্ত বিষয়ের মালীক হবে, আমাকে কেবল পেটভাতায় থাকৃতে হবে—এক কড়ার সম্পত্তিও আমি দান বিক্রি করতে পারব না। এই ছেলে হ'তে আমি সকল বিষয়ে বঞ্চিত!"

সো। বল' কি বউ ঠাকরুণ, তুমি যা বল্‌ছ সত্যি নাকি?

সু। সত্যি নয় ত আমি কি তোর কাছে মিথ্যা বল্‌ছি সোণা?

সোণা একটু স্বর নিচু করিয়া বলিল—"তা বউ ঠাকরুণ, তুমি আগে এসব কথা আমাকে খুলে বল'নি কেন? তা'হলে যে আঁতুড়েই কাজ শেষ করে দিতুম!"

সুলোচনা খপ্ করিয়া সোণার হাত ধরিয়া বলিল—"সোণা রে, তুইই আমার মুস্কিলে আসান্! তুই যদি আমার সহায় হোস্, তা'হলে আর ভাবনা কি?"

সোণা। বউ ঠাকরুণ! তুমি আমায় যখন যা করতে বলবে, তা আমায় করতেই হবে—তা যত বড় কঠিন কাজই হোক্ না কেন। তোমাদের আমি অনেক নিমক খেয়েছি। আর তোমার ভালবাসার ধার কি আমি শুধতে পারব বউ ঠাকরুণ? তুমি যাতে বজায় হও, আমাকে তা করতেই হবে—তাতে আমার প্রাণ যাক্ বা থাক্!

সু। আমার উপর তোর এম্‌নি টানই বটে সোণা! তা কি করতে হবে, আমি তোকে এক সময় বল্‌ব অখন। কাজ বড় কঠিন। সাহস ক'রে যদি করতে পারিস্, তা'হলে সোণা তুই আমায় কিনে রাখবি!

সো। একবার ব'লে ত ত্থাখ; কাজ পারি কি না তার প্রমাণ পরে পাবে। বউ ঠাকরুণ! তুমি নিশ্চয় জেনো, তোমার সোণা যা না পারবে, তুনিয়ায় আর কেউ তা পারবে না।

সোণার কথায় সুলোচনা কতকটা আশ্বাস পাইল। সগর রাজার ষষ্টি সহস্র সন্তানের ন্যায় সুলোচনা কয়েকটি আশার ক্ষীণ বেণামূল অবলম্বন করিয়া ঝুলিতেছিল, এবং নৈরাশ্যের মূষিক তাহা একে একে কাটিতেছিল। তাহার প্রথম আশা ছিল, পারুল বিধবা—সুতরাং সে বিষয় পাইবে না। পারুলের পুনর্ব্বার বিবাহে তাহার সে আশা নষ্ট হইয়াছিল। রাধাবল্লভ তাহাকে বলিয়াছিলেন, ভজহরিকে এঁড়েদহের বাগানবাড়ীতে রাখিয়া দিতে পারিলে, সে পারুলের বরকে পুলিপোলাও চালান করিতে পারিবে। সেখানে ত ভজহরিকে রাখিয়া দেওয়া

হইল। কৈ, পুলিস আসিয়া সুরেশের কারখানা খানাতল্লাস করিল বটে, কিন্তু তাহাকে ত গ্রেপ্তার করিল না। সুলোচনার দ্বিতীয় আশায় ছাই পড়িল। অবশ্য ভজহরি সেদিন আসিয়া বলিয়া গিয়াছিল যে, এবার সে অব্যর্থ বাণ যোজনা করিয়াছে, তাহা হইতে আর অব্যাহতি নাই। কিন্তু সুলোচনা আরং তাহার কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই। এখন পারুলের সন্তান হওয়ায় তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হইয়াছিল। এই সন্তানই তাহার সর্ব্বনাশের একমাত্র কারণ। তাহাকে ইহলোক হইতে সরাইতে না পারিলে সুলোচনা নিষ্কণ্টক হইতে পারিবে না। এ কার্য্যের জন্য তাহাকে স্বয়ং চেষ্টা করিতে হইবে। সোণা তাহার উপযুক্ত সহায়।

সুলোচনা রসিকের কাছে তাহার ভীষণ অভিসন্ধি ব্যক্ত করিল। সে যে তাহাকে হৃদয়ের প্রেম দান করিয়াছে, তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া পারে না। প্রেমের ফলে মধু ও বিষ উভয়ই থাকে। কাহারও নিকট ইহা সুন্দর অমৃত ফল; আবার কাহারও অদৃষ্টে ইহা কণ্টকিত ধুতুরা। রসিক এই ধুতুরা সেবন করিয়া সংজ্ঞা হারাইয়াছিল। সে সুলোচনার প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল। সুলোচনা বলিল—"সোণা আমার একাজে সহায় হইবে, সে আমাকে ভরসা দিয়াছে।"

রসিক বলিল—"সে ইচ্ছা করিলে একাজ অনায়াসে করিতে পারিবে। আমি সোণাকে ভালরকম জানি।" সুলোচনার সম্প্রতি একটি রোগ দেখা দিয়াছিল। সেজন্য একার্য্য আপাততঃ স্থগিত থাকিল।

[১৯]

চিন্তার উচ্চস্তর।

কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসিয়া বিধুভূষণ পূর্ব্বে ভজহরিকে যে চক্ষে দেখিত, সে চক্ষে আর দেখিতে পারিল না। ভজহরি আজকাল বিধুভূষণকে প্রায়ই অন্যমনস্ক দেখিত, তাহাকে কোন কথা বলিতে গেলে বিরক্ত হইত এবং কখন কখন রাগিয়া উঠিত। একদিন রাগের উপর বিধুভূষণ ভজহরিকে স্পষ্টই বলিয়া বসিল, "তুমি অন্যত্র বাসা কর, এখানে তোমার আর স্থান হইবে না।" পরদিন ভজহরি আপনার বিছানা ও জিনিসপত্র লইয়া মতি ও বেণী যে মেসে থাকিত, সেই মেসে চলিয়া গেল।

ভজহরিকে বিতাড়িত করিয়া বিধুভূষণ বুঝিল, এই দু'মুখো সাপ এইবার দংশন করিতে চেষ্টা করিবে; সুতরাং তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক।

পরদিবস রাত্রে মতি বিধুভূষণের বাসায় আসিল। মতি ভজহরির বিশেষ বন্ধু। ভজহরি তাহাকে বলিয়াছিল—"বিধুবাবু আমার উপর অকারণে রাগ করিয়াছেন। আমি তাঁহার সহিত দেখা করিব না; অতএব তুমি বিধুবাবুর সঙ্গে প্রত্যহ দেখা করিবে। তিনি হচ্চেন আমাদের দলের leader *। তাঁহার আদেশ আর উপদেশ আমাদের পদে পদে আবশ্যক।" বিধুভূষণের মনোভাব সর্ব্বদা অধ্যয়ন করা ভজহরির

---

* নেতা।

আবশ্যক হইয়াছিল বটে। তাহা মতির মারফতে হইলেও চলিবে।

বিধুভূষণ মতিকে বলিল—"আমি তোমাকে একটি কথা বলিতে চাই। তুমি তাহা ভজহরিকে বলিবে না, যদি এরূপ শপথ কর, তা'হলে বলিতে পারি।"

মতি বলিল—"কি কথা বলুন। আপনি বারণ করিলে ভজহরিকে তাহা কেন বলিব? আপনিই ত আমাদের লিডার; আপনিই ত আমাকে দীক্ষিত করেছেন।"

বিধুভূষণ বলিল—"আমার এই কথা তোমাকে বলা বিশেষ দরকার হয়েছে; কারণ, তোমার সঙ্গে ভজহরির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা। আমি সঠিক প্রমাণ পেয়েছি, পুলিসের সঙ্গে তার কোনও রূপ সম্বন্ধ আছে। ভজহরি আমাদের সকল ব্যাপারই জানে। সে দেখছি কোন্ দিন আমাদের সকলকে ফাঁসাবে।"

ভজহরি সম্বন্ধে এইকথা শুনিয়া মতি হতভম্ব হইয়া গেল। বলিল—"সে কি? আপনি কী বল্‌ছেন? আমাদের দলের যেসকল কঠিন কঠিন কাজ, ভজহরি তা নিজেই বরাবর ক'রে এসেছে। সে কি পুলিসের চর হ'তে পারে? না না, আপনার ভুল হয়েছে, আপনি তার উপর অন্যায় সন্দেহ করছেন।"

বিধুভূষণ বলিল—"আমি সন্দেহ করছি না; আমি ঠিক জেনেছি, ভজহরি unreliable *। কিন্তু কি উপায়ে জেনেছি তা এখন তোমাকে বলব না। মতি! তুমি বিশেষ বুদ্ধিমান

* অবিশ্বাসী।

ছোক্‌রা। তুমি যদি সতর্কভাবে তার গতিবিধির উপর কিছুদিন লক্ষ্য রাখ, তা'হলে তুমিও জানতে পারবে ভজহরি কি রকম লোক। এখন আর অধিক কথার আবশ্যক নাই।"

মতি চলিয়া গেল। বিধুভূষণ চিন্তা করিতে লাগিল। ভজহরি সম্বন্ধে তাহার কি করা কর্ত্তব্য তাহা সে এখনও স্থির করিতে পারে নাই। বিধুভূষণ তাহার ঔদ্ধত্য বশে একবার মনে করিল, ভজহরিকে বিনাশ করিয়া পথ নিষ্কণ্টক করিবে,—প্রাণদণ্ডই এরূপ স্বদেশদ্রোহীর উপযুক্ত শাস্তি। আবার পর-ক্ষণেই পাঁচুমামার পত্রে উদ্ধৃত ম্যাটসিনির সেই মহান্ উপদেশ তাহার মনে পড়িয়া হিংসাবৃত্তিকে দূর করিয়া দিল। ম্যাটসিনি বলিয়াছেন,"Let the Judas be made known,the infamy thereof will be punishment enough"। বিধুভূষণ মনে মনে বলিল—"ম্যাটসিনির কথাই ঠিক! পাপীর দণ্ডবিধানের কর্ত্তা হচ্চেন ভগবান্। আমি তাহাকে দণ্ড দেবার কে?"

চিন্তারও উপত্যকা অধিত্যকা আছে। ভাবিতে ভাবিতে চিন্তার উচ্চস্তরে উঠিয়া বিধুভূষণ বুঝিল,—মানুষ মানুষের প্রাণ লইবার অধিকারী নহে। যে-প্রাণ সে দান করিতে পারিবে না, সে-প্রাণ লইবারও তাহার অধিকার নাই। এনার্কিষ্টদিগের হত্যাকাণ্ড, বিচারকের আজ্ঞায় খুনী আসামীর প্রাণদণ্ড, এবং যুদ্ধে অসংখ্য লোকক্ষয়—এ সকলই ঈশ্বরের চক্ষে অপরাধ। জগৎ হইতে যে দিন গুপ্ত নরহত্যা, আদালতের বিচারে প্রাণদণ্ড এবং যুদ্ধবিগ্রহ উঠিয়া যাইবে, সেই দিনই প্রকৃত পক্ষে সত্যযুগ ফিরিয়া আসিবে।

[২০]

আতঙ্ক নিগ্রহ।

একমাসের উপর হইল সুলোচনার একটি রোগ দেখা দিয়াছে। ভোজনে বিশেষ অরুচি, এবং আহার করিলে বমি হয়। তাহার তলপেট কিছু স্ফীত হইয়াছিল। ইহাকে মেধ-বৃদ্ধি বলিতে পারি না; কারণ, সুলোচনা স্থূলাঙ্গী ছিল না। সে বলিত, তাহার সম্ভবতঃ উদরী হইয়া থাকিবে। এই রোগের জন্য সে সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিত। কর্ত্রী ঠাকুরাণী অসুস্থ হইলে প্রভুভক্ত কর্ম্মচারীদেরও অসুস্থতা আসিয়া পড়ে। এই কারণে রসিক সরকারেরও আজকাল সমান বিমর্ষভাব দৃষ্ট হইত। সোণা-ঝী ইহা বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়াছিল।

সুলোচনাকে দেখাইবার জন্য একদিন সহরের অপর প্রান্ত হইতে একজন নূতন ডাক্তার ডাকা হইল। ইনি পূর্ব্বে কখনও এবাটীতে চিকিৎসা করিতে আসেন নাই। ডাক্তারবাবু রোগীর হাত দেখিলেন, তলপেট টিপিয়া দেখিলেন, এবং সেখানে ষ্টেথস্কোপ্ বসাইয়া কাণ দিয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"রোগ যে গুরুতর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিধবা স্ত্রীলোকের এরূপ পেট ফাঁপিয়া উঠিলে কেহ কেহ 'জোলাপের' ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমি সে চিকিৎসা করিতে পারিব না। এ রোগে ঔষধের আবশ্যক হইবে না। ভয় নাই, যথা-সময়ে এ উদরী আপনি সারিয়া যাইবে।"

ডাক্তারবাবু ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া 'ফীস্' লইয়া চলিয়া

গেলেন। রসিক সরকার তাঁহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইল না। সোণা-ঝী বুঝিল, ইহা হাত-পা-ওয়ালা উদরী, এবং বউ ঠাকুরাণীর এই রোগের জন্য সরকার মশায়ই দায়ী।

যাহা হউক, সরকার মশাই ইতিপূর্ব্ব হইতেই সোণার উপর বিশেষ প্রসন্নভাব ধারণ করিয়াছিল। সোণা একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এঁড়েদহে দিদিমণিদের ওখানে তোমার সেই যে শালী-পো ছিল, তার নাম কি ভাল মনে পড়্ছে না—হাঁ হাঁ, মনে পড়েছে, তার নাম ভজহরি। তা সে বাবু খুনে লোক। সে করেছিল কি জান সরকার মশাই?—সেখানে হিমুদিদিদের বাড়ীতে সে একটা ব্যাগ রেখে এসেছিল। তারা সেই ব্যাগ খুলে ভাখে, তার ভিতর কামান বন্দুক গোলাগুলি সব রয়েছে। তোমার শালী-পো কি সর্ব্বনেশে ছেলে গো?"

রসিক বলিল—"বলিস্ কি সোণা?—তার ব্যাগের ভিতর কামান বন্দুক? ব্যাগ ত ছোট; তার ভিতর কামান বন্দুক কেমন করে থাক্‌বে?"

"এই এতটুকু ছোট ছোট বন্দুক গো!"

"তারা সে সব জিনিস নিয়ে কি করলে?"

"করবে আর কি? গঙ্গায় ফেলে দিয়ে এল। যাই হোক্ বাপু, ও রকম শালী-পোকে আর তোমার কাছে ঠাঁই দিও না। তা'হলে তোমাকে সুদ্দ্ কোন্ দিন ধরে নিয়ে যাবে।"

"ব্যাটার কোনও পুরুষে আমার শালী-পো নয় রে সোণা। রাধাবল্লভ বাবু ওকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের একটা কাজ হাঁসিল করবার জন্য ওকে এঁড়েদহে

রাখা হয়েছিল। ব্যাটা যে এমন কাঁচা ছেলে তা জান্‌তুম না। যাক্ সোণা, তুই ঠিক বল্‌ছিস্ পুলিসে কিছু জান্‌তে পারে নি?"

"পুলিসে খবর দেবার কথা হয়েছিল। আমি দেখ্‌লুম, পুলিস এলেই তোমায় নিয়ে টানাটানি করবে। তাই আমি চালাকি করে বল্লুম, আর পুলিস জানিয়ে হাঙ্গাম করে কাজ নেই; ও সব মাল গঙ্গায় ফেলে দাও।"

"ওঃ সোণা, তুই বড্ড বাঁচিয়ে দিয়েছিস্। হক্-না-হক্ একটা বিষম গোলযোগে পড়্‌তে হোত।"

রসিক সরকার সেইদিনই রাধাবল্লভ বাবুকে পত্র লিখিয়া জ্ঞাত করিল যে, তাঁহার ভজহরির সকল চাল ফাঁসিয়া গিয়াছে, তাহার ব্যাগটি গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এবং হেমাঙ্গিনীরা এবিষয়ে পুলিসকে কোনও খবর দেয় নাই।

[২১]

ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ।

মতি এখন ভজহরির সকল কার্য্যের উপর, বিশেষতঃ তাহার রাত্রের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিতেছিল। যদি সে প্রকৃতই পুলিসের চর হয়, তাহা হইলে রাতভিতে অলক্ষিতে তাহার পশ্চাদনুসরণ করা নিতান্ত নিরাপদ নহে। সুতরাং মতির কিছু আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইয়াছিল। কাঁটাবনে যাইতে হইলে পায়ে জুতা পরিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। সবজজের

পুত্র কুমুদনাথের সঙ্গে তাহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। সে পিস্তল ছোড়া শিখিবে বলিয়া কুমুদের নিকট হইতে তাহার রিভল্‌ভার্ ও কতকগুলি কার্টিজ্ চাহিয়া লইয়াছিল। এই রিভল্‌ভারে কার্টিজ্ ভরিয়া কোটের পকেটে রাখিয়া মতি আবশ্যকমত রাত্রে বাহির হইত।

মতির সঙ্গে ভজহরির প্রত্যহ সন্ধ্যার পর একবার করিয়া দেখা হইত। পৌষ মাস, পৌনে ৬টায় সন্ধ্যা হইয়াছে। ৯টা বাজিয়া গেল, তথাপি ভজহরি আজ আসিল না। মেসের চাকরাণী বলিল, "ভজহরি বাবু বলিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহার বাসায় ফিরিতে অধিক রাত্রি হইবে।" মতি ভজহরির ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার শয্যার নিকটে ঘরের মেজের উপর কতকগুলি কাগজের টুকরা পড়িয়া আছে। সে সেই ছেঁড়া কাগজগুলি একত্রে যোজনা করিয়া দেখিল তাহা একখানি চিঠি। এই চিঠিতে ভজহরিকে রাত্রি ১১টার পর তারিণী বেওয়ার বাড়ীতে রাধাবল্লভ বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে বলা হইয়াছিল। ইহাতে লেখকের নাম ছিল না। চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিলেই তাহার অস্তিত্ব লোপ হয় না।

মতি আহার করিয়া ১০টার মধ্যে ঘরের আলো নিবাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিল। নিদ্রা যাওয়া তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। ভজহরি আসিলেও যেন দরজা বন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া যায়, তাহার সহিত এখন দেখা না হয়, ইহাই মতির ইচ্ছা। সে এক ঘণ্টা এই ভাবে শুইয়া রহিল। তারপর উঠিয়া কোট গায়ে দিল, তোরঙ্গ হইতে ঠাসা পিস্তলটি লইয়া পকেটে

রাখিল, এবং একখানি বালাপোষে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দরজায় শিকল দিয়া বাহির হইয়া গেল।

মতি তারিণী বাড়ীওয়ালীর বাড়ী চিনিত। এই বাড়ীতে ভজহরির মাতুল প্রেমচাঁদ কড়ারী থাকিত। এই প্রেমচাঁদের সনাক্ত ও এজাহারেই মতি বিধুভূষণ প্রভৃতির মেয়াদ হইয়াছিল। বিশেষতঃ এই পীঠস্থানে রাত্রে রাধাবল্লভ বাবু সদলে আসিয়া আনন্দ করিতেন, ইহা সকলেই জানিত। মতি বুঝিয়াছিল, ভজহরি গোপনে এইখানে আসিয়া রাধাবল্লভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। তাহার অনুমান মিথ্যা হয় নাই। মতি যখন এই বাড়ীর পিছনে আসিয়া পৌঁছিল, তখন একটি ঘরের ভিতর হইতে রাধাবল্লভের সুরাবিকৃত স্বর তাহার কাণে আসিল।

রাধাবল্লভ বলিতেছিল—"মনের বল থাকা চাই; যার মনের বল নেই, সে-ই এসকল কাজ গোপনে করে?"

দারোগা দীনদয়াল বলিল—"তা নয় ত কি? পাপ পুণ্য হচ্চে মনের মারপ্যাঁচ। একটু মদ খেতে বা মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিতে যার সঙ্কোচ হয়, তার কাছে এসকল পাপকর্ম্ম; আর যে লোক বেপরোয়া এসব করতে পারবে, তার কাছে পুণ্যকর্ম্ম। রাধাবল্লভ বাবু, আপনি ভগবানের অস্তিত্ব মানেন?"

রা। নিজে ঠিক না মানলেও, আমি তর্কযুক্তির দ্বারা ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ ক'রে দিতে পারি। To believe in God is science!*

দী। ভগবান্ যদি সর্ব্বশক্তিমান হন, তা'হলে ত তিনি

* ঈশ্বরে বিশ্বাস করা হচ্চে একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাপার!

বাঘভাল্লুকের চেয়ে লক্ষগুণ ভয়ঙ্কর! আমি বলি, ভগবান্ থাকেন থাকুন, তাঁকে ঘেঁটিয়ে কাজ নেই।

রা। ভয় নেই হে ভায়া! অত্যন্ত বুড়ো হয়ে ভগবান্ এখন একদম দন্তহীন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গেছেন। তাঁর আর আঁচড়াবার কামড়াবার শক্তি নেই।

এই সময় ভজহরি সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া দীনদয়াল বলিয়া উঠিল, "এই যে ভজহরি এসেছে!"

রাধাবল্লভ বলিল—"তোর বজ্রবন্ধন বুঝি ফস্‌কে গেল রে ভজা! তুই এঁড়েদহে নন্দদের বাড়ীতে কী ব্যাগ রেখে এসেছিলি? তারা তা খুলে দেখেছে। তোর ব্যাগের ভিতর কি কি ছিল?"

ভজ। দু'টা রিভল্‌ভার, কতকগুলি কার্ট্রিজ্, খানকতক 'যুগান্তর', আর সুরেশ ও নন্দদের কয়েকখানা চিঠি। আর একটা টিনের মধ্যে ছিল খানিকটা প্রিক্রিক্ অ্যাসিড্। কেন কি হয়েছে?

রাধা। হয়েছে তোর মাথা আর মুণ্ড! হিমী ছুঁড়ী তোর ব্যাগ খুলে দেখেছে; দেখে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে।

দীন। এখন তাদের বাড়ী সার্চ্চ ক'রে আর কোন ফল হবে না।

রাধা। আমি হতভাগাকে পই পই ক'রে ব'লে দিয়েছিলুম, ছুঁড়ী ভারি ধড়ীবাজ—খুব হুঁসিয়ার হয়ে কাজ না করলে তাকে ফাঁদে ফেল্‌তে পারা যাবে না।

ভজ। আমি ত হেমাঙ্গিনীর কাছেই ব্যাগ গছিয়ে এসেছিলুম; তার তোরঙ্গের মধ্যে রাখতে বলেছিলুম। আমার দোষ কি? এই এক চালেই যে চৌধুরী মাৎ হ'ত। আমি যা করে এসেছিলুম, তাতে এখানকার এনার্কিষ্টদের সঙ্গে সুরেশরাও ধরা পড়্‌ত, আর হেমাঙ্গিনীও গ্রেপ্তার হয়ে এখানে চালান আস্‌ত।

রাধাবল্লভ দীনদয়ালকে বলিল—"ওহে ভাই! এ ব্যাটার কর্ম্ম নয়। একটা পাকা তোখড় লোককে লাগাও। হিমী ছুঁড়ীকে পাকড়াও ক'রে একবার এখানে আনাতেই চাও!"

মতি জানালার বাহিরে এক গাছের আড়াল থেকে নিসাড়ে কাণ খাড়া করিয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল। শুনিতে শুনিতে তাহার রক্ত গরম হইয়া মাথায় চড়িয়া গেল। সে মনে মনে বলিল, "ভগবান্ যে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়েছেন, একথা ঠিক! তোমাদের মত পাপীর দণ্ডবিধান করা তাঁর সাধ্যাতীত! একাজ আমিই করছি।"—বলিয়া মতি কোনও ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য না করিয়া সমগ্র দলের প্রতি উপর্য্যুপরি চারিবার রিভল্‌ভার্ ছুঁড়িল। ভজহরি ও দীনদয়ালকে গুলি লাগিল না। একটি গুলি রাধাবল্লভের হৃদ্‌পিণ্ড ভেদ করিল। সে "বাপ্ রে! বাঁচা রে!" বলিয়া পড়িয়া গেল। আর কেহ আহত হইল না।

ঘরের ভিতর দুই জন স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে যে যেখানে পারিল পালাইয়া গেল। ভজহরি ও দীনদয়াল সর্ব্বপ্রথমেই অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল।

কিছু সময়ের মধ্যে পুলিসের লোকে ঘটনাস্থল ভরিয়া গেল। তাহারা তারিণীর বাড়ীর সম্মুখস্থ পথে সেরাত্রে সাধারণের যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিল। প্রাতে এই ভীষণ হত্যার সংবাদ সহরের চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কৃষ্ণনগরের অনেক উকিল ও অন্যান্য লোক আসিয়া দেখিল রাধাবল্লভের মৃতদেহ বেশ্যালয়ের সম্মুখে সদর রাস্তার উপর শোণিত-সমুদ্রে ভাসিতেছে। পানওয়ালী গোলাপী আসিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব অকুস্থলে আসিলেন। পুলিসের বড় সাহেব তাঁহার বহুপূর্ব্বে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অনুমান করিয়া বলিলেন যে, কোনও বেশ্যাসক্ত পুরুষ সম্ভবতঃ রাধাবল্লভ বাবুকে তাহার প্রেমের পথে প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রম করিয়া ঈর্ষা বশতঃ হত্যা করিয়াছে। সাধারণে জানিল, ইহা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নহে। যাহা হউক, তদন্ত চলিতে লাগিল।

[২২]

সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।

হত্যা করিয়া পালাইয়া আসিবার সময় মতিকে কেহ অনুধাবন করে নাই। পিস্তলটি তাহার হাতেই ছিল, এবং তাহাতে তখনও একটি টোটা ভরা ছিল। বাসায় আসিয়া মতি পিস্তলটি মাথার বালিসের নিচে রাখিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার হাতের কাছে হাতিয়ার থাকা আবশ্যক—কি জানি, যদি কেহ ধরিতে আসে?

কিছুক্ষণ পরে মতির মনে হইল, সে ঘরের দরজা বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। উঠিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল, দরজা অর্গলবদ্ধ আছে। সে পুনরায় শয়ন করিল। তাহার মনে হইল, দুই রগ ফাটিয়া যাইতেছে। সে মাথায় কসিয়া চাদর বাঁধিল। পিপাসায় তাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইল, বাহিরে কাহার পদশব্দ হইল। মতি কাণ খাড়া করিয়া রহিল; নিজের বুকের ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ ব্যতীত আর কোনও শব্দ তাহার কাণে আসিল না। এই পৌষ মাসের শীতেও তাহার অত্যন্ত গরম বোধ হইতে লাগিল। সে শয্যায় উঠিয়া বসিল,—দেখিল গায়ের কোট ও বালাপোষ খুলিতে ভুলিয়া গিয়াছে। সে মনে করিল, এই সকল জড়াইয়া লেপের মধ্যে শয়ন করায় তাহার গরম বোধ হইতেছিল। গায়ের সমস্ত কাপড়চোপড় খুলিয়া ফেলিয়াও মতি স্বস্তি বোধ করিল না। সে দরজা খুলিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। আকাশে নক্ষত্র দেখিতে পাইল না। দেখিল, ঘোরঘনঘটাচ্ছন্ন গগন যেন এক ভীষণ তমসাচ্ছন্ন বিরাট গহ্বরের ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া আছে। মতি ভয় পাইল; তাহার হৃদ্‌কম্প হইতেছিল। সে ঘরের মধ্যে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল, কিন্তু খিল দিতে ভুলিয়া গেল।

মতি শয়ন করিল। এবার তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। কিছুক্ষণ নিদ্রার পর ভোর রাত্রে মারামারির গোলমালে এবং ঘরের দরজা খুলিয়া যাওয়ার শব্দে মতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠিয়া বসিল। দেখিল, বারাণ্ডায় মেসের

লোকেরা কয়েকজন অপরিচিত লোকের উপর খুব মারপিট করিতেছে। ইহারা সম্ভবতঃ কোনও মন্দ অভিপ্রায়ে এত রাত্রে মেসে ঢুকিয়াছিল। একজনের মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল, এবং আর তিন জনের গা থেকে রক্ত পড়িতেছিল। সকলে "পুলিস পুলিস" বলিয়া চীৎকার করিতেছিল। মার খাইতে খাইতে বদমায়েসগণ পালাইয়া গেল। পুলিসের নাম শুনিয়া মতি বিছানা হইতে নামিয়া ঘরের বাহির হইতে সাহস করিল না। ক্রমে সকল গণ্ডগোল থামিয়া গেল। মেসের লোকেরা যে যার ঘরে প্রবেশ করিল। মতি পুনরায় শয্যায় শুইয়া পড়িল। পরক্ষণেই মেসের চাকর আসিয়া ডাকিল। বলিল, "বাবু, চা তৈরী হয়েছে।" মতি চক্ষু মেলিয়া তাহাকে মারপিটের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। চাকর বলিল—"কৈ, মারপিট ত হয় নি, আপনি স্বপ্ন দেখে থাকবেন।"

চাকর চলিয়া গেলে বেণী মতির ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল মতি তখনও শুইয়া আছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হে, এত বেলা হয়েছে, এখনও শুয়ে আছ?"

মতি গায়ের লেপ খুলিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল। বেণী দেখিল, তাহার এক পায়ে জুতা ও ষ্টকিং আঁটা রহিয়াছে। বলিল —"কি হে, তুমি যে শোবার সময় এক পায়ের জুতা মোজা খুল্‌তে ভুলে গিয়েছিলে।"

মতি অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"হাঁ ভাই, তাই ত বটে। কাল ভাই রাত্রে ভারি অসুখ করেছিল, ভয়ানক মাথা ধরেছিল।"

বেণী দেখিল, মতির মুখ বাস্তবিকই অত্যন্ত বিবর্ণ ও বিশীর্ণ। বলিল—"এখন কি রকম বোধ করছ?"

মতি। এখনও মাথা সম্পূর্ণ ছাড়েনি।

বেণী। তবে না হয় আরও একটু ঘুমোও, তা'হলে মাথা ছেড়ে যাবে অখন।

বেণী চলিয়া গেল। কিন্তু মতির আর নিদ্রা হইল না। নিদ্রা যে এখন কিছুদিনের মত তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

খানিক পরে ভজহরি মেসে রাধাবল্লভের খুনের সঠিক সংবাদ আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহা লইয়া সকলে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল, ইহা পলিটি-ক্যাল্ হত্যাকাণ্ড। ভজহরি বলিল—"তা হোতেই পারে না। রাধাবল্লভ বাবু ত পুলিসের লোক ছিলেন না। স্বদেশী ছেলেরা তাঁকে হত্যা করবে কেন? বেশ্যালয়ে সচরাচর যা ঘটে থাকে, এ তাই।"

ভজহরি বেণীর মুখে শুনিল যে, মতির অসুখ করিয়াছে। সে তাহার ঘরে দেখিতে গেল। ভজহরি ঘরে প্রবেশ করিলে মতি তাহাকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল, এবং তাহার দিকে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া দেখিল। ভজহরি তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। তাহারও মনের অবস্থা তদ্রূপ; সে কি লক্ষ্য করিবে?

ভজহরি যখন তাহার নিকট রাধাবল্লভ বাবুর খুনের খবর বলিল, তখন মতি তাহা চুপ করিয়া শুনিল, কোনও চিত্ত-

চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। ভজহরি বলিল—"বিধুবাবুকে একবার এই সংবাদটি দিয়ে আসা আবশ্যক। কিন্তু তুমি কি তা পারবে? শুন্‌লাম তোমার নাকি অসুখ করেছে?"

মতি বলিল—"আমার ভয়ঙ্কর মাথা ধরেছে, আর জ্বরের মত বোধ হচ্চে। আমি বিছানা থেকে উঠতে পারছি না।"

তখন মতির পরিবর্ত্তে বেণী এই সংবাদ লইয়া বিধুভূষণের বাসায় রওয়ানা হইল। অল্পকাল পরে সে ফিরিয়া আসিয়া মেসের সকলকে বলিল যে, বিধুবাবু ও অন্যান্য স্বদেশী যুবক-দিগের বাড়ী সার্চ্চ হইতেছে। ইহা শুনিয়া ভজহরি বলিল —"আমাদের মেস বোধ হয় সার্চ্চ হবে না। তা'হলে এতক্ষণে পুলিস আসিয়া ঘেরাও করিত।"

ভজহরির কথাই সত্য হইল। তাহাদের মেস সার্চ্চ হইল না। হইলে ভজহরির তোরঙ্গ হইতে অনেক অদ্ভুত মারাত্মক জিনিস বাহির হইয়া পড়িত; এবং রিভল্‌ভার্ সমেত মতিও ধরা পড়িত। যাহা হউক, সে এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল। স্বদেশী করিয়া মতি ও বেণী পূর্ব্বে মেয়াদ খাটিয়াছিল। তাহাদের মেস সার্চ্চ না হওয়ায় কেহ কেহ আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিল।

[২৩]

অন্তর্দ্ধান।

পুলিস স্বদেশী ছেলেদের তাড়াহুড়া করিয়া এবং তাহাদের বাসা ও বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া সমাজের জল ঘোলা করিয়া তুলিল মাত্র; কোথাও কিছু পাওয়া গেল না—কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইল না। মাছ ধরিতে ধরিতে জল ঘোলা হইয়া উঠিলে মাছ ধরা স্থগিত করিতে হয়—ঘোলা জলের ভিতর দিয়া নজর চলে না; সুতরাং জল থিতাইবার জন্য অপেক্ষা করা আবশ্যক। কৃষ্ণনগরের পুলিসও তাহাই করিতেছিল।

রাধাবল্লভের দেহের মধ্যে যে বুলেট্ পাওয়া গিয়াছিল, তদবলম্বনে দারোগা দীনদয়াল সব্-জজ্ বাহাদুরের বাড়ীতে গিয়া কুমুদনাথকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার রিভল্ভার্ কোথায়?"

কুমুদ বলিল—"এই যে ড্রয়ারের মধ্যে আছে।" এই বলিয়া সে দীনদয়ালের সম্মুখে ড্রয়ার খুলিয়া দেখিল সেখানে রিভল্ভার্ নাই, কেবল লাইসেন্স্খানি পড়িয়া আছে। সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কি সর্ব্বনাশ! রিভল্ভার্ যে এর মধ্যে ছিল, কি হোল, কোথায় গেল?" বলিয়া কুমুদ তাহার যাবতীয় বাক্স পেটারা ওলট্ পালট্ করিয়া খুঁজিতে লাগিল, কোথাও পাওয়া গেল না। তখন সে হতাশ হইয়া দীনদয়ালকে বলিল,—"নিশ্চয়ই কেহ চুরি করিয়াছে। আপনি নোট করিয়া লউন, আমার রিভল্ভার্ চুরি গিয়াছে।"

দীনদয়াল বলিল—“কবে আপনি এই ড্রয়ারের মধ্যে রিভল্‌ভার্ রেখেছিলেন?”

কুমুদ বলিল—“প্রায় এক মাস পূর্ব্বে। সেই অবধি আমি আর ড্রয়ার খুলি নাই।”

দীনদয়াল বলিল—“ড্রয়ারের চাবি কাহার কাছে থাকিত?”

কুমুদ বলিল—“রিংএর মধ্যে অন্যান্য চাবির সঙ্গে এই চাবি থাকিত। চাবির থোল কখন আমার কাছে থাকিত, কখন টেবিলের উপর পড়িয়া থাকিত।”

দীনদয়াল কুমুদের এই সকল কথা, এবং লাইসেন্স্ হইতে রিভল্‌ভারের নম্বরাদি লিখিয়া লইয়া চলিয়া গেল। আপাততঃ রাধাবল্লভের খুনের কিনারা হইল না। তদন্ত ও সার্চ্চের হুড়াহুড়ি বন্ধ হইল।

মতি আজ এক সপ্তাহ জ্বর ভোগ করিতেছে; বেণী তাহার শুশ্রূষা করিতেছে। আজ ১০৫° ডিগ্রি জ্বর হওয়ায় মতি প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল। বেণী তাহার কপালে জলপটি দিয়া বাতাস করিতেছিল। মতির অসুখের খবর পাইয়া বিধুভূষণ তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে। রোগী অর্দ্ধতন্দ্রাবস্থায় ছিল। বিধুভূষণ গায়ে হাত দিবামাত্র সে “পুলিস, পুলিস” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে অসংলগ্নভাবে আরও কত কি বকিতে লাগিল; একবার রাধাবল্লভের নাম করিল।

বিধুভূষণ বেণীকে দরজা বন্ধ করিয়া দিতে বলিল। তাহা করা হইলে বিধুভূষণ স্বয়ং ঘরের মধ্যে কিঞ্চিৎ খানাতল্লাস

আরম্ভ করিল। মতির মাথার বালিসের নিচে যে রিভল্‌ভার্ সাত আট দিন হইতে রহিয়াছে, তাহাই সর্ব্ব প্রথমে বাহির হইয়া পড়িল। বিধুভূষণ বলিল—"বেণী, রাধাবল্লভকে কে খুন করেছে তা কি তুমি বুঝতে পেরেছ?"

বেণী কিছু উত্তর করিল না। বিধুভূষণ বলিল—"কাল তুমি স্নান করিতে যাইবার সময় এই রিভল্‌ভার্‌টি তোমার কাপড়-গামছায় জড়াইয়া লইয়া গিয়া নদীতে ফেলিয়া দিবে। আমি ইহা নিজে লইয়া যাইতাম। কিন্তু আজকাল সর্ব্বদাই আমার পিছনে লোক লাগিয়া থাকে।"

বেণী একার্য্য করিতে সম্মত হইল। বিধুভূষণ তাহাকে বলিল—"আমি তোমাকে আর একটি বিষয়ে সতর্ক করিতে চাই। তুমি ভজহরিকে বিশ্বাস ক'র না। মতির প্রলাপের সময় এঘরে ভজহরির প্রবেশ করা তোমাকে কৌশলে নিবারণ করতে হবে। এই প্রলাপ থেকে ভজহরি বুঝতে পারবে, মতিই রাধাবল্লভের হত্যাকারী।" মতিও ইতিপূর্ব্বে একদিন বেণীকে ভজহরি সম্বন্ধে একটু সাবধান করিয়াছিল। সুতরাং এখন বেণী আর এ বিষয়ে বিধুভূষণকে কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

রাত্রি ১০॥টার সময় বিধুভূষণ আপনার বাসায় ফিরিয়া আসিল। দুশ্চিন্তায় সে রাত্রে তাহার ভাল নিদ্রা হইল না। হত্যাকারী আপনাকে চিরদিন গোপন রাখিতে পারে না। মতি যে একদিন ধরা পড়িবে, বিধুভূষণ সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিল। সে ভাবিল, মতি যখন ধরা পড়িবে, তখন তাহার সঙ্গে

এখানকার আর সকল স্বদেশী যুবককেও ধরা হইবে, এবং সকলকে জড়াইয়া পুলিস সম্ভবতঃ একটি বড় গ্যাং-কেস দাঁড় করাইবে।

বিধুভূষণ এখন রাজনৈতিক গুপ্তহত্যার সম্পূর্ণ বিরোধী। সুতরাং বিনা অপরাধে তাহার আর আসামী সাজিয়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইবার বা martyr* হইবার সাধ নাই। কিন্তু তাহার সাধ না থাকিলেও পুলিস তাহাকে ছাড়িবে কেন? সে যে দলপতি। বিধুভূষণ বুঝিল, এই জন্যই সি-আই-ডির লোক সর্ব্বদা তাহার অনুসরণ করিতেছে। ইহাতে সে যার-পর-নাই বিরক্তি বোধ করিতে লাগিল।

বিধুভূষণ মুরশিদাবাদে আসিয়া এক পরিচিত ব্যক্তির বাসায় পাঁচ ছয় দিন থাকিল। এখানেও দেখিল পুলিসের চর অষ্টপ্রহর তাহার পিছনে লাগিয়া আছে। সে পলাইয়া যাইবার সংকল্প করিল, এবং তাহার উপায়ও স্থির করিল। কচ্ছপ যেমন আবশ্যকমত আপনার খোলের মধ্যে হস্তপদাদি লুকায়িত করে বিধুভূষণ সেইরূপ একটি বরখার মধ্যে আপনার সর্ব্বাবয়ব লুক্কায়িত করিয়া মক্কার ফেরত হাজী রমণী সাজিয়া একদিন দ্বিপ্রহরে সহরের পুলিস-ষ্টেশনের সম্মুখ দিয়া সশরীরে চিরদিনের জন্য অন্তর্দ্ধান হইল।

---

* কোনও সদুদ্দেশ্যে যে লোক প্রাণবিসর্জ্জন করে।

[২৪]

ডাক্তারের চুক্‌ভুল।

আজ অত্যন্ত দুর্য্যোগ। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। আকাশ ঘনকৃষ্ণমেঘাচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে জোর বাতাসের সঙ্গে মুষল ধারে বৃষ্টি হইতেছে—পৌষের শেষে যেন বর্ষাকাল উপস্থিত। শীত চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু তথাপি সুলোচনা দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল—তাহার গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছিল। সোণা-ঝী ও আর একজন পরিচারিকা তাহার কাছে বসিয়া গায়ের ঘাম মুছাইতেছিল ও অল্প অল্প বাতাস করিতেছিল। রসিক আসিয়া ইতিমধ্যে দুইবার দেখিয়া গিয়াছিল।

আজ দুইদিন হইল সুলোচনা পেটের যন্ত্রণা ও জ্বরে শয্যাগত হইয়াছে। রসিক ভাবিয়াছিল, এ রোগে ডাক্তার ডাকিতে হইবে না। কিন্তু রাত্রি ১১টার পর হইতে অতিরিক্ত ঘাম হইতে আরম্ভ হইয়া রোগীর হাত পা বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া পড়ায় রসিক ভয় পাইয়াছিল। অগত্যা তাহাকে এত অধিক রাত্রে এই দুর্য্যোগেও ডাক্তার মহেন্দ্রবাবুকে ডাকিয়া আনিতে হইল। মহেন্দ্রবাবু কাশীনাথ বাবুর আমল হইতে এই বাড়ীর ফ্যামিলী-ডাক্তার। তিনি বাড়ীর সকলকেই চিনিতেন। রাধাবল্লভ বাবুর সঙ্গেও তাঁহার এই বাড়ীতে পরিচয় হইয়াছিল।

মহেন্দ্রবাবু আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, সুলোচনার সমস্ত পেট ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং তাহাতে এত বেদনা

হইয়াছে যে, স্পর্শ করিলে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ ও ভয়প্রদ। মুখ বিবর্ণ ও বিকৃত। জ্বর নাই, গায়ের উত্তাপ স্বাভাবিকের অনেক নিম্নে—হাত পা হিম। তিনি রোগের কারণ সম্বন্ধে রসিককে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর পাইলেন না।

ডাক্তারবাবু ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"পেরিটো-নাইটিস্ হয়েছে, রোগ অত্যন্ত কঠিন, অবস্থাও তত ভাল নয়।" প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনে তিনি তিনচারি রকম ঔষধ লিখিলেন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ষ্টিমুলেণ্ট্ চালাইতে বলিলেন, পেটের জন্য প্রলেপ ও পুল্‌টিসের ব্যবস্থা করিলেন, এবং একজন পাশ করা দাই ডাকাইয়া রোগীর নিকট মোতায়েন রাখিতে পরামর্শ দিয়া ডবল ফীস্ লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার ব্যবস্থামত সকল কাজই হইতে লাগিল, কেবল আপাততঃ দাই ডাকা হইল না।

চিকিৎসার সমস্ত আয়োজন করিয়া দিয়া রসিক নিজের ঘরে গিয়া একটু শয়ন করিল। রোগীর অপেক্ষাও তাহার ভয় ও দুশ্চিন্তা অধিক হইয়াছিল। কেন? তাহার মনে কি কিছু পাপ ছিল? বাহিরে যেমন দুর্য্যোগ, তাহার মনের ভিতরেও ততোধিক দুর্য্যোগ। যেন ক্রুদ্ধা প্রকৃতি তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া পাপের প্রতিশোধ লইতেছিল। সেকারণে রসিকের সহজে নিদ্রাকর্ষণ হইল না। শেষরাত্রে তাহার তন্দ্রার সঙ্গে নানাবিধ দুঃস্বপ্নজড়িত একটু নিদ্রা হইয়াছিল।

ভোর হইতে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। বেলা ৭টার

সময় ডাক্তার মহেন্দ্রবাবু আসিলেন। তিনি দেখিলেন, রোগীর অবস্থা প্রায় সমভাবেই আছে,—সুবিধার মধ্যে নাড়ী একটু ভাল হইয়াছে, এবং পেটের যন্ত্রণাও যেন একটু কম বলিয়া মনে হইল।

মহেন্দ্রবাবু ঔষধাদির কিছুই পরিবর্ত্তন করিলেন না। রোগীর পথ্যের জন্য তিনি দুধ ও সোডা-ওয়াটারের ব্যবস্থা করিয়া রসিককে বলিলেন—"ওহে সরকার মশাই! তোমাদের বাড়ী সকাল সকাল আস্‌তে হোল ব'লে আমার আজ চা খাওয়া হয়নি। একটু চা যোগাড় ক'রে দিতে পার?"

"যে আজ্ঞা, তার আর ভাবনা কি, এখনি আনাচ্ছি"—বলিয়া রসিক একজন চাকরকে ডাকিয়া চা আনিতে বলিল। ডাক্তারবাবু সুলোচনার শয্যার কাছে একখানি চেয়ারে বসিয়া পকেট হইতে একখানি সদ্য প্রাতে ছাপা ভিজা খবরের কাগজ বাহির করিয়া খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আজ কাগজও পড়া হয় নাই। এটি তাঁহার নিত্য চা পানের সমসাময়িক কর্ম্ম ছিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে চাকর এক কাপ্‌ গরম চা এবং সাগ্নিক ছিলিমযুক্ত আলবোলা তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া গেল। তখন মহেন্দ্রবাবুর সংবাদপত্র চা ও তামাকু, এই তিন বস্তুর সেবন একসঙ্গে চলিতে লাগিল,—চায়ের পেয়ালা ও আলবোলার নল প্রতি মিনিটে পর্য্যায়ক্রমে মুখে উঠিতেছিল। রসিক সরকার দাঁড়াইয়া রহিল। কাগজ পড়িতে পড়িতে মহেন্দ্রবাবু বলিয়া উঠিলেন—"এ কি হে! তোমাদের রাধাবল্লভ বাবু যে খুন হয়েছেন দেখছি! কে

তাঁকে সদর রাস্তার উপর গুলি করে মেরেছে—আসামী এখনও ধরা পড়েনি।"

রসিক বলিল—"সে কি মশাই! কোথাকার রাধাবল্লভ বাবু?"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—"আহা এই যে কাগজে লিখেছে হে, কৃষ্ণনগরের গভর্ণমেণ্ট-প্লীডার রাধাবল্লভ বাবু—তোমাদের বউ ঠাকরুণের ভগ্নীপতি; আমি কি তাঁকে চিনিনি?"

এই কথা শুনিবামাত্র সুলোচনা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। "হাঁ হাঁ, কর কি?—চুপ কর, চুপ কর, কেঁদো না, তোমার পেটে বেদনা, এখনি একটা বিভীষিকা ব্যাপার হবে—তোমার নিজের প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে।"—এই বলিয়া মহেন্দ্রবাবু তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে সুলোচনার কান্না আরও বাড়িয়া গেল। ডাক্তারবাবু প্রমাদ গণিলেন। বলিলেন—"কি সর্ব্বনাশ করলুম? রোগী এ অবস্থায় এ রকম করে কাঁদলে যে মারা যাবে?"

তখন রসিক, সোণা-ঝী ও ডাক্তারবাবু সকলে মিলিয়া পনের বিশ মিনিট ধরিয়া সাধ্য সাধনা করিয়া সুলোচনাকে কতকটা শান্ত করিল। সে অত্যন্ত হাঁপাইতে লাগিল। ডাক্তার বাবু এই অবস্থায় সরিয়া পড়িলেন। যাইবার সময় রসিককে বলিয়া গেলেন—"খুব সাবধান! রাধাবল্লভ বাবুর খুনের খবরে রোগীর যেরূপ 'শক্' লেগেছে, তা'তে রোগ হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে। অতএব তোমরা খুব সতর্ক থাকবে, যেন কোন তদ্বিরের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় না।"

[২৫]

বজ্রাঘাত।

বৈকালে সুলোচনার প্রবল বেগে জ্বর আসিল। গায়ের উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রিরও উপরে উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বাহির হইবার মত শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহার জ্ঞানের কোনও বৈলক্ষণ্য হইল না।

মহেন্দ্রবাবুকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "যা ভেবেছিলুম, তাই হয়েছে, আর রক্ষা নাই।" যাহা হউক তিনি আধ ঘণ্টার মধ্যে একজন সাহেব ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া হাজির হইলেন। তাঁহারা রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর ও বিমর্ষভাবে পরস্পরে কি বলাবলি করিলেন। পরে মহেন্দ্রবাবু রসিককে চুপে চুপে বলিলেন—"মৃত্যুর আর বড় বিলম্ব নাই; এই জ্বরের উপরেই প্রাণত্যাগ হবে।"

সুলোচনাও বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহার অন্তিমকাল উপস্থিত। অনেক সময় মৃত্যুর সান্নিধ্যে সত্যের উপলব্ধি হয়। ডাক্তারদিগের সম্মুখেও সুলোচনার লজ্জার বন্ধন ঘুচিয়া গেল। তাহার হৃদয়ের ভিতর প্রাণবায়ু উন্মত্ত হইয়া তুমুল ঝড় তুলিয়াছিল। শ্বাসের সঙ্গে তাহার বক্ষস্থল স্ফীত হইতেছিল, হৃদ্‌পিণ্ডে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছিল, এবং আপাদমস্তক দেহতরু কম্পিত হইতেছিল। রসিককে সম্মুখে দেখিয়া সুলোচনার চক্ষু হইতে বিদ্যুতের অগ্নিময়ী জ্বালা বাহির হইল,—তৎসঙ্গে তৎক্ষণাৎ মুখ হইতে বজ্রধ্বনি নিঃসারিত হইয়া তাহাকে

আহত করিল। রসিককে লক্ষ্য করিয়া চিরমুখরা সুলোচনা বলিয়া উঠিল—"আঁটকুড়ীর ব্যাটা! তুই-ই আমায় নষ্ট করেছিলি, তুই-ই আমার গর্ভের কারণ, তুই-ই আমার গর্ভস্রাবের ওষুধ দিয়েছিলি—তুই-ই আমার যম! আমি তোকে এখন চিন্‌তে পেরেছি। তুই আমার সাম্‌নে থেকে দূর হ!"

গৃহের মধ্যে সকলে নিস্পন্দ পুত্তলিকার ন্যায় নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ডাক্তার সাহেব সুলোচনার কথার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। মৃতকল্প রসিক দুই হস্তে চক্ষু ঢাকিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। পেচক দিবালোকে চক্ষু মুদ্রিত করে। স্বপ্রকাশিত সত্যের আলোক রসিকের সহ্য হইল না।

সুলোচনা সম্ভবতঃ আরও খানিকক্ষণ বাঁচিতে পারিত। কিন্তু এই উত্তেজনার ফলে তাহা হইল না। তাহার প্রাণবায়ু মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রশ্বাসের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। সোণা ও অন্যান্য সকলে কাঁদিয়া উঠিল। ডাক্তারেরা ফীস্ না পাইয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। কে তাঁহাদিগকে ফীস্ দিবে? রসিক সরকার যে নিরুদ্দেশ!

[২৬]

সুখ-স্বর্গ।

আজ প্রায় তিন বৎসর হইল সুরেশ ও পারুল বাগবাজারের বাটীতে পরলোকগত কাশীনাথ বাবু ও সুলোচনার স্থান অধিকার করিয়াছে। এ রঙ্গমঞ্চে কোন কোন পুরাতন অভিনেতৃর নিষ্ক্রমণ ও নূতন অভিনেতৃর সংক্রমণ হইয়াছিল মাত্র; দৃশ্যপটের বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। সাবেক দাসদাসী লোকজনের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিল। সেই ভাগলপুরে গাই, মুঙ্গেরে মটুকি ও কটকী ম্যাড়া আছে, সোণা-ঝী ত আছেই।

লোকজনের মধ্যে নাই কেবল রসিক। আর সে-ই যে নাই তাহাই বা বলি কি করিয়া? সে যে সোণার হৃদয়-কন্দরে জ্বালাময় স্মৃতিরূপে ছাই ঢাকা আগুনের মত লুকাইয়াছিল, তাহার একটু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। পারুলের কথার বাতাসে একদিন এই ছাই উড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। সে এক সময়ে রসিকের কথা পাড়িয়া কি বলিতেছিল। তাহা শুনিয়া সোণা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"সে পোড়ারমুখোর কথা আর ব'ল না দিদিমণি! তার নাম করলে পাপ হয়।" যে একদিন কোনও স্থানে কাহারও কাছে কোনও রকমে ধরা দিয়াছে, তাহার আর সম্পূর্ণরূপে পালাইবার উপায় নাই। তাই সুলোচনাও বোধ করি এবাটী হইতে একেবারে পালাইতে পারে নাই। এক অমাবস্যার গভীর রাত্রে সোণা বহির্বাটীর চৌবাচ্চা হইতে হাত

মুখ ধুইয়া আসিবার সময়, রসিক পূর্ব্বে যে ঘরে থাকিত, সেই ঘরের জানালার কাছে সুলোচনার আবছায়া দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। সম্ভবতঃ সুলোচনা সূক্ষ্মদেহে সরকার মশায়ের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, আর বৈঠকখানায় চিত্রার্পিত কাশীনাথ বাবু মুক্ত বাতায়ন-পথে তাঁহার প্রেতযোনী সহধর্ম্মিণীর সেই অপূর্ব্ব প্রেমলীলা অবলোকন করিয়া দেওয়ালের সঙ্গে চ্যাপ্‌টা হইয়া মিশিয়া যাইতেছিলেন।

সুরেশের সঙ্গে তাহার জননীর আপোষ হইয়া গিয়াছে। কৃপাময়ী যে মহলে থাকিতেন, সেই মহলে এখন দয়াময়ী থাকেন। পারুলের শিশু সনৎকুমার তাঁহার কণ্ঠের হার। পঞ্চানন বাবু এখন এই বাড়ীতেই বাঁধা পড়িয়াছেন। পারুল তাঁহাকে বলিয়াছিল—"মামা! আপনি আমাদের বিবাহ দিয়ে সংসারী করেছেন, সুতরাং আপনাকেই আমাদের অভিভাবক হয়ে থাকতে হবে। আমাদের মাথার উপর আর কেউ নেই।"

পূর্ব্ব-অভ্যাসমত এখানেও পাঁচুমামার নানাবিধ সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি পাঠ চলিত। সনৎকুমার তাঁহাকে 'দাদা মোছাই' বলিয়া ডাকিত। সন্টুবাবু সন্ধ্যার সময় তাহার ঠাকুরমার কাছে যে সকল রূপকথা শুনিত, পরদিন আধ আধ স্বরে তাহা দাদামশায়ের কাছে অবিকল বলিত। এক একটি গল্প বলা শেষ হইলে দাদা মশাই তাহাকে একটি করিয়া চুম্বন পারিতোষিক দিতেন। পাড়ার আরও কয়েকটি শিশু পাঁচুবাবুর কাছে সর্ব্বদা আসিত। তাহারা তাঁহাকে ভালবাসিত। বৃদ্ধ বয়সে রক্ত ও মন ঠাণ্ডা হইয়া আসে, হৃদ্‌পিণ্ডের অবসাদ

উপস্থিত হয়। সন্তান-সন্ততির সান্নিধ্য ও তাহাদের প্রেমের উত্তাপই বৃদ্ধদিগকে বাঁচাইয়া রাখে। বৃদ্ধ পঞ্চাননের নিজের সন্তান-সন্ততি ছিল না। প্রতিবেশীদিগের এইসকল সন্তানই তাঁহার পক্ষে hot bottles অর্থাৎ গরম-জল-ভরা বোতলের কার্য্য করিত।

এই সুখের স্বর্গে বাস করিয়া সুরেশ তাহার অতীত জীবনের সকল লাঞ্ছনা ভুলিয়া গেলেও, দেশের দীন দরিদ্র ও অনাথদিগের দুঃখকষ্ট ভুলিতে পারে নাই। পাঁচুমামাও তাহাকে ইহা ভুলিতে দেন নাই। সুরেশ বুঝিয়াছিল, দেশের সকল প্রাণীই এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ, সুতরাং সকলের মঙ্গলেই তাহার মঙ্গল—সকলকে সুখী না করিয়া সে স্বয়ং সুখী হইতে পারে না। এই কারণেই সুরেশ সকল রকম সাধারণের হিতকর কার্য্যকেই আপনার প্রিয়কার্য্য বলিয়া মনে করিত। সে কর্ম্মের পথে পদার্পণ করিয়াছে মাত্র; কিন্তু এ পর্য্যন্ত এরূপ কোনও কাজ করিবার সুযোগ পায় নাই।

গত বৎসর বৈশাখ মাসে এঁড়েদহে নন্দলালের মাতার স্বর্গলাভ হইয়াছিল। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে সুরেশ পাঁচুমামার সঙ্গে এঁড়েদহে গিয়াছিল। শ্রাদ্ধাদির পর সে হেমাঙ্গিনীকে বলিয়াছিল—"দিদি! তোমাদের আর এ বাসা রাখিবার আবশ্যক কি? আমাদের এখানকার এত বড় বাগানবাড়ী খালি পড়িয়া আছে। তোমরা সেইখানে গিয়া বাস কর। তা'হলে সেখানে তোমাদের আশ্রয়ে দু'চারজন অনাথ বালকও থাকিতে পারিবে।" হেমাঙ্গিনী ও নন্দলাল এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিল।

[২৭]

মত পরিবর্ত্তন।

গত ছয়মাসের মধ্যে এঁড়েদহের বাগান-বাড়ীতে নন্দলালের তত্ত্বাবধানে একটি ছোটখাট রকমের অনাথাশ্রম গড়িয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে একটি একটি করিয়া প্রায় দ্বাদশটি অনাথ বালক এখানে আশ্রয় পাইয়াছে। হেমাঙ্গিনী অন্নপূর্ণারূপে পাক করিয়া তাহাদিগকে আহার করাইত। ঝুমন আপনাকে এই বালকদিগের সর্দ্দারের পদে বরণ করিয়াছিল। সে বলিত —"আমি হচ্চি এই স্কুলের হেড্‌মাষ্টার!"

কাশীনাথ বাবু দমদমার বাগানে অবিদ্যা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গীয়া মাতা ঠাকুরাণী এঁড়েদহের বাগানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুরেশ এখন এই শিবমন্দিরের ছায়ায় অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিল। 'ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ'। এ সকল প্রতিষ্ঠানই ব্যয়সাধ্য। সুরেশকে এই অনাথাশ্রমের সকল ব্যয়ভার বহন করিতে হইত। এটি তাহার পরার্থে প্রথম কাজ।

পাঁচুমামা ও সুরেশ একদিন এঁড়েদহে অনাথাশ্রম দেখিতে আসিয়া নন্দলালের নিকট শুনিল যে, রাধাবল্লভের হত্যার অপরাধে এতদিন পরে কৃষ্ণনগরের মতির ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। মতিকে ইহারা সকলেই চিনিত। সুরেশ নন্দলালকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি ক'রে এ খবর পেলে?"

নন্দ। কৃষ্ণনগরের উকিল যোগেশবাবু ওপাড়ার মুখুয্যেদের

বাড়ী বিবাহ করেন। তিনি সেদিন এখানে এসেছিলেন। আমি তাঁরই কাছে এ খবর পেলাম। শুন্‌লাম, মতি ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কাছে স্বয়ং গিয়ে অপরাধ কবুল করেছিল। এরূপ না কর্‌লে সে নাকি ধরা পড়ত না। যোগেশবাবু বল্লেন, বিচারের সময় মতি হাকিমকে বলেছিল যে, রাধাবল্লভকে খুন করা অবধি এই কয় বৎসর ধ'রে কে যেন তার প্রাণের ভিতর থেকে চাবুক মেরে সর্ব্বদাই ব'ল্‌ত—'যাও, শীঘ্র গিয়ে অপরাধ স্বীকার ক'রে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর'।

সুরেশ। অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কিন্তু কেন সে রাধা-বল্লভকে হত্যা করেছিল? সে সম্বন্ধে যোগেশবাবু কি বল্লেন?

নন্দ। মতি নাকি বলেছিল, কোন রাজনৈতিক কারণে সে রাধাবল্লভকে হত্যা করেনি। তারা একটি ঘরের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর চক্রান্ত কর্‌ছিল। মতি তখন সেই ঘরের বাহিরে জানালার ধারে পিস্তল হাতে ক'রে আড়ি পেতে সকল কথা শুন্‌ছিল। তাদের কুমন্ত্রণার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে সে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে গুলি চালিয়েছিল। সেই গুলিতে রাধাবল্লভ খুন হয়।

পাঁচুমামা। এর মধ্যে কিছু পলিটিক্যাল্ ব্যাপার থাকা খুব সম্ভব; নচেৎ পিস্তল হাতে ক'রে মতি ওসময়ে সেখানে থাকবে কেন?

নন্দ। ভজহরি এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছিল। সে নাকি ঘটনার স্থলে উপস্থিত ছিল।

পাঁচুমামা। ভজহরি যার ভিতরে ছিল, তা'তে 'স্বদেশীর'

গন্ধ থাকা খুবই সম্ভব। তবে বিচারের সময় এ ব্যাপারের রাজনৈতিক অংশটুকু চাপা পড়ে গেছে। সেজন্য এ মোকদ্দমার কথা কোন খবরের কাগজে ছাপা হয়নি। আমার মনে হয়, এটিও এনার্কিষ্টদের একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড।

সুরেশ। আচ্ছা, স্বদেশী যুবকদের মধ্যে কেউ কেউ এনার্কিষ্ট হয় কেন?

পাঁচুমামা। ইয়োরোপের রাজনৈতিক দার্শনিকেরা বলেন, Anarchism is the direct outcome of political dispair*। যখন স্বায়ত্ত-শাসন লাভের জন্য প্রজাদের যাবতীয় বৈধান্দোলন ক্রমাগত ব্যর্থ হ'তে থাকে, তখন সহজেই স্বদেশ-ভক্ত যুবকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। এইরূপ নৈরাশ্যের অবস্থায় অল্পবুদ্ধি ও হটকারী স্বদেশী যুবকেরা মনে করে, হত্যা ও লুটতরাজ প্রভৃতি অবৈধ কার্য্যের অবতারণা ক'রে তারা গভর্ণমেণ্টের শাসনযন্ত্র ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হবে। কিন্তু এতে আজ-কালকার বৃহৎ সাম্রাজ্যের শাসন-যন্ত্র ভাঙ্গে না।

মতির ফাঁসীর সংবাদ শুনিয়া হেমাঙ্গিনীর চোখে জল পড়িতেছিল। তাহা দেখিয়া পাঁচুমামা বলিলেন—"হেমাঙ্গিনী, তুমি কাঁদ্‌ছ? এইসকল হতভাগ্য ছেলেদের পরিণাম দেখে অনেকেই কাঁদে। স্থাথ সুরেশ, এনার্কিষ্টরা ফাঁসী কাঠে ঝুলে আপনাদের দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত ক'রে সমাজের বুকে বড় দাগা দিয়ে যায়। এই সকল বিপ্লবপন্থী যুবকদের সম্বন্ধে ভিক্টর

* রাজনীতির ক্ষেত্রে নৈরাশ্য হইতেই এনার্কিজমের উৎপত্তি হয়।

হিউগো বলেছেন—Gallows becomes their apotheosis. Foolish posterity prays on their tombs †। সমাজের সহানুভূতি না পেলে এনার্কিজ্‌মের গাছ রসাভাবে নিশ্চয়ই শুকিয়ে যাবে। সেজন্য গভর্ণমেণ্টকে প্রজামুখাপেক্ষী হ'তে হবে—রাজশক্তিকে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের নায়ক হ'তে হবে।

সুরেশ। রাজশক্তিকে প্রজামুখাপেক্ষী করিবার উপায় কি?

পাঁচুমামা। উপায় আছে। আমরা যে পরিমাণে শাসন-যন্ত্রের ভিতর আমাদের অধিকার বিস্তার কর্‌তে সমর্থ হ'ব, রাজশক্তিও সেই পরিমাণে প্রজামুখাপেক্ষী হয়ে দাঁড়াতে থাক্‌বে। এই পথ 'বয়কট্' পথের সম্পূর্ণ বিপরীত। গভর্ণমেণ্টের চাকরী বয়কট্ কর্‌লে চলবে না। দেশের শিক্ষিত স্বাধীনচেতা লোক যত অধিক সংখ্যায় সরকারী চাকরীতে প্রবেশ করবে, শাসন-যন্ত্রের মধ্যে দেশবাসীর অধিকার ততই বাড়তে থাক্‌বে। আমরা যদি সহিষ্ণুতার সহিত এই পথে অগ্রসর হ'তে থাকি, তা'হলে যথা সময়ে স্বায়ত্ত-শাসন বা স্বরাজ লাভ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হ'বে না। সুরেশ! তুমি কর্ম্মের পথে পদার্পণ করেছ। তোমার মধ্যে স্বাধীন ভাব আছে। আশা করি, তুমি স্বার্থত্যাগী হয়ে এই পথের অনুসরণ কর্‌বে। তোমার প্রাণে স্বদেশপ্রেম আছে। তুমি বৈতনিক বা

† ফাঁসী গিয়া ইহারা পীর হইয়া দাঁড়ায়; যত আহাম্মক লোক ইহাদের গোরে সিন্নি দেয়।

অবৈতনিক ভাবে সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হয়ে উচ্চ রাজপুরুষদের সহায়তায় দেশবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করতে পারবে। তোমাকে দেশভক্তির সঙ্গে রাজভক্তির যোগ রেখে চলতে হবে।

যখন সুরেশের সঙ্গে পাঁচুমামার এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তখন ডাক-পিয়ন আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল। চিঠিখানি বিদেশ হইতে আসিয়াছিল। তাহার উপরে অনেকগুলি পোষ্ট আফিসের ছাপ মারা ছিল, এবং খামের উপরে সুরেশের নাম ও এঁড়েদহের ঠিকানা লেখা ছিল। চিঠিখানি খুলিয়া সুরেশ দেখিল, বিধুভূষণ ইহা সাংহাই হইতে লিখিয়াছে। পত্রখানি এই,—

"ভাই সুরেশ!

যখন দেশে ছিলাম, তখন দেখিতাম সর্ব্বদাই আমার পিছনে পুলিসের লোক লাগিয়া আছে। ইহাতে আমার জীবন বিশেষ ভার বোধ হইত। তাই আমি স্বদেশ হইতে পালাইয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। আর ব্রিটিশ রাজ্যে বাস করিব না, ইহাই আমার সঙ্কল্প। আমি প্রথমে পণ্ডিচেরীতে আসিয়াছিলাম। সেখানে প্রায় এক বৎসর ছিলাম। থাকিয়া দেখিলাম, সেখানেও আমার পিছনে চর লাগিয়া আছে। বুঝিলাম, আমার পক্ষে ব্রিটিশ ও ফরাসী রাজ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই।

আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আমি আর কোনও অবৈধ কাজ করিব না। তথাপি আমার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য তাঁহাদের চর সর্ব্বক্ষণ আমার

অনুসরণ করিতে থাকিবে, ইহা আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি একখানি ফরাসী জাহাজে চড়িয়া চীনরাজ্যে উপস্থিত হইলাম। তদবধি আজ তিন বৎসর হইল আমি চীন দেশে বাস করিতেছি। ভারতবাসীর পক্ষে এদেশ নিতান্ত মন্দ নহে।

ভাই! যতদিন দেশে ছিলাম, ততদিন স্বদেশের ঘর-দুয়ার, গাছ-পালা, পাহাড় পর্ব্বত, নদ-নদী ও লোকজন প্রভৃতির যে একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। এখন সুদূর প্রবাসে দীর্ঘকাল থাকিয়া স্বদেশের প্রত্যেক বস্তুর জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। সন্তান যতদিন মায়ের আঁচলে আঁচলে থাকে, ততদিন সে মাতৃক্রোড়ের মূল্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না; মায়ের অদর্শনেই তাহাকে কাঁদিয়া আকুল হইতে হয়। ভাই! আমারও আজ এই দশা হইয়াছে। কি অপরাধ করিয়াছি জানি না; কিন্তু এত বড় ভারতবর্ষে আমাদের স্থান নাই।

ভাই সুরেশ! পাঁচুমামার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইলে জানাইবে যে, এনার্কিজ্‌মের উপর আমার আর আস্থা নাই। একথা শুনিয়া তিনি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন। আমি এখন বেশ বুঝিয়াছি যে, ভারতবর্ষের সমস্যা এক অতি বৃহৎ সমস্যা; এনার্কিষ্ট্‌দিগের তুচ্ছ বোমার দ্বারা ইহার মীমাংসা হইবে না।

আমি চীনদেশে এতদিন থাকিয়া এখানকার সকল অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, চীনবাসীর মধ্যে প্রকৃত জাতীয় জাগরণ আসিয়াছে। বিদেশীদিগের প্রতি তাহাদের পূর্ব্বে যে দারুণ বিদ্বেষ ছিল, তাহা এখন দূর

হইয়াছে। এই বিদ্বেষের ফলে এদেশে ইতিপূর্ব্বে যতবার প্রজা-বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সকলগুলিই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। গত 'বক্সার্'-বিদ্রোহের সময় চীনের মূর্খ প্রজাগণ ইয়োরোপীয়ান্ মিশনারী ও সওদাগরদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। সেকারণে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি দেশের গভর্ণমেণ্ট নিজ নিজ রণতরি ও সৈন্য পাঠাইয়া এই বিদ্রোহ অচিরে দমন করিয়া ফেলে। ইহা দমনের জন্য চীন গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ কিছুই করিতে হয় নাই। এখন চীনজাতির শিক্ষালাভ হইয়াছে। সম্প্রতি তাহারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির প্রতি তাহাদিগের পূর্ব্ববিদ্বেষ সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদের সকল চেষ্টা ও শক্তির নিয়োগ করিতেছে। আমার ধারণা হইয়াছে, কয়েক বৎসরের মধ্যে চীন একটি বিরাট world power * হইয়া দাঁড়াইবে; কেহই তাহা রোধ করিতে পারিবে না। প্রাচীন জরাগ্রস্ত বিশাল চীনজাতির নব কলেবরে পুনরুত্থান এক অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য! আমি সেই মহান্ দৃশ্যের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

এদেশের ঘরবাড়ী অনেকটা আমাদের দেশের মত। হিন্দু সমাজের কতকগুলি পদ্ধতির সহিত চীন সমাজের সেই সকল পদ্ধতির সুন্দর সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। চীনদিগের সমাজে বিবাহের পূর্ব্বে বরকনের পরিচয় হয় না—উভয় পক্ষের কর্ত্তৃপক্ষই সম্বন্ধ স্থির করেন। চীনসমাজে বিধবা-বিবাহ চলিত নাই। এদেশের

* পৃথিবীর অন্যতম বড় শক্তিশালী সাম্রাজ্য।

লোক ভারতবাসীর ন্যায় অতিথি, সৎকারে পটু। বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ-সভ্যতার জন্য চীন যে ভারতের নিকট ঋণী। এই-সকল কারণে আমি স্বদেশ হইতে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত হইয়া চীনবাসীর দ্বারস্থ হইতে লজ্জা বা হীনতা বোধ করি নাই। আমার পীতাতঙ্ক নাই।

ভাই! এখন আমার এইরূপ একটা ধারণা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতি এসিয়ার আন্তর্জাতিক ঘটনা-পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতবাসীর আশার অনুকূলে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে। আমি সুদূর প্রাচ্যে প্রবাসে থাকিয়া এই সকল ঘটনাস্রোতের গতি লক্ষ্য করিতে ইচ্ছা করি। যে পর্য্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক অপরাধীদিগের প্রতি গভর্ণমেণ্টের amnesty * ঘোষিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমি দেশে ফিরিব না। আশা করি তোমরা কুশলে আছ। আমি তোমাকে আমার ঠিকানা দিলাম না; তোমার প্রত্যুত্তর দিবার আবশ্যক নাই। আমি ভারতবর্ষের কয়েকখানি সংবাদপত্র হইতে দেশের আবশ্যকীয় সংবাদ অবগত হইয়া থাকি। ইতি—

তোমার চিরসুহৃদ্

বিধুভূষণ"

* প্রকাশ্য ক্ষমা।

পত্রখানি পঞ্চানন বাবুও মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেন। করিয়া বলিলেন—"বিধুভূষণের মত পরিবর্ত্তনে আমি আনন্দিত হইলাম। সে যদি চীনদেশে শান্তিতে বাস করিয়া একমনে ভারতের মঙ্গল কামনা করে, তাহাতেও ইষ্ট সাধিত হইবে। আমি তাহার will forceএ* বিশ্বাস করি। সেও কর্ম্মের পথে।"

সমাপ্ত।

* ইচ্ছাশক্তি।

শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার প্রণীত

গোবর গণেশের গবেষণা

দ্বিতীয় সংস্করণ—পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

কয়েকটি অভিমত।

সাহিত্য-সম্রাট স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন :—

"গোবর গণেশের গবেষণা বইখানি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। ভাষায় এবং ভাবে এই গ্রন্থ তলোয়ারের মত হাল্‌কা, ঝক্‌ঝকে খরধার ও নিষ্ঠুর। এই অস্ত্রটি যাঁহার হাতে খেলিতেছে, তাঁহার নৈপুণ্য ও নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া গেল। মোহবন্ধন ছেদনের কাজ চলিতে থাক্, এই আমি কামনা করি।"

সাহিত্য-মহারথী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই, মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"গবেষণা বলিতে বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা কি বোঝেন জানি না। আমি ত জানি উহার অর্থ গরু খোঁজা। গোবর গণেশ অনেক গরু খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদের লেজ মলিয়া দিয়াছেন। নানা আকারে নানা বেশে, নানা ভেকে গরুতে

আত্মগোপন করে। তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত ব্যাপার, লেজ মলা আরও শক্ত। গণেশ বাহাদুর লেজ মলিয়াই ক্ষান্ত নহেন। বেশ দু'ঘা পাঁচন বাড়ীও দিয়াছেন। ইহাতে যদি তাহাদের জ্ঞান জন্মায়, রাজা প্রজা উভয়েরই উপকার হইবে।"

Dr. Brajendranath Seal, M. A., Ph., D. says,—

"Babu Haridas Haldar's GOBER GANESHER GABESHANA is a very meritorious addition to the literature of satire in Bengali. In many places it shows on the author's part shrewd observation of social manners and a capacity for sagacious reflection. It rings many changes on the gamut of satire, from light banter to flashing wit, and from flashing wit to mordant irony. The style in its driving force and its vitriolic quality has the stamp of individuality. * * * * * The writer tells his stories with a comic zest, evinces true humour in his descriptions of the incongruous medley in the social life and manners of Bengal to-day, and sometimes indulges in flights of fancy or in a masked irony, to relieve the fierceness of the onslaught."

Mr. C. R. Das, Bar-at-Law, says,—

"GOBER GANESHER GABESHANA by Babu Haridas Haldar is a well-written satire in Bengali. The style is very fascinating, The book deserves to be widely read."

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্, বেদান্তরত্ন মহাশয় গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন :—

"আপনার গোবর গণেশের গবেষণা পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছি। ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের আবরণে আপনি অনেক কাজের কথা বলিয়াছেন এবং এমন ভাবে বলিয়াছেন যেন কথাগুলি শ্রোতার 'কাণে বাজে'। শুধু কাণে কেন, পিঠেও কয়েক ঘা বেশ মিঠে হাতে দিয়াছেন। আপনার লেখার বাহাদুরি আছে। এরূপ রচনা বাংলা ভাষা হইতে প্রায় উঠিয়া যাইতেছিল। আপনার দৃষ্টান্তে বোধ হয় আবার ফিরিয়া আসিবে।"

"*The Bengalee*" says,—

"GOBER GANESHER GABESHANA by Babu Haridas Haldar is a Bengalee book, which we could not so long review because of its unique attraction. Whoever chances his eyes on its pages got enamoured of it and pressed us hard to lend it to him for a few days. Curious to learn what could there be in a Bengalee book that cansed it an incessant round, we opened at a few pages of the publicatlon, and trnth to say that we also succumbed to the temptation, to which many of our friends had fallen a victim. The chief merit of the book, and we don't think it need possess any other, is that it knows what to say and how to say it. And as such it is an appeal to the sense of the incongruous, the most telling

weapon in the hands of literature. We had the opportunity of reading the reviews of the book by many of our eminent thinkers and we venture the opinion that they have missed the cardinal note of the book. Satire is now-a-days a very common implement. The fatuous turn of expression mostly clothes a disgusting void. But in this humourous representation of the present day Bengal we see a mortified love and pride, which even in its recoil has put forth a supreme effort to conquer. It is a ruthless dissection of hypocrisy and despicable self-complacence which by exposing to our view the writhings of an underlying patriotism has softened all the repulsive scars of its wounds into so many beautiful dimples. It has delivered its attack on all the departments of our thought and activity, and the effectiveness of the blows displays at every turn the unerring skill of the hand. Even those weaknesses of mortals that have so long formed the universal stock-in-trade of literature have been handled with refreshing novelty. No criticism can do full justice to the book, and a careful perusal alone can lead to a complete appreciation of its various beauties."

প্রবাসী—"বর্ত্তমান যুগে সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপ ব্যঙ্গ-পুস্তক আমাদের চোখে পড়ে নাই। লেখক প্রকৃত স্বদেশ-প্রাণ ব্যক্তি। * * এ পুস্তকে ভাবিবার শিখিবার ও

বুঝিবার অনেক আছে। * * প্রত্যেক বাঙ্গালী পুরুষ ও স্ত্রীর এই বই বার বার পড়া উচিত; লাভবান হইবেন নিশ্চয়। গোবর গণেশের লেখনীর জয় হোক!"

ভারতবর্ষ—"এই 'গবেষণার' লিপিচাতুর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। গোবর গণেশ যে একজন প্রথম শ্রেণীর সমজদার ও শিক্ষক, তাহা আমরা মানিয়া লইতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না। আমাদের সকলেরই এই বইখানি পড়িয়া দেখা উচিত, আর স্থধু পড়িলেই হইবে না, ভাবিতে হইবে।"

সবুজ পত্র—"হালদার মহাশয় আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে সমাজের অবস্থা দেখিয়ে দিয়েছেন, কেন না তাঁর ব্যঙ্গ সচিত্র —ইংরাজিতে যাকে বলে Illustrated; তিনি পাতায় পাতায় আমাদের জীবনের ও মনের ছবি এঁকে গিয়েছেন। * * * তার জন্ম পাঠক-সমাজের তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এ সেহাই-কলমের কাজ করতে পারেন এমন গুণী বাঙ্গলায় খুব কম আছে। * * এই কারণে আমি বাঙ্গালীমাত্রকেই এ বই পড়তে অনুরোধ করি।" —শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী।

ভারতী—"এই গ্রন্থে লেখক বেশ নির্ভীকভাবে আমাদের বহু দোষ ও দুর্ব্বলতার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও নীতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে,—সব মতগুলির সহিত সকলের সহানুভূতি না থাকিলেও লেখকের নির্ভীক মতাভিব্যক্তিটুকু উপভোগ্য এবং তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত। লেখকের আলোচনা কৌতুক-রসে মণ্ডিত। সে রসে প্রাণ আছে—তাহা নির্জ্জীব বা অক্ষম ন্যাকামির রূপান্তর নহে।"

দৈনিক চন্দ্রিকা—"গোবর গণেশের গবেষণার গ্রন্থকার—শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার। হালদার মহাশয় প্রবীণ সাহিত্যসেবী। তাঁহার লেখার একটা বেশ ভঙ্গী আছে। বঙ্কিমের 'কমলাকান্ত' যে ভঙ্গীতে লেখা হইয়াছিল, 'গোবর গণেশের' ভঙ্গীও প্রায় সেইরূপ। 'গোবর গণেশের' ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী সাহিত্যিক-নৈপুণ্য ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্র, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, স্বনামধন্য বেদান্তরত্ন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবীণ নাট্যকার পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি মনীষীগণ এ পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এ পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনার আবশ্যকতা আছে। আপাততঃ আমাদের স্থানাভাব। বিস্তৃত সমালোচনা আমরা পরে করিব। তবে এইটুকু বলিয়া রাখি—গোবর গণেশ চাবুক মারিয়াছে অনেককে, ভ্রূকুটি করিয়াছে অনেকের প্রতি। কিন্তু সে ভ্রূকুটিতে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নাই। এইটুকুই গোবর গণেশের মুন্সীয়ানা। সেইজন্য বলিতে হয়, 'গোবর গণেশ' বাংলা সাহিত্যে অতুল সম্পদ। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আমরা 'গোবর গণেশ'কে দেখিতে পাইলে সুখী হইব।"

বিক্রমপুর—"বর্ত্তমান সাহিত্য-ক্ষেত্রে এইরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সরস ও মনোহর অথচ মর্ম্মস্পর্শী ব্যঙ্গপুস্তক এ পর্য্যন্ত একখানাও প্রকাশিত হয় নাই। লেখক প্রকৃত স্বদেশ-প্রাণ ব্যক্তি, তিনি দেশের কথা ভাবেন বোঝেন ও দেশের জন্য প্রকৃতই

তাঁহার প্রাণ কাঁদে, প্রত্যেকটি লাইনেই আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। আমাদের জাতীয় অধঃপতনের মূল সূত্রটুকু কোথায় তাহা তিনি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। * *

"এরূপভাবে গণেশ মহাশয় সমাজের প্রত্যেক ত্রুটি-বিচ্যুতির আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও ধৈর্য্যচ্যুতি নাই—ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই—ভাষার অপব্যবহার নাই; অতি নিরপেক্ষ ভাবে সমাজের বিষয় আলোচনা করিয়া বাঙ্গালী-মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সমালোচনা আজকাল বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে একরূপ উঠিয়া গিয়াছে! এমতাবস্থায় গোবর গণেশের গবেষণা বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব আমদানী। আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম পরিচ্ছেদটি ভাল লাগিয়াছে। এ অধ্যায়ে ভাবিবার, শিখিবার ও বুঝিবার অনেক আছে।

"ভাষা সরল ও সুন্দর। বুঝিতে মাথা ঘামাইতে হয় না। এ গ্রন্থের বহুল প্রচার একান্ত প্রার্থনীয়। বাঙ্গালা সাহিত্য-রস-রসিক ব্যক্তিমাত্রেরই এই গ্রন্থ পড়া উচিত।"

মূল্য—সিল্ক বাঁধাই ১৲ টাকা।

প্রকাশক—শ্রীবনমালী সেনগুপ্ত,
১৭ নং টালিগঞ্জ রোড, কালিঘাট, কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীবনমালী সেনগুপ্ত,
১৭ নং টালিগঞ্জ রোড, কালিঘাট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

এই উপন্যাসের সকল ঘটনার উপর বাস্তবের আবরণ দিবার সাধ্যমত চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার সকল চরিত্র ও ঘটনাই কাল্পনিক। সুতরাং কেহ যেন মনে না করেন যে, কোনও প্রকৃত ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এই গ্রন্থের মধ্যে কোথাও কিছু ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

কালীঘাট
১৩২৪ সাল।

শ্রীহরিদাস হালদার।

"The centralised Governments now have a great material advantage in dealing with local disaffection owing to their control of telegraphs, railways, and machine-guns. This fact tells with crushing force, not only at the time of popular rising, but also on the men who work to that end. Little assurance was needed in the old days to compass the overthrow of Italian Dukes and German Translucencies. To-day he would be a man of boundlessly inspiring power who could hopefully challenge Czar or Kaiser to a conflict. The other advantage which Governments possess is in the intellectual sphere. There can be no doubt that the mere size of the States and Governments of the present age exercises a deadening effect on the minds of individuals. As the vastness of London produces inertia in civic affairs, so, too, the great Empires tend to deaden the initiative and boldness of their subjects. Those priceless qualities are always seen to greatest advantage in small States like the Athens of Pericles, the England of Elizabeth, or the Geneva of Rousseau; they are stifled under the pyramidal mass of the Empire of the Czars; and as a result there is seen a repectable mediocrity equal only to the task of organising street demonstrations and abortive mutinies."—J. H. Rose.